আগাম দলের তিনটি নৌকা ভাটার টানে তরতর করে নেমে এল, পুবের কেষ্টপুরের খাল-গেট পেরিয়ে, নানা বিলের পাশ কাটিয়ে। তিনটি বাছাড়ি নৌকা। এল পুব থেকে। খাড়া পুব থেকে নয়। পুব-দক্ষিণ থেকে। দুটি এল পুরোখোঁড়গাছি থেকে। আর-একটি ধলতিতা গাঁয়ের।

আরো আসছে পেছনে পেছনে। তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরো-খোঁড়গাছি, ফতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর, তাবৎ পুব-উত্তর আর পুব-দক্ষিণ ঠেঙিয়ে আসছে যাবৎ মৎস্যজীবীরা। জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো—সবাই আসছে। ওদিককার রাজবংশীরাও কালে কালে মাটি হারিয়ে মৎস্যজীবী হয়েছে। তারাও আসছে।

তাড়িয়ে নিয়ে আসছে দখনে বাওড়। যাকে বলে, সমুদ্রের ঝড়। এখন নোনা গাঙে নিদেন কাল। মিঠে গাঙে সুদিনের বান ডাকবে।

আরো আসবে। আশেপাশে কাছ-ঘেঁষাঘেঁষি পুঁড়্যা, আতুড়ে, ইটিণ্ডে, দণ্ডিরহাট, শাঁখচূড়া, টাকি—সবখানে সব মাছমারার ঘরে সাজো-সাজো রব পড়েছে। সবাই আসবে একে একে। ডাইনে রেখে গোপালপুরের বিল-জল-জংলা, সুদূর পশ্চিমে রেখে সন্দেশখালি, হাসনাবাদের তলা দিয়ে আসবে।

ইছামতী দিয়ে এসে, হাসনাবাদের তলা দিয়ে নৌকা নামবে তরতর করে। একে বলে পথের প্যাঁচ। জলপথের ঘূর্ণি। কোথায়

নামছে না, মঠবাড়ি, ভুলভুলি হয়ে একেবারে সাহেব-খালির ঝিলে আর রাইমঙ্গলের মোহনায়। সেখান থেকে খেল্যের রেখে দক্ষিণে; ডাইনে পড়বে গুলকুনি গাঙ, ভবানীপুর কালী ভিড়িয়ে। এবার ওপর দিকে মনের চোখ খুলে তাকালে দেখা য সাপের মতো আঁকাবাঁকা কতগুলি জটা পাক দিয়ে কিলবি উঠেছে চব্বিশ পরগনার উত্তরে। এতক্ষণ ইছামতীর ভাটার ট নেমেছে। হাল না মারলে, তাও ভাতসলা থেকে এক ভাটায় আ যাবে না এতদূর।

তারপরে ন্যাজাট। ন্যাজাট থেকে এবার উত্তর-পশ্চিম কোনাকু উঠবে এক গোনে, অর্থাৎ এক জোয়ারে। জোয়ার আসবে রাইমঙ্গলে বুক ডুবিয়ে। এক জোয়ারে এখন ধরা যাবে সন্দেশখালি। আব আর-এক গোন। মিনাখাঁ ঠেকতে ঠেকতে ঠিক এসে পড়বে কুলটি গেটে। তখন থামতে হবে। এখানে চিঠি দেবে না, মানে টিকেট দে না। তবে দেখবে কিসের নৌকা, রকম কী তার, উদ্দেশ্য কী। হাঁ পথের মার আছে, জলপথের সব আঁটঘাট বাঁধা। কত নৌকা গে আর এল, কী গেল আর এল, সব হিসেব থাকে খাল-গেটের দপ্তরে খাতায়। গেট খোলার আগে গুনে দেখবে নৌকা। যদি ম হয়, আরো নৌকা আসার সম্ভাবনা আছে তবে রইল গেট বন্ধ সব ছাড়া হবে, তবে। কে বার বার গেট খোলে আর বন্ধ করে মাছমারাদের আসবার পথে একরাত কাটবে কুলটি গেটে। তখনে রাইমঙ্গল আর বিদ্যেধরীর ধাক্কায় চলতে হয়। বরং ভাটা পড়ে গে একটু ফ্যাসাদ। পরের রাত কাটবে কেষ্টপুরের খাল-গেটে। সে হল আসল গেট। লোহার শিকল দিয়ে যাবৎ জলযাত্রীর রাস্তা বন্ধ একে বলে চেন-গেট। শুধু আটকানো যায় না তাকে, যে বসত কে জলের তলায়। ডাঙার রাজা-উজিরের যে ধার ধারে না।

কেষ্টপুরের খাল-গেট হল কুতঘাট। এখানে কুত হবে, অর্থাৎ নৌকার মাপ হবে। কত বড় নৌকা, কত গহীন তার খোল, কত মাল্লা তার দাঁড়ে, বৈঠার হালে। সেই মাপে যা সরকারের মর্জিতে সাব্যস্ত হবে, তত পয়সা দিয়ে কাটতে হবে টিকেট। জলে জমিনে ফারাক নেই, খোদার ওপরে যারা খোদগিরি করে, তারা জলের পথও আটকায়।

এবার আর ইছামতী নয়, রাইমঙ্গল নয়, তার ওঠানামার সীমানা ...ার হয়ে এবার গঙ্গার টানাপোড়েনের মধ্যে। তখন আবার নৌকা ...লবে ভাটায়।

কেষ্টপুরের খাল-গেট পেরোলেই একটু ঝটকা মারবে নোনা বিল। ...কষ্টপুরের গেট পার হয়ে এসে বাঁয়ে থাকবে বামনধোপা, ভঙ্গিড়কাটা ...াল এসে মিশবে একটু দক্ষিণ মোচড় দিয়ে। তারপর পশ্চিমে, সোজা ...লটোডাঙার দিকে। সরকারী নথিপত্রে ওটার নাম নিউক্যানেল। ...লে-মাঝিরা উলটোডাঙার খাল বলেই জানে। গোটা তিন দিন ...াগবে বাগবাজারের খাল-গেটে আসতে।

তার আগে, কেষ্টপুরের খাল-গেট পেরিয়েই নোনাবিলের কোণে ...াসতেই দূরে শহরের সীমানা দেখা যাবে। আকাশের গায়ে সব ...কাটা দাগের মতো।

আগের দিনে অনেকে আসত আবার বেলেঘাটার খাল দিয়ে। ...দি খবর থাকত গেট বন্ধ, তবে ওই বিদ্যেধরীরই সব বেনামী ফালি-...াকড়া ধরে নামত তরতর করে। করাচী নদী দিয়ে চলে আসত ...লঘাটার খালে। করাচী নদীর নাম ছিল গাপতলা কোমর-জল ...া। হালে গেছে মজে। খুঁড়িগাছির পাশ দিয়ে, শহর কলকাতার ...ঘেঁষে আসা যেত একেবারে বাগবাজারের গেটে। এখন খালে ...ার অন্ধিসন্ধি মজে গিয়ে ওই রাস্তা বন্ধ।

কেষ্টপুরের টিকেট দিতে হবে আবার বাগবাজারে।
অগতির গতি। যাবৎ জীবের জীবন-মরণ ধনদৌলত,—সবি
মাঠাকরুন বসে আছেন গাঙের তলায়।

আসছে, সবাই আসছে এদিকে। দিনে রাতে
চোখ থাকলে, উপরে উঠে একবার পুবে নজর করলেই দেখ
কত আসছে। একে একে সারি সারি, পাশাপাশি।
একেবারে নাবাল থেকে পাল তুলে দিয়েছে সবাই জোয়ারের
যে যেখান দিয়ে পারছে, গঙ্গায় আসছে সবাই। গঙ্গার ঘোল
মিঠে জলে। সব মৎস্যজীবীর ভাত-কাপড় যার কাছে আছে বাঁ

সমুদ্রের দু মাইল দূরের কথা। কানাচে তিষ্ঠোবার উপায়
সাগরের দুই হ্যাঁকার দরকার হবে না। এক হ্যাঁকাতেই ঘুঙরে
দেখিয়ে দেবে। নৌকাসুদ্ধ নিপাত করবে তলায়। তাই দু
সবাই আগের থেকেই সরে আসছে উত্তর-পশ্চিমে। ডায়মণ্ড হ
পার হয়ে আর জাল রাখবার উপায় নেই।

খাল বিল নালা দিয়ে এসে, গঙ্গায় পড়ে, কেউ থাকবে কলক
তল্লাটে। দক্ষিণে থাকবে কেউ। কেউ আসবে উত্তরে, বারা
বরানগরের তল্লাটে, এপারে ওপারে সেই চন্দননগর-জগদ্দল, হু
নৈহাটি, দূরে ত্রিবেণী পেরিয়ে।

সব ছেড়ে সবাই আসবে গঙ্গায়। নোনা জল যেখানে
মাতামাতি নেই দক্ষিণ বাওড়ের। পুব-দক্ষিণের সমস্ত নোনা ভ
ঘাঁটি ছেড়ে, গঙ্গার মিঠে জলের স্রোতে, খুঁটি পুঁতে নৌকার
বাঁধবে সবাই।

বসিরহাটের আরো উঁচুতেও নোনা জল আসে। মাছও থা
তবে মাছ ব'লে কথা। যেমন তার মর্জি, তেমনি জলের মর্জি।
কারুর প্রজা নয়। খাজনা-টেকসোর ধার ধারে না। জল যদি

তো এমন এল—তোমার ঘর-বাড়ি খেত-খামার সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। না এল তো কাঁদলেও দুফোঁটা আসবে না।

মাছ আরো স্বাধীন। ঠাকরুন নদীকে ভালো না লাগলে মাতলায় যাবে। ইছামতীকে মনে না ধরলে, গঙ্গার মোহনায় যাবে ঝাঁক বেঁধে। মায় পাঁজি-পঞ্জিকার আঁক-কষা কথাকেও ঠেলে ফেলে মীনেশ্বরী চলাফেরা করে। পাঁজি লিখলে মাছের ভাগ দশ। হল গিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ। নয়তো একেবারে দেড়া কিংবা দ্বিগুণ, পনেরো থেকে কুড়ি ভাগ।

পাঁচু হুঁকো টানছে আর ভাবছে। দু নৌকা পুরোখোঁড়গাছির আর সে নিজে ধলতিতার। তিন নৌকা বাগবাজারের মোড়ে বাঁধা পড়েছে। আরো চার নৌকা তাদের আগেআগেই এসেছে। সাত নৌকা পাশাপাশি বাঁধা রয়েছে। ভাটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রাত দু-পোহর গেলে। তখন বাঁধন খুলে উত্তরে যাত্রা করতে হবে। সাত নৌকা, সাত-গুণ হবে দেখতে দেখতে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘরে ঘরে যাত্রা করার জন্যে তৈরী হচ্ছে সব। আজকাল বলে পাকিস্তানের বর্ডার, সেইখান থেকে সব আসছে এদিকে। না এসে পায় কী! চিরকাল আসছে, আসবেও। জন্ম থেকে দেখা এই পথ। পেট থেকে পড়ে যাওয়া-আসা। এর পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, সারা তল্লাট তার নখদর্পণে। কত গাঙ মজে গেল চোখের সামনে। কত বিল হেজে গেল। কত খাল শুকিয়ে, নয়ানজুলির মতো সরু নালা হয়ে গেল। তার উপরে হাড়ে দুর্বো গজাবার মতো, মাঠের এক সরু দাগ ছাড়া আর কিছু চোখেই পড়ে না। আবার নতুন নতুন খাল কাটা হয়েছে। আসবার পথ বন্ধ থাকে নি। থাকলে এদিকের চলে না, ওদিকেরও বারোমেসে টোটা হয়ে যাবে। টোটা মন্বন্তর।

পাঁচুর বাপের বয়স হল তিন-কম পাঁচকুড়ি বছর। দশ ব
গঙ্গা দেখে নি। বলে, আমরা সবসময় কলকেতা ঘেঁষে যেতুম
বড় চোর-বাটপাড়ের ভয় ছেল। ত্যাখ্যন মুক্তোপুরের খালে ছেল জ
এত গেট-ফেঁট ছেল না। খেল্যের গাঙ থ্যে বেরিয়ে, হাড়োয়া খা
ভেতর থ্যে বোদাইয়ের পাশে মালতী বিল। মালতী আর বরু
বিল। তার সঙ্গে মুক্তোপুরের খাল। সেই খাল থ্যে ভাটপা
উতোর বেলে গ্যে একেবারে গঙ্গায় পড়তুম। তা-পর রেল-নাইন
খাল-মাল সব বুঁজে যেতে লাগল। রাস্তাও বদলে গেল।…

পাঁচুর বয়সও কম হল না। তিন কুড়িতে ধরল প্রায়। তবু এখ
ফি বছর বর্ষায় গঙ্গায় আসার কামাই নেই। থাকলে চলে না।
তো আর আলাদা করে রাখা চলে না। আর পেটও একলার ন
দোকলা পেটও নয়। গুষ্টি পেট। এই বুড়ো বয়সে নিজের দেড়
কুচো। বড় ভাইয়ের একগণ্ডা। বড় ভাই মারা গেছে আজ
বছর। মানুষ যেমন শক্ত ছিল, তেমনি কুটকচালে ছিল ঠিক মা
মতো। পালাবার উপায় ছিল না মাছের। জলের আকার দেখ
ঠাওর করতে পারত, ঝাঁক কোন্ দিকে। লোকে বলত গুণ জা
সত্যি জানত। নাম ছিল নিবারণ দাস। আসলে জাতে মা
লোকে বলত সাইদার নিবারণ।

টানের মরশুমে দশ-বিশ গণ্ডা জেলে-মালো জুটিয়ে, ত্রিশ-চল্লি
নৌকা আর পঞ্চাশ-ষাটটি জাল নিয়ে, যে সকলের হয়ে সর্দারি ক
দক্ষিণে নিয়ে যায় মাছ ধরতে, তাকে বলে সাইদার। দক্ষিণে যা
হল সমুদ্রযাত্রা।

পুব তল্লাটে কোনো মালো নিবারণের মতো এতবার সমুদ্রে
নি। সাইদার নাম হয়ে গিয়েছিল সেই থেকে। পাঁচু তার তিন কু
বয়সে কুল্যে বার পাঁচেক গেছে সমুদ্রে। প্রতিবারেই নিবার

ারসাজি যেমন বুঝত, তেমনি বনের কারসাজিও ঠাওর করত ঠিক।

প্রথম যে বারে নিয়ে গেল পাঁচুকে, যাবার পথে বলে রেখেছিল াগে থেকে, "ছ্যাখ পাঁচু, টানের সমুদ্দুর, তাকে বিশেষ ভয় নাই। কিন্তু খবোদ্দার, ডাঙার দিকে চোখ ফেরাস নে। ডাঙার তুক, বড় তুক। নাঙর ফেলে বসে আছিস গালে হাত দ্যে। শুনতে পাবি, কে যেন াকছে ডাঙা থেকে। ফিরে তাকে দেখবি, মানুষ, মেইয়ে মানুষ। ারী অবলা জীব, বড় বিপদে পড়ে তোকে ডাকছে, ওগো ভালো ান্ষের ছেলে, ও মাঝি বাঁচাও গো! আমার কেউ নাই গো! েখবি, একপিঠ চুল, ফুটফুটে মুখখানি, ডাগর-ডাগর চোখ জলে ভসে যাচ্ছে। আহা! পুরুষ মানষের পান তো। অমনি তোর ্কের মধ্যে হাঁকপাঁক করে উঠবে। সাত তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে, াল মেরে ছুটে যাবি, কেমন তো?…কিন্তন্ খবোদ্দার। যাস তো ই যাওয়াই শেষ যাওয়া। আর কোনো দিন ফিরে আসতে পাবি নে। াঙায় নেবে দেখবি, ওই অবলা জীব কালান্তক যম। অ্যাত্ত নাম্বা ারীল। গেরিমাটি রঙ, গায়ে কালো-কালো ডোরা। উনি হলেন ক্ষিণ রায়। সোঁদর বনের রাজা। ডাঙার যত তুক, ওয়াঁর ছদ্মবেশ। িসেবে কুলিয়ে ওঠা দায়। রাতবিরেতে, নয় তো সোঁদর বনের াশে, নোঙর করলে, ওয়াঁর নাম নিতে নাই। দক্ষিণ রায়ের আর- েক নাম বড় শেয়াল। ডেকে ন্যে গ্যে মুণ্ডুটি ধড়ছাড়া করে মড়মড় রে চিবুবে।"

শুনে পাঁচুর বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠেছিল। দক্ষিণে যাওয়া ড় যাওয়া। কথায় বলে, যমের দুয়ার দক্ষিণে। সমুদ্রে যাবার রজিস্ট্রি অফিস পেরুলেই তাঁর রাজ্য। ফিরে আসা না-আসা তাঁর াত। দয়া করলে রেহাই নেই। ছাড়লে নেই কেউ মারার। ফি

সমুদ্রের গর্ভেও যায় কেউ কেউ। সেটাই যায় বেশি। বিশেষ মাছ-মারারা।

কিন্তু বড় ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে কোনো দিন কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি পাঁচুর, সব বিপদ মাথায় করে আগলেছে। গুণীন মানুষ। সব অন্ধিসন্ধি জানা ছিল তো!

তবে অপদেবতা নিয়ে কথা। গুণীনের তিন দিন। তার একদিন। বাগে পেলে সে ছাড়বে না। ছাড়েও নি। সাত বছর আগে শেষবার গিয়েছিল নিবারণ সাইদার। আর ফেরে নি।

বুকটার মধ্যে টনটন করে উঠল পাঁচুর। তিন কুড়ি বয়সের বুড়ো হয়েছে। তবু বুকের মধ্যে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে ছেলেমানুষ পাঁচু। কাঁদছে ফোঁসফোঁস করে। চোখে জল নেই। মুখে ভাব নেই। কান্নার কোনো শব্দ নেই। বাগবাজারের এই খালের মোড়ে, বাঁধা পোস্তার গায়ে শুধু দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা লাগছে। দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা লাগছে পাঁচুর বুকে। দাদার আত্মা আছে যে ওই বাতাসে।...শ্রীরামের মতো দাদা ছিল সে, তার চেয়ে বড়, অতবড় দোসর আর পাঁচুর কেউ ছিল না। ছিল পিঠোপিঠি। কিন্তু হাতে ধরে সব শিখিয়েছে পাঁচুকে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সবখানে। রাগ হলে দু-ঘা দিয়েছে। সোহাগ হলে চুলের মুঠি ধরে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছে। আর খালি বলেছে, বানচত, খা। খা বানচত। বেশী রেগে গেলে, শালা-সুমুন্দি করতেও ছাড়ে নি! যা মুখে এসেছে, তাই বলেছে।

তার ওপরে গুণীন মানুষ। বলবেই তো! সবাইকেই বলত। ক্ষমতা কত! সমুদ্রের পাটা-জাল ধরে যখন টান দিত, সেই জালে আর কেউ ছোল ধরে থাকলে বুঝত, নিবারণের হাত পড়েছে। নইলে

এত টানের জোর কার। জালের সঙ্গে যে বাঁশ ভাসে তাকে বলে ছোল। আর হাঁক দিত কী! ডাকাতের গলায় কুক পাড়া তার কাছে কিছু নয়। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়মশাইও চমকে উঠতেন। শাঁখের শব্দের মতো সেই হাঁক শুনে সমুদ্রের হ্যাঁকাও থিতিয়ে যেত যেন। হলই বা টানের হ্যাঁকা। সাগরের তেজ কখনো কম নয়। সাত বছর আগে সেই মানুষ গেল দক্ষিণে। আর ফিরল না।
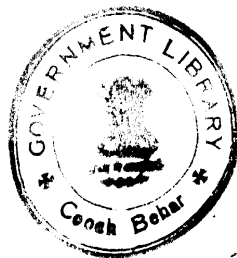
সে বছর ছুই ভাইয়েরই মন বড় আনমনা। পাঁচুর আর নিবারণের ছুজনের বউয়েরই ভরা গর্ভ! ছুই বউ রাঁধছে বাড়ছে, সবই করছে। এদিকে ছাইচাপা আগুনের মতো ধুঁইয়ে উঠছে ব্যথা। প্রথম বিয়োনী তো নয়। ব্যথার রকম দেখে টের পেয়েছে, সময় আর নেই। এখন তখন অবস্থা।

ওদিকে নৌকা সাজানো হয়েছে। বড় রকমের যাত্রা হাসনাবাদের নীচে, রাইমঙ্গল. নদীতে আঠারো গণ্ডা নৌকার শাবর নিয়ে বসে আছে দশকুড়ি জেলে। দাঁড়িয়ে আছে কোম্পানীর ভাড়া-করা লঞ্চ। চাল ডাল তেল নুন, কম করে মাসখানেকের খোরাক নিয়েছে সবাই। থাকতে, হবে তিন মাস। বাকি ছু মাস খাবে মাছ-মারার পয়সা দিয়ে। খাবে, আবার কমপক্ষে মাস ছয়েকের ঘরে খাবার পয়সা আনতে হবে। না গিয়ে উপায় কী!

আঁতুড় পাতাও হয়ে গেল। পাড়ার এক বুড়ী মেয়েমানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেখলে ছুই বউকে। ছুই ভাই হুতোশে, পরস্পরের হাতে টানাটানি করে হুঁকো টানছে। হুঁকোর আর বিরাম নেই। বুড়ী বেরিয়ে এসে বললে, দরজা খুলছে গো! ব্যথা চড়েছে। দম ভারী হয়েছে। পেটেও পাক লেগেছে।

কিন্তু সময় আর নেই। পাঁজি-পুঁথি-দেখা সময়। অগ্রহায়ণের বেলা। দক্ষিণ ভিটের চালায় অর্ধেকের উপর রোদ উঠে গেছে। মাথার কাছে বাঁধা আছে কঞ্চি। কঞ্চির গায়ে যতক্ষণ রোদ না লাগবে, ততক্ষণ যাত্রার সময়। রোদ লেগে গেলে যাত্রানাস্তি।

নৌকা ভাসিয়ে দু ভাই গিয়ে দাঁড়াল তেতুলে ফোড়নের মুখে। ফোড়ন হল ছোট খাল। একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এসে নিবারণের বড় ছেলে খবর দিয়ে গেল, খুড়ির মেইয়ে হয়েছে, রঙ লাল। মায়ের এখনো হয় নি।

অর্থাৎ পাঁচুর মেয়ে হয়েছে। নিবারণের কিছু হয় নি। ওদিকে ডানসার মুখে দক্ষিণের যাত্রীরা ছটফট করছে। উপায় নেই। নিবারণ নিজেই হাল কাত করে চাড় দিল।

পাঁচু বলে উঠল, আর-এক দণ্ড দেখে যাই!

নিবারণ সাইদার। তাকে সব দেখাশোনা করতে হবে গিয়ে। সবাই যাত্রা করে বসে আছে। উপায় নেই। বলল, এট্টা যখন বেইরেছে, আর এট্টাও বেরুবে। দু-দণ্ড আগে আর পরে। কিন্তুন আর দেরি করা যায় না। লোকগুলান ভাবনায় পড়ে গেছে।

বলে, ফোড়নের মুখ থেকে আবার ইছামতীতে পড়ল। শীতটা পড়েছিল মন্দ নয়। উত্তর বাতাসেরও টান ছিল। নিবারণ বলল, পাল তুলে দে।

সাইদারের হুকুম। যুদ্ধক্ষেত্রে পা দিয়ে সেনাপতির আদেশ অমান্য করা যায় না। পাল তুলে দিল পাঁচু। দিয়ে পালের কানদড়ি দিলে পায়ের পাতায় পেঁচিয়ে।

গুপুস করে শব্দ হল পশ্চিম পাড়ে। দু ভাই-ই ফিরে তাকাল। কচ্ছপ। মাদী-মদ্দা, জোড়া কচ্ছপ। একটু রোদ পোয়াতে উঠেছিল। মানুষের সাড়াশব্দ পেয়ে, একটা জলে পড়েছে। আর-একটি গড়াচ্ছে জলে পড়বে বলে।

চোখাচোখি হল দু-ভাইয়ের। যাত্রাপথে কচ্ছপ। কাঁকড়া, কচ্ছপ, কলা,—যাত্রার সময়ে অলুক্ষণে চিহ্ন। দু ভাইয়েরই বুকের মধ্যে নিঃশব্দ বিদ্যুৎশিখা একবার চিকচিক করে উঠল। এ কিসের ইঙ্গিত।

কিন্তু নিবারণ বড় শক্ত মানুষ। জোরে হাল চেপে বলল, যেমনবার 'সময় দেখা দিলে খারাপ। পথে ঘাটে কত কী চোখে পড়বে। তার জন্য যাওয়া আটকায় না। কান-দড়িটে আর এট্টু খাটো কর দি-নি।

কানদড়ি খাটো করল সে। পালে টান পড়ে আরো ফুলে উঠল। নৌকা বাঁয়ে কাত হল আর-একটু। একত্রিশ হাত বাছাড়ি নৌকা চলল ছলছলাত করে।

পাঁচু ভাবছিল কেবল বাড়ির কথা। বউ দুটির কথা। তার মধ্যে বড় ভাজের ভাবনা বেশী। ভাবতে ভাবতে সময় গেল। নৌকা এসে লাগল ঝিল্লে আর রায়মঙ্গলের মোহনায়। সাই যাবার কুড়ি গণ্ডা নৌকা শাবর করে আছে সেখানে। অপেক্ষা করে আছে সাইদার নিবারণের জন্যে।

সাইদারের হুকুমে শাবর ভেঙে যাত্রা হল। আড়াই দিন পর অফিসের কাছে এসে, রেজিস্ট্রি করাতে সময় গেল একদিন। নৌকাপিছু আট আনা। জেলেদের মাথাপিছু হপ্তার টিকেট তিন আনা। ওখান থেকে যাত্রার দিন একবার বলেছিল নিবারণ, মেইয়ে-মানুষটা অ্যাদ্দিনে বোধ করি বিয়োল রে পাঁচু। তোর বোঠানের কথা বলছি।

পাঁচু বলেছিল, তা কি আর বসে আছে অ্যাদ্দিনে?

নিবারণ বোধ হয় ওইটুকুই শুনতে চেয়েছিল। জোয়ারের টান পড়ে যাওয়ার ভয়ে, তাড়া ছিল সকলেরই। রাইমঙ্গল থেকে বিদ্যেধরীর আঁকবাক দিয়ে ডাইনে রেখে এসেছে বাসন্তীর সরকারী বাংলো, মজিদবাড়ির বন-অফিস। মাতলা থেকে বেঁকেছে কৈকালা-মারিতে। এবার আস্তে আস্তে চওড়া হচ্ছে ঠাকরুন। বনের সীমানায় পড়ে গেল নৌকা। মজিদবাড়ি থেকেই পড়ে। কিন্তু

যত নামতে হয়, বন ততই গভীর। যেন জীবন্ত। কেমন একটি অদ্ভুত গন্ধ ছাড়ে এখানকার বাতাসে। অজানা অচেনা বনবাদাড় আর সমুদ্র মিলিয়ে এখানে এক অদ্ভুত গন্ধ। নাকে এলেই বোঝা যায়, কাছাকাছি আসা গেছে। সামনে তখনো বাঁকের মুখে জঙ্গলের আভাস। অকূল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। শেষ বন-অফিস সুরিনগঞ্জের সীমানায় আসা গেছে। সুরিনগঞ্জ হল সুরেন্দ্রগঞ্জ। নিবারণ বলেছিল, হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন কি আর বসে থাকে? ছেইলে কি মেইয়ে হল, জানা গেল না। যাগ, জানা যাবে ঘুরে এসে!

মনটা বড় অস্থির-অস্থির করছিল পাঁচুর। বাড়ির খবরটা যদি কোনো রকমে পাওয়া যেত, দাদার মনটা থির হত একটু। বাড়ির ভাবনাই ভেবেছিল পাঁচু। আর তো কিছু ভাবে নি।

কিন্তু কাল হল আর-এক দিক দিয়ে। দক্ষিণে রেখে এল দাদাকে। এসে দেখল, উত্তর ভিটের গোলপাতার ছাউনি ধ্বসে পড়েছে পেছনে। ছিটে বেড়া তুমড়ে পড়ে আছে হুমড়ি খেয়ে। সবকিছুই এলোমেলো, ছড়ানো। দক্ষিণ ভিটের ঘরটা আছে। কিন্তু যেন কোন বিরাটকার প্রেত তার আকাশছোঁয়া থাবা দিয়ে ঘরটির ঝুঁটি ধরে দিয়েছে নেড়ে। চালের বাতায় পাতা নেই খানে খানে। বেড়াটা বাঁকাচোরা, গোঁজা-খোঁচা হয়ে বেরিয়ে আছে এখানে সেখানে। আর তার বৌঠান, উঠোনে বসে, রোদে বুক খুলে স্তন্যপান করাচ্ছে নতুন ছেলেকে। চোখে গড়াচ্ছে জল। নজর নেই সেই চোখে। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি অসময়ে গেছে বড় বর্ষা। কথায় বলে, যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে। কি জলে আর কি মাটিতে। ফলন নেই কোনোখানে।

সব দেখে-শুনে পাঁচু আর কথা বলতে পারে নি। বৌঠানের পায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিল হুমড়ি খেয়ে। সাতদিন কোনো কথা

বলতে পারে নি। খালি এদিক ওদিক করেছে। যেন লুকোচুরি খেলেছে। ঘরামি ডেকে ঘর তুলেছে নিজেও। বৌঠান আপন মনে বলেছে, তোমার বড় ভাই সাইদাঁর। নিজে আসতে পারে নি, তাই তোমাকে পেটিয়ে দিইছে। তুমি স্মুদ্দুরে ফিরে গে বোলো, তার ছেলে হয়েছে, ঝড়ে তাকে রক্ষে করেছি আমি। শোনো ঠারপো, আর বোলো…

আর চুপ করে থাকতে পারে নি পাঁচু। বৌঠানের পা দুখানি ধরে বলেছিল, ওগ. দক্কিণে যমের দোরে রেখে এসেছি সব।

বৌঠান বুক চাপড়ে চাপড়ে বলেছিল, অগ আমার পাপ মন তো এ-ই গেয়েছিল গ। আগনে এল পচ্চিমে শ্যাওটা। কী শীত! থেকে থেকে অগানে আবার দখনে বাওড়। দেখে আমার বুক কাঁপতে নাগল। এক্কি অঘটন গ। এমন তো দেখি নি গ বাপের জম্মে। সেই আমার বুক কাঁপল। কোলের ছেইলে আমার শুড়ু শুড়ু কেঁপ্পেকুঁপ্পে কেঁদে অস্থির। সেই তো আমার মন বলেছিল গ।

তারপরে জীবনে একবার গেছে পাঁচু দক্ষিণে। গেলে থাকতে পারে না। সমুদ্রে নীলাম্বুধি অন্ধকার গিলতে আসে তাকে। বাতাসের সাঁই-সাঁই রবে কানে বাজে শুধু সাইদারের হাঁক। কালো কুচকুচে সর্বনেশে জঙ্গল তাকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডাকে আর বাতাসে ফিসফিস করে বলে, ভাই রে পাঁচু, এইখেনে আছি।

আজো ভুলতে পারে নি পাঁচু সেদিনের কথা। বাগবাজারের এই খালের মোড়ে বসেও সেই দিনটির কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। অগ্রহায়ণের আকাশ ঘোলাটে। গাঁজানো-রস-খাওয়া বাতাস। তার দিক ঠিক নেই। সেই সময়ে দেখা দিল জলের বুকে স্পষ্ট দাগ।

সমুদ্রে জোয়ার ডেকেছে। ট্যাকের মুখে শাবর করে আছে গোটা সাই। আকাশ-বাতাসের গতিক বড় সুবিধের লাগছিল না। বাতাস এক বর্গা নিশেনা হারিয়েছে। তার দিক ঠিক নেই। অগ্রহায়ণের সমুদ্র। কিন্তু তারও গতিক ভালো নয়। আগ্‌নার মুখে বড় বড় হ্যাঁকা ভাঙছে। আগ্‌না হল জোয়ারের আগমন। শাবর বলে সাইয়ের নৌকা-জমায়েতকে। অবস্থা দেখে, শাবর ভেঙে সাইয়ের মাছমারারা সেদিন মাছ মারতে বেরোয় নি।

সাইদার নিবারণের প্রাণে ভয় ছিল না। কিন্তু সবাইকে অভয় দিতে পারে নি সে। অগ্রহায়ণের মেঘকে ভয় নেই। তবু বলা তো যায় না। এটা সমুদ্রের সংসার। কে কোথায় কী বেশে ওত পেতে আছে, সব দেখা যায় না। যার তুমি সবটুকু চেন না, চিনে নাও। তবে যাও।

এমনি হয়, এই নিয়মের মাঝে অনিয়মের মতো। একে বলে রোগ। যাবৎ জীবকে নিয়ে জগৎ। জগৎও একটি জীব। তার প্রাণ আছে, ঠাওর করলে মনের দেখাও মিলবে। তাই বৈশাখ ছেড়েও তার আকাশে ঝড় ওঠে ঘাড়-মুচড়ানো। শাওন ছেড়ে অঘ্রানেও সংসার ভাসাতে পারে সে।

মাছমারা আছে অকূল সাগরে। নিয়ম ছেড়ে সে নিজের চোখে চেয়ে দেখুক, জলের রকম কী। বাতাসের গতিক কেমন। আকাশ কী বলে। সেইটি হল আসল নিয়ম।

ট্যাঁকের মুখে তেমন হ্যাঁকা নেই। থাকলে তিষ্ঠুনো যেত না। নৌকায় নৌকায় উনুন ধরেছে। খাওয়া সেরে রেখে, অপেক্ষা করা ভালো। সময় বয়ে যায়। হাত-পা গুটিয়ে, তুদিন বসে খেতে হলেই প্রাণে পাষাণ চাপে।

সামনে চুকম জায়গাটুকু পেরিয়ে কাশ মরছে মাথা তুলিয়ে। চুকম হল ফাঁকা জায়গা। ঠিক যেন মুখ-ঢাকা ঘোমটা-পরা বউগুলির মতো। জলের সন্ধান পাওয়া গেছে ওখানে। থেকে থেকে বাতাসের ডাকটা বাঘওয়ানোর মতো শোনা যাচ্ছে। সুঁতুরি-হেতালের অন্ধকার জটায় বড় রহস্য। কে ডাকে সেখানে, কে জানে। কিছু বোঝবার উপায় নেই।

পাঁচুর রান্না হয়ে গেছে। তিবড়িতে এখনো আগুন। বাতাসে শীত মালুম দিচ্ছে বেশ। তিবড়ির উপরে হাত তুখানি মেলে ঘরের কথাই ভাবছে সে। বউঠান কী বিয়োল, কে জানে।

সেই সময়ে জলের বুকে দেখা দিল স্পষ্ট দাগ। গলুই থেকে ডাক দিল নিবারণ, পাঁচু, পাটা জালটা কমনে আছে?

এমন অসময়ে পাটা জালের খোঁজ কেন। বলল, এই গলুয়ের নীচখানটিতেই আছে? কেন?

জবাব নেই। তাকিয়ে দেখল পাঁচু, দাদার নজর দূরে। জল দেখে টের পেল, মাছের চক দেখা যায়। ভাঙা চক।

একটু পরে বললে, রান্না ভাত-ডাল ন্যে তুই পাশের নৌকোয় যা দি-নি। দেখি এক খ্যাপ মেরে।

পাঁচু গজগজ করে উঠল আপন মনে। সকলের খেতে বসবার সময়। একজন যাবে এখন খ্যাপ মারতে। কিন্তু কথা যখন একবার মুখ থেকে বেরিয়েছে, সে বেদবাক্যি। খ্যাপ মারতেই হবে।

এমন যে কেউ না যায়, তা নয়। তবে দুজনে যায়। নিবারণ সাইদার যায় একলা। ভয়েরও তেমন কিছু নেই। জোয়ারের বেলা, উপরের টান। বার-সমুদ্রে যাওয়ার ভয় নেই।

বশীর বলে উঠল, কিসের চক দেখলে নিবারণদাদা?

—বাটা চক।

পাঁচু বলে উঠল, কিন্তুন পাটা জাল ন্যে একলা কী করে পারবে?

নিবারণ বলল, পাটা জাল কি আর পাততে যাচ্ছি। খানিকটে তুলে ন্যে ফেলব কোন ফোড়নের মুখে। চক তাইড়ে ন্যে যাব খালের দিকে।

নৌকো নিয়ে ভেসে গেল একলা। চকের পিছন পিছন হারিয়ে গেল বাঁকের মুখে। ঠাহর করে দেখেছে পাঁচু, চকভাঙা বাটা মাছের দঙ্গল ভেসে চলেছে জোয়ারের টানে। একলা একলা পেছন ধাওয়া করে, ওই মাছ কোণঠাসা করা কি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু কে বলবে। না পারলে, ঘুরে এসে শুয়ে থাকবে চুপচাপ। খেতে বসে দুষবে খালি পাঁচুকে। কেন? না, ভাত কম, পেট কিছুতেই ভরে না। ভাবখানা যেন পাঁচু বেশী খেয়ে ফেলেছে।

আর দশজনে খেতে বসল। কিন্তু ভালো লাগে নাকি খেতে। রাঁধলে দুটি মানুষের জন্যে। বেড়ে বসতে হল একজনের ভাত।

কোনোরকমে ছুটি খেয়ে, বসিরহাটের গণেশের নোকায় গা ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রইল অনেকক্ষণ। ভাতের নেশাটুকু কাটবার অপেক্ষা। তারপরে আর দুচোখের পাতা এক হল না। একসময়ে জলের দিকে তাকিয়ে দেখল, টান-ভাটার লক্ষণ। মনটা আনচান করে উঠল।

বশীরকে বলল, টান-ভাটা পড়ে গেল যে।

বশীরও বোধ হয় তাই ভাবছিল। সাইদার গুণীনের সে শাকরেদ। নিবারণ তার গুরু।

বলল, এটুস্‌খানি সবুর কর। গেছে গোনে, এবার টানের মুখে এসে পড়বে। গোনে অর্থাৎ জোয়ারে। সেই আশায় বসে রইল পাঁচু কিন্তু টান-ভাটা ছাড়িয়ে পুরো ভাটা দেখা দিল। অন্তরে অন্তরে হাঁকপাঁক করে উঠল মনটা। সে কিছু বলবার আগে বশীর নিজেই পাঁচুকে বললে, আসো দিকি আমার নৌকোয়, একবার ঠেলে যাই ওই বাঁকের মুখে, বিত্তান্তটা কী জেনে আসি।

গণেশ বলল, সেও যাবে। আর-একটি নৌকাও বেরুল। তিন নৌকা গেল উজান ঠেলে।

আকাশের সেই এক ভাব। বাতাসও তেমনি মাতাল। কেবল মেঘ যেন আরো জমাট বাঁধছে বনের মধ্যে। বেলা তখন বড় জোর দুটো। কিন্তু মেঘের ছায়ায় তা ঠাহর করার উপায় নেই।

ঠাকুরনের মোহনা। একটু পুবে খোঁচ দিয়ে হারিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। একটি কাকপক্ষীরও দেখা পাওয়া যায় না। মোহনার মুখ থেকে যতদূর চোখ যায়, সেও অকূল সাগর। ভাটার টানে, ঢেউয়ের মাতন লেগেছে সেখানে।

দূরে দূরে অনেকগুলি ফালি-ফ্যাকড়া নদী থেকে ঢুকে গেছে বনের জটার মধ্যে। অধিকাংশেরই নাম নেই। এক নাম,

নাগিনী কিলকিল করে গেছে এগিয়ে।

সবাই দেখে নজর উঁচিয়ে, পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। কোনো নৌকা দেখা যায় না। শুধু বাতাসলাগা বনের গোঙানি আর মাথা-ভাঙা ঢেউয়ের শব্দ। দুবার দুটি ফোড়নখালের মুখে দাঁড়াল তিন নৌকা। কে জানে, এর মধ্যে ঢুকেছে কিনা নিবারণ।

বশীর বলল, আর এট্টুস এইগে চল দি-নি। এত কাছে হলে, এতক্ষণ দেখা দিত। ফোড়নখালের মুখে আর কদ্দূর যাবে। ভাটা পড়ে গেছে।

আর-একটু এগিয়ে গেল তিন নৌকা। একটু একটু করে, অনেক-খানি এসে শব্দ শুনে ডাঙার দিকে হাল মারল সবাই। শব্দ শোনা গেছে হাল টানার। কিন্তু নিয়মিত নয়, যেন হাঁপিয়ে-পড়া মাঝির থেকে থেকে বৈঠা টানার বিলম্বিত ক্যাঁচকোঁচ শব্দ।

সামনেই আর-একটি ফোড়নখাল। আবার শোনা গেল, যেন ঝিমিয়ে পড়ে হালে টান দিচ্ছে কে। বোঝো, চকভাঙা মাছের পিছনে একলা আসার ঠেলা কতখানি। হাতে পায়ে বোধহয় আর তাগদ নেই।

পাঁচুর রাগ চড়ল। মারুক আর ধরুক, গুণীন হোক আর সাইদার হোক, দুটো কথা না বলে ছাড়বে না পাঁচু।

কিন্তু শব্দটা চাপা পড়ে গেল আবার। ফোড়নখালের মুখ গেছে বেঁকে। বুক থেকে জল নামছে হোগলার, বাতাসে দুলছে, কাঁপছে ভাটার টানে।

আবার শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই কাঁড়ারের মুখ দেখা দিল বাঁকের মুখে। কিন্তু কাঁড়ার তো নয়, গলুই। হাল পিছনে, মুখ উলটো দিকে।

লাগ ঠেলে, স্তম্ভিত হয়ে রইল তিন নৌকা। দেখল বাতাস আর ভটার টানে হাল নড়ে উঠছে। নৌকা খালি, মানুষ নেই। ভাটার টানে, আপনি আপনি আসছে ভেসে।

বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাল পাঁচুর। আগে নজর পড়ল বশীরের মুখের দিকে। সে মুখ দলা-দলা মেঘে থমথম করছে।

যেন আসতে মন নেই, এমনি করে ফোড়নের মুখে ঠেকতে এল নৌকা। একত্রিশ-হাত বাছাড়ি নৌকা, বাপের নৌকা পাঁচু আর নিবারণের। ওই তো দেখা যায়, ছইয়ের মুখছাট তেমনি খোলা। শিল-নোড়া তেমনি পাতা। শিলের কপালে বাড়ন্ত হলুদটুকু রয়েছে তেমনি।

কাছে আসতে দেখা গেল, কাঁড়ারে জাল, ছাঁকা বাটা মাছে তখনো জাল ভরতি। খোলা হয় নি।

কিন্তু মানুষটা!

কথা বলতে গিয়ে শব্দ বেরুল না পাঁচুর গলায়। চীৎকার করতে গিয়ে শুধু বুকের আর গলার পেশী গেল কেঁপে।

ঠাকুরনের মোহনায় যেন বাতাস গেল পড়ে। জলের টান গেল মরে। গোটা বন গেল থমকে। তিন নৌকায় পাঁচজন মাছমারা। সব যেন কোন এক মায়াবিনীর রাজ্যে এসে বোবা হয়ে গেল।

খালি নৌকায় লাফ দিয়ে উঠল বশীর। ছইয়ের পাশ দিয়ে গিয়ে হাল ধরে বলল, ঢোকাও, সবাই লৌকো ঢোকাও ফোড়নখালে, একবার দেখে আসি।

চার নৌকা ভাটি ঠেলে ঢুকল খালের মধ্যে, হোগলা-হেঁতালের গহনে। সুঁদুরির ঠাসাঠাসি, নেলো, বিষকটারি আর বাসক ঝাড়ে বাতাসের ক্রুদ্ধ শাসানি। অশেষ আকাশ এখানে শাসিত, নির্বাসিত অসূর্যম্পশ্য এই অরণ্যে মেঘে মেঘে নেমেছে সন্ধ্যার ঘোর।

চার হালের মচমচ শব্দ। গণেশ কাশছে খকখক করে।

সর্পিল খাল বেশীদূর যেতে পারে নি।

বন আছে, খাল আছে, একত্রিশ-হাত বাছাড়ি নৌকাখানি আছে। পাঁচু চেয়ে দেখছে, পুটকে-পরানী বাটা মাছগুলি এখনো চকচক করছে। নিষ্পলক চকচকে গোল চোখে যেন সবকিছু দেখছে। নির্দয় শমনের ভাবলেশহীন দৃষ্টি। ওই তো ছইয়ে হুঁকো-কলকে, গলুয়ের গুঁড়োর ওপর পোড়া বিড়ি, দেশলাইখানি। ছইয়ের মুখছাটের কাছে গামছা, তেলচিটে গেঞ্জি নিবারণের। সব আছে।

বাড়িতে আছে বউ। কোলে নিয়ে বসে আছে নবজাতক।

মানুষটা নেই। কী এক সর্বনাশের খেলায় মেতে, সে যেন খালের ধারে বনের আড়াল দিয়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। চারদিকে অশরীরীরা ঘিরে চলেছে চার নৌকা।

খালের ধারে ধারে, পলিমাটি পড়ে বকের মতো তীক্ষ্ণ চোখে বশীর পায়ের চিহ্ন খুঁজল। মানুষের নয়, আর-কিছুর পায়ের চিহ্ন, যার নামও করতে নেই মনে মনে। সে চলে নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে, গাছের আড়ালে আড়ালে। চোখে তার আগুন, গায়ে কালো ডোরা কাটা। কপিশ চোখে চেয়ে দেখল, কোনো গাছের মুণ্ডু মুচড়ে দুমড়ে গেছে কিনা কেউ। এ তো এমনি মাছমারার মরণ নয়, গুণীন লোপাটের ষড়যন্ত্র হতে পারে মহা দানোর। কে বলতে পারে, চকভাঙা মাছের লোভানি দিয়ে ডেকে আনে নি সে। কিন্তু কোনো চিহ্ন নেই। খাল শেষ হয়ে এল, বন হল আরো গভীর। মানুষটা নেই।

হাল ছেড়ে, দু হাত মুখের উপর তুলে পাঁচু গলা ফাটিয়ে, চীৎকার করে ডাক দিয়ে উঠল, হেই দা—দা!

বাতাসের শব্দ উঠল দ্বিগুণ। গাছে গাছে ঘর্ষণে ক্রুর দাঁত
কড়মড়ানি গেল শোনা। পাঁচুর ডাক গাছে গাছে ডালে ডালে গে
পেঁচিয়ে জড়িয়ে। সকলের বুকের মধ্যে পাক দিতে লাগল, হে
দাদা !···এমন ভয়ঙ্কর ডাক আর কেউ কোনোদিন যেন শোনে নি।

বশীর নৌকা ঘোরাল। সাইদার আজও গেছে, কালও গেছে
সমুদ্রে আবার জোয়ার আসবে, ভাটা নামবে। মাছের চক আস
ভেসে মহাসমুদ্রের বুক থেকে। শুধু এই বন যাকে একব
নিশ্চিহ্ন করেছে, তার চিহ্ন আর কোনোদিন পাওয়া যাবে ন
কোনোকালে যায় নি। এ শুধু সাইদারের যাওয়া নয়। গো
সাইয়ের নিপাত যাওয়ার সংকেত এবার বনে, জলে, আকাশে
সবাইকেই ফিরতে হবে এ বছর আজকের মধ্যেই। নইলে আর বে
ফিরবে না।

তবু প্রৌঢ় পাঁচু, অবোধ শিশুর মতো, আরো জোরে, প্রাণ
চীৎকার করে, আবার ডাক দিল, অই দা-দা-গ-অ-অ-অ !

বাতাসের টানে সে ডাক বন থেকে বনান্তরে গেছে; মাতর
ঠাকুরন, রাইমঙ্গলের জোয়ারে জোয়ারে গেছে অনেক দূর। অ
সাগরের দ্বীপে দ্বীপে ঘুরেছে। মানুষটা নেই।

সেই রাত্রেই এল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। অগ্রহায়ণের সেই ঝড়, নিপ
দিয়েছিল ঘরসুদ্ধ !

হঠাৎ থতিয়ে চমকে ওঠে পাঁচু। ডাকে পাঁচুর বুকের ম
দাদাকে ডাকে যেন কে বুকের মধ্যে বসে।

তারপরে দূর সমুদ্র থেকে যেন তার চোখ পড়ে বিলাসের দি

থাক সে-সব কথা। সামনে ছেলেটা বসে রয়েছে। সে-সব কথা ভেবে এ শুভযাত্রায় কেন, মন ভার করে থাকবে। ছেলেটার দিকে তাকাল সে। নৌকার পেছনে, কাঁড়ারের সামনে, তিবড়িতে ফুঁ দিচ্ছে তলদা বাঁশের নল দিয়ে। নৌকার তোলা উনুনের নাম তিবড়ি। ভাত বসিয়েছে ছেলে। বোধ হয় ভেজা কাঠ ভালো জ্বলছে না বলে ওশকাতে হচ্ছে।

দাদার বড় ছেলে। নাম বিলে। তেঁতলে বিলেস, অর্থাৎ তেঁতুলতলার বিলাস। যেন দ্বিতীয় নিবারণ মালো। এমনি চেহারাখানাই ছিল দাদারও। কালো কুচকুচে রঙ, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রঙ মাখা চকচকে মূর্তি। নাকটি ছোট। চোখ দুটি ঈষৎ গোল। ভ্রূ কুঁচকে মুখ তুলে তাকালে মনে হয়, কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মতো কোঁচকানো কালো চুল। যেন জাতসাপের ডিম-ফোটা শলুই কিলবিল করছে মাথায়। হাসলে পরে চোখ ঢেকে যায়। চোখ নেই, নাক নেই, খালি একমুখ হাসি। সাক্ষাৎ নিবারণ মালো। বনে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকলে রঙে রঙ মিশে যায়। গাব-আঠা-মাখানো নৌকার কাঁড়ারে শুয়ে থাকলে, মানুষ থাকলে টের পাওয়া যায় না। এমন কালো।

পাঁচুর বাপের চেহারাও কালো। তবে এমনটি নয়। এমন কালো নাগের মতো চকচকে নয়। চুলের রকমও নয় এমন। পাকানো চুলের ভাঁজে ভাঁজে যেন কত গুণ, কত অন্ধিসন্ধি রেখেছে পুরে। পাঁচুর বাপেরও বাপের চেহারা ছিল এমনি। পাঁচু দেখেছে তার সেই ঠাকুর্দাকে।

ধলতিতার রাম মালো বলত নিবারণকে দেখিয়ে, শুনিছি, এমনি ছেল ওয়াঁর মুত্তিখানি। মালোর ঘরের সেই পেথম পুরুষ।

না, মালো জাতের কথা বলছি নে। এই তোমার সেকালের বাদার মালোদের পেথম পুরুষের কথা বলছি। সে কি আজকের কথা। চোদ্দ পুরুষেরও চোদ্দ পুরুষ আগে। ওয়াঁর কল্যেণেই সমুদ্দুর পারের মালো বংশ বড় হয়েছেল, ছইড়ে পড়েছেল। মালোরা ত্যাখন রাজা হয়েছেল দেশের। শুনেচি, দক্ষিণ হ্যে হেঁটে এয়েছেলেন। হ্যাঁ, সমুদ্দুরের ওপর হ্যে, দিব্যি পা ফেলে ফেলে হেঁটে এয়েছেলেন। দিগম্বর কালো কুচকুচে এক পুরুষ, কোঁচকানো চুল ফণা ধরে আছে কপালের ওপর। গায়ে আর কিছু নেই। হাতে এক মস্ত কঁ্যাচা। ডাঙায় এসে ওঁয়ার বড় বেপদ হল। দক্ষিণ রায়ের রাজ্যি। ছেড়ে কি কথা কয়। ত্যাখন অবশ্যি ধলতিতেও বাদা। আসার পথে নড়ুই হল দক্ষিণ রায়ের চেলাদের সঙ্গে। জিতলেন উনি। দক্ষিণ রায় খুশী হয়ে মস্ত একখানি গায়ের ছাল দিলেন ওয়াঁকে পরতে। ওই হল ওয়াঁর আসল মুত্তি। বাঘের-ছাল-পরা, কঁ্যাচা-হাতে কালো কুচকুচে পুরুষ। তোমার সমুদ্দুরের পারি ধরেই ছেল ওয়াঁর রাজ্যি।

রাম মালোর কথার মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে কে জানে। কিন্তু আদিগন্ত সমুদ্র, ফণা তুলে গর্জাচ্ছে খলখল ক'...। সেই সমুদ্রের উপর, কাঁচা হাতে ঘুরছে একটি মানুষ-মূর্তি। বাঘছাল তার পরনে। শিকারীর নিবিষ্ট চোখে খুঁজছে মাছ। এ স্বপ্ন দেখতে দেখতে যখন নিজেদের দিকে ফিরে তাকায়, তখন যুগপৎ ভয়ে ও গর্বে ভরে ওঠে পাঁচুদের বুক।

পাঁচু তার দাদাকে সেই জন্যে আরও সম্মানের চোখে দেখত। দক্ষিণে গিয়ে কি সমুদ্রে, কি ডাঙায়, দাদার পাশে পাশে চলতে রাম মালোর গল্প মনে পড়ে যেত। আর দেখে নিত মিলিয়ে। ঠিক যেন সেই পুরুষ। গুণ কি আর সাধে জানত! তেমনি

চেহারাখানি বিলাসেরও। তেমনি হাক-ডাক তেজ-জেদ, সবই আছে। কাজে যদি মন দেয়, তাহলে খুবই দড়ো। তবে, দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। আর বাপ-মরা ছেলে। বাপের ব্যাটা তো! সেই বাপ না হলে ওর রাশ টানবে কে। তাই ছেলের একটু উড়ু উড়ু ভাব।

বয়স হল এক কুড়ি দুই। বাপ থাকলে এতদিনে ছেলের বিয়ে হত। ওর বাপের দরুন সংসারে লক্ষ্মী ঠাঁই নিয়েছিল। ঠাকুর্দার আমলে ছিল তাদের নৌকা। বাছাড়ি জাল, টান জাল, পাটা জাল, কোনো কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু এক পুরুষেই সব কাবার। বাপের অবস্থা ভালো যায় নি। আবার নিবারণের সময় নৌকা হল। এই নৌকা একত্রিশ-হাত বাছাড়ি নৌকা। সেগুন কাঠের নৌকা, জলে উলটাবে, তবু ডুববে না।

গত মাঘ মাসে নৌকা বাঁধা পড়েছিল মহাজনের কাছে। মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়। আষাঢ়ের আজ অর্ধেক পার হয়ে গেল। এতদিন বাদে দেনার উপরে আবার নতুন মুচলেকা দিয়ে, নৌকা ছাড়ানো হল। আজ পাঁচ বছর ধরে, ফি বছরে নৌকা বাঁধা পড়ছে। চক্রাকারে বাড়ছে দেনা।

কিন্তু উপায় কী। এ সময়ে যেমন করে লোক গঙ্গায় আসতেই হবে। প্রতি বছরই আশা থাকে, এ বছর হয়তো মহাজনের ঋণ শোধ হবে। হয় না। যদি গঙ্গার দয়া হয়, তবে কয়েক মাস চলে। তারপর আবার যে-কে-সেই।

তবু আসতে হবে। যার নৌকা নেই, মহাজনের কাছ থেকে নৌকা ভাড়া নিয়েও সে আসবে। এ মিঠে জলের টান, বড় টান। যদি দেয় তো, গঙ্গাই দেবে হাত ভরে। না দিলে মরণ।

তাই সবাই আসছে এদিকে। উত্তর-দক্ষিণ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকা আসছে, আসবে! পুবের আরো উঁচু, সেই বনগাঁয়ের

লোকেরা যাবে ইছামতী দিয়ে। যাবে সেই গোপালনগর, মোল্লাহাট, গরিবপুরের পাশ দিয়ে। ইছামতী থেকে পড়বে খালে। খাল দিয়ে চূর্ণী নদীতে। রানাঘাটের সীমানায়। খবর নেবে আগে থাকতে, বনগাঁয়ের পুল খুলবে কবে। সেই রেলপুলের গেট সাতদিনে খোলে একবার। আগে গিয়ে পড়লে, যে কদিন থাকতে হবে পুলগেটে, সেই কদিন একেবারে বেকার বসে খেতে হবে। গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না। গোনা দিনের চাল! বসে খেতে বড় কষ্ট হয়।

কিন্তু আসতে হবে। যেদিক দিয়েই হোক। যদি মাছমারা হও, তবে মাছের পিছে পিছে আসতে হবে। সে জলে, তুমি ডাঙায়। তার মরণ, তোমার জীবন। এই নিয়ম! জীবন-মরণের পাশাপাশি বাস। তারো মন-মেজাজ বুঝতে হবে। জানতে হবে রীতিনীতি। কোন স্রোতে, কেমন টানে, কত তলায় তার গতিবিধি। সে যখন যেখানে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে।

সে কখনো নোনায়, কখনো মিঠেনে। বিশেষ, মাছের রাজা ইলিশ। এখন নোনা জলে তার মন নেই। সে আসবে ঘোলা মিঠে জলে। শুধু জলে নয়। যেখানে যত টান, তত টান ঠেলে আসবে সে। সে গা-ভাসানে মাছ নয়, উজানী মাছ। এখন ঠেলে সে ওপরে উঠবে। কেন উঠবে? না, এমনি এমনি নয়। কাজ আছে তার। কাজ...

সহসা নজর পড়ে পাঁচুর। নজর পড়ে ভাইপো বিলাসের দিকে। দেখো ছোঁড়ার কাণ্ড। তিবড়ি নিভে ভুস্। ছেলে আমার হাঁ করে তাকিয়ে আছে শহরপারের দিকে। ওই যে শহরের গাড়ির শব্দ। ঘন ঘন ঘন—হুশ! ঘ্যাঁচ। গাড়ি দেখা যায় না। সামনে সব পেল্লায় পেল্লায় মালগুদাম। তার পরে সব আকাশছোঁয়া বাড়ি। তার পারে আকাশের [illegible]

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো চিকচিক করে নীলচে বিদ্যুৎ চমকায় অন্ধকার আকাশে। দেখে এসেছে পাঁচু। এক রকমের বিজলী গাড়ি। চেপে দেখে নি কোনোদিন। শুনেছে, নাম তার টেরামগাড়ি।

প্রথম প্রথম পাঁচুও চমকাত! সে কি আজকের কথা। নিবারণের সঙ্গে সেই প্রথম হাতেখড়ি বছরগুলো যাচ্ছিল তার। বছর তিনেক চমকেছে। জাল বুনেছে, কিংবা অমনি তিবড়ি জ্বালিয়ে রান্না করেছে। আচমকা অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ-চিকচিক দেখে চমকে উঠেছে। নিবারণ হেসে উঠেছে হা হা করে। তবে ওই পর্যন্ত। কোনোদিন পাড়ে উঠে দেখবার সাধ হয় নি। শহর বলে কথা! কিসের থেকে কী হয়, কে জানে। তারপর নিবারণ একদিন নিজে হাত ধরে নিয়ে গেছল। পরে বয়সকালে দেখে-দেখে পাঁচুর চোখ পচে গেছে। শেষের দিকে নিবারণের একটু শহর-টান হয়েছিল। পাঁচুকে বসিয়ে রেখে শহরে উঠে যেত। বলে যেত, বোস্, আসছি ঘুরে।

ঘুরে যখন আসত, চোখ একেবারে ভাঁটার মতো লাল। মুখের বাক্যি হরে যেত। ভয়ে পাঁচুর মুখে কথা সরত না। নিবারণ এসে কথাটি না করে গলুইয়ের গুড়োর ওপর একেবারে চিতপটাং। রান্না ভাত থাকত পড়ে। সারা রাত্রে আর সাড়া পাওয়া যেত না। সেই ভোরবেলা উঠে গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিয়ে বসত আমানি পান্তা।

আশেপাশে আর সব জেলে-মালোরা বলত, ওস্তাদ মানুষদের ওই বড় মুশকিল। শহর গাঁ বাদা সমুদ্দুর অনেক দেখেছে ঘেঁটেছে; ঘুরেছে কিনা! ও-সব মানষের এট্টু আধটু অমন হবেই। সম্লার হয় না।

তা ঠিক। ওস্তাদ না হয়েও বয়সকালে পাঁচু কয়েকবার তাড়ি গিলেছে। চৈত্রমাসে প্রায় প্রতি বছরই সন্ন্যাস নিয়েছে। না নিয়েই

বা উপায় কী। মাছমারার ঘরে কয়েক টোটার এক টোটা হল চোত-টোটা। অর্থাৎ চৈত্রের মন্বন্তর। যাকে বলে, চোত-পোড়া। এর আগে যায় পোষ-পোড়া। পোঁড়ার অভাব নেই। ফাল্গুনেও কিছু সুদিন আসে না। গোটা শুকনো, মরশুমটা সমুদ্রের কাল। নোনার সুদিন। তখন সাই যায়। নাম যার সমুদ্র-যাত্রা। জীবনের সবচেয়ে বড় যাত্রা। ওতে অবিশ্যি তোমার মতান্তর আছে। যা দেবেন তা মা গঙ্গা। সমুদ্রে গিয়েও, মানুষকে কি খালি হাতে ফিরতে হয় না! হয়, তাও হয়। জেলে, মালো, ব্যাপারী, কারবারী, আড়তদার, সব মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। এদিকে হাসনাবাদ, ওদিকে ক্যানিং। লাইনবাঁধা মোটর-লরি আর চাকা-চাকা বরফ নিয়ে বসে আছে শহরের কারবারীরা। মস্তবড় মানুষ সব। কলকাতায় তাদের বাড়ি-গাড়ি। বলে, লাখ টাকার মালিক। তা হবে! পাঁচু দেখেছে। তাদের হাতে পাঁজা-পাঁজা নোট। গুনে দেয় [illegible] হাতে। সে এক কাল। ওই টাকা। সুদিনের পাশে পাশে ফেরে ছুর্দিন। এও সেই পাশাপাশি বাস জীবন-মরণের। এই যে, টাকা রয়েছে সঙ্গে!

অভাব নেই কোনোটিরই। মানুষ আর টাকার। সময়ে ওইতেই বড় টান ধরে যায়! মানুষ ফলায় টাকা! দক্ষিণ রায় মশাই ফেরেন ডাঙার মানুষের খোঁজে আর ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘাপটি মেরে ফেরে আর-একদল! তারা সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে সাইয়ের ওপরে। টাকা আছে যে! বড় শেয়ালের রাজ্যে বিনা খাজনায় মালিকানা করে এরা। তারা সুন্দরবনের ডাকাত।

তাদের হাতেও একবার পড়েছিল পাঁচুরা। কাছেপিঠে ফেরে তারা সব সময়েই। তবে কিনা, এ সংসারে প্রাণের মায়া আছে যাবৎ জীবন। [illegible]

রায় থেকে চুনোপুঁটিও। ঝাপ দেবার আগে ডাকাতদলকেও একবার ভেবে নিতে হয়। হোগলা-হেতাল বনে, নিশীথ রাত্রে যখন সর্বনাশা অন্ধকারের হাজার চোখ পিটপিট করে জোনাকির আলোয়, ফেউয়ের ডাকে ভয়াবহ সন্দেহে কাঁপে বুকের মধ্যে আর মনে হয়, দিকে দিকে ভাটার মতো চোখ জ্বলছে চার পাশে, তখন সেখানে কোনো আইন-কানুনের বালাই থাকে না। হয়, প্রাণ দিতে হবে, নয় ধনপ্রাণ সব নিয়ে যেতে হবে। মাঝামাঝি কোনো রাস্তা নেই। তাই ঝাঁপ দেবার আগে একবার ভাবতে হয়।

নিবারণ সাইদারকে জব্দ করা বড় সহজ ছিল না। চারদিকে চোখ যেমন সজাগ, তেমনি সাহস। একটু সন্দেহ হল তো, একলাই নিজের নৌকার নোঙর তুলে ছুটল। রাতের অন্ধকারকেও পরোয়া নেই। মাঝখান থেকে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত পাঁচু। সেও যে একই নৌকায়। কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। বললেই খেঁকিয়ে উঠত। অত যদি ভয় তো, বউয়ের কাছে থাকলেই পারতিস। সমুদ্দুরে আসবার কী দরকার ছিল।

একবার গণ্ডগোল হয়ে গেল। ট্যাকের মুখে অর্থাৎ নদীর মাথায় রান্নাবান্না চেপেছে সব নৌকায়। তিবড়ির আগুনে আর ধোঁয়ায়, অদূরের ঘন জঙ্গল কাঁপছে অস্পষ্ট আলোছায়ায়। কত নম্বরের ট্যাক আজ আর মনে নেই। কাঁড়ারের সামনে বসে কালো কালো ছায়ার মতো মানুষ সব। রাঁধতে রাঁধতে কেউ জাল ছেঁড়া ছিদ্র সারছে, ছোল কষছে। শীতের দিন, গায়ে মাথায় কিছু ঢাকাঢুকি দিয়ে বসেছে সবাই। ঠাকুরের নাম করছে কেউ কেউ। ট্যাকের মুখে যেন হাট বসেছে একটি।

নৌকার হাট। অর্থাৎ শাবর। তখন ভাটার টান। গায়ে গায়ে সব নৌকা। এক-আধ হাতের ফারাক আছে। রাখতে হয়। প্রাকৃত

কাজকম সারবার জন্যে একটু ফাক-ফারাক দরকার। ভাটা টানও বড় টান। বড় সাবধানে রাখতে হয় নৌকা। একটি যদি ফাঁক পেয়ে ভাটার টানে ভাসে, তবে একেবারে সাগরে আর ফিরবে না। এমনও কত গেছে। বাদবাকিরা সভয়ে বিস্ময়ে দূর সমুদ্রের ঝিকিমিকি অন্ধকারের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে দেখেছে। দিনের বেলা রোদের ছটায় বড় বড় হ্যাঁকা আছড়ে পড়ে গলানো রুপো যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে চৌদিকে। নেই, কোথাও পাত্তা নেই সেই নৌকার। সবারই বুকের মধ্যে কেমন যেন চমকে চমকে ওঠে। শোনে কান পেতে। যেন সেই আকাশের কোল থেকে শব্দ আসছে, অ গ ভেইসে গেলুম গ, বাঁচাও।

তারপর আবার জোয়ারের মুখে হয়তো দেখা যায়, নৌকা এসেছে ফিরে। ঠেকে আছে হয়তো কোনো ট্যাকের মুখে। সেগুন কাঠের নৌকা যে! ছই আছে কি নেই। জিনিসপত্র নেই, মানুষও নেই। নেই। চোখের সামনে সমুদ্রের জল এক পলকের জন্য লাল হয়ে উঠে, আর টুকরো টুকরো মাংস,—জ্যান্ত মানুষের।

সবচেয়ে বড় রকমের ভোগ ছিল অনেক সন আগে। সে ছিল খুলনার ওদিককার পানসা সাই। পানসা হল, ভাঙন, ভেটকি, বাটা, ভোলা মাছের পাটা জালের সাই। খুব বড় সাই ছিল। নৌকা ছিল কুল্যে প্রায় ছত্রিশ গণ্ডা। নৌকাপিছু তিনজন মাঝি। তার মধ্যে কুড়িগণ্ডা গিয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে। বোধ হয় পেল্লায় মাছের চকের দেখা পেয়ে পেছু নিয়েছিল। এ তো আর লঞ্চ স্টীমার নয়,—মাছ। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে না হাওয়া। কুড়িগণ্ডা নৌকা কী করেছিল কে জানে। নিশ্চয় দেখ-দেখ করে পেছন ধাওয়া করেছিল। হয়তো ঘিরেও ছিল মাছের বিরাট চক। ক-নৌকা বোঝাই করেছিল, কে জানে! ওর যে বড় দুর্জয় টান!

নেশার চেয়েও বড় জিনিস। তখন আর ঘর-গৃহস্থ, সামনে পিছনে, কোনোকিছুর খেয়াল থাকে না। মনে থাকে না টাকার লালসা। আদিগন্ত সমুদ্রের ফোঁসানি গর্জানি কানেও ঢোকে না কারুর। চক ঘিরে পাটাজাল ফেলে তুলে ফেলা নিয়ে কথা। এই ফেলে তুলতে তুলতেই সে কতদূর টেনে নিয়ে যায়, সে খেয়াল হয় পরে। কে জানে, সেই কুড়ি গণ্ডা কত দূরে গিয়েছিল।—যখন খেয়াল হয়েছিল, তখন সমুদ্রের কোন্ সীমানায় গিয়ে পৌঁছেছিল, কে জানে। কিন্তু আর ফেরে নি কোনো দিন, একটিও না। কুড়ি গণ্ডা নৌকা, নৌকা-পিছু তিনজন মানুষ। কূলছাড়া, দিকহারা, এতগুলি মানুষের হাঁকেও সমুদ্রের হ্যাঁকা থম খায় নি। তাঁর আকাশজোড়া, কালো কুচকুচে লকলকে ফণা। সেই কোন্ গহনে, পাতালে তাঁর শরীর গিয়ে ঠেকেছে! স্বয়ং নরনারায়ণ উদ্ভাসিত ওঁয়ার কোল জুড়ে। ভগববানের আশ্রয়। উনিই বোধ হয় ফুঁসে উঠেছিলেন উল্লাসে। উনিই তো মহাসমুদ্রের বেশে জুড়ে আছেন তাবৎ সংসার। এবার আর মাছের চক নয়, মানুষের চক।

তুমি মার মাছ, তোমাকে মারেন আর-এক জন। সংসারের নিয়ম। কুড়ি গণ্ডাটা ব্যতিক্রম, তবে মাছমারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয়। তার মরণের লিখন একটু অন্যরকম হয়। যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়। বাইরে মর আর ঘরেই মর। নিদেনকালে একবার রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার।

মাছের চক ভুলিয়ে নিয়ে গেছল মানুষের চক। মাছমারাদের ঘরে, মহাসমুদ্রের মহাক্ষুধা এমন রুদ্ররূপে আর দেখা দেয় নি। জিজ্ঞেস করো পুরনো মানুষদের, টাকি-হাসনাবাদের বুড়ো মেছুড়েদের, বসিরহাট বীরপুর পুরোখোঁড়গাছিদের, বুড়ো ব্যাপারী আড়তদারদের।

সমুদ্রের সঙ্গে যাদের কারবার, জিজ্ঞেস করো তাদের। সবাই জানে সেই কুড়ি গণ্ডার কথা। এখনো যারা চকের পেছন নেয়, তাদের একবার মনে পড়ে বোধ হয় সেই কথা। কান পাতলে শোনা যায় নাকি সেই অগুন্তি মাছমারাদের কান্না।

শোনা যায় বৈ কি! ঘোর নিশিতে সাইয়ের জেলেরা যখন ঘুমোয় ছইয়ের মুখছাটের কাছে, আধখানা মাদুরে শুয়ে আর আধখানায় গা ঢেকে, তখন সুঁদুরীগাছের বাতাসে, দূর সমুদ্রের বুকে শোনা যায় সেই কান্না। অচেতন ঘুমের মধ্যে তখন লাগে নিশির ঘোর।

তারা তোমার মতোই বউ-ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী রেখে এসেছিল ঘরে। বলে এসেছিল অনেক কথা। ঋণ শোধ করবে মহাজনের, ভাঙা ঘর সারাবে, চাওয়া-পাওয়া মেটাবে ঘরের মানুষের, বিয়ে দেবে ছেলেমেয়েদের। কত জনার কত ভাবনা, কত আশা। ঠিক তোমার মতো।

তাই সারাদিন পরে তাদের কান্না এসে বাজে তোমার কানে। এই সমুদ্রের বুকে তোমার ঘুম আচমকা ভাঙিয়ে জানান দিয়ে যায়। মনে করিয়ে দিয়ে যায়। তাদের প্রাণ থেকে মানুষের লীলা বিদায় নিয়েছে। এই আদিগন্ত জলে, কুড়ি গণ্ডাকেও বড় একা লাগে তাদের। তারা তোমাকে ডাকে। কখন কোন্ বেশে এসে যে ডাকবে, তুমি জান না।

তবে অভয় আছে সঙ্গেই। দলের মধ্যে থাকে গুণীন। সে জেগে বসে পাহারা দেয়। বিপদ বুঝলে, সে-ই রক্ষে করে। এর মধ্যে তো না-বলার কিছু নেই। সকলেই জানে যারা সমুদ্রে এসে আর ফিরে যায় না, তারা ভিন্ন রূপ ধরে বাস করে এখানে। তাদেরই মায়া ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। মায়াবীরা নানান বেশে তোমাকে ডাকবে। কখনো পান্‌সা চক হয়ে লোভ দেখাবে, ইলিশ মাছের চক

হয়ে ডেকে নিয়ে যাবে। এ-সব ব্যাপারে গুণীন যা বলবে, তা-ই মানতে হয়। না শুনলে, মরণ।

যাক, সে-সব অনেক কথা। যেবারে সেই গণ্ডগোলটা ঘটে গেল, সেবারে সেদিনে, ভাটার সময় ট্যাকের মুখে পাঁচুদের সাই। রান্না চেপেছে, কোনো কোনো নৌকায় ঢুকে গেছে রান্না-খাওয়ার পাট। ঠাকুরের নামের সুরে ঘুম-ঘুম আমেজ লেগেছে অনেকের। পাঁচু তখন খাড়ি মুসুরির ডালে কাঠের কাঁটা ঘুঁটছে। তিবড়িতে ফোঁসফোঁস করছে আগুন।

সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছে, দাদা নিবারণ সুতোর কাটিম কোলে ফেলে সেলাই করছে জাল। কিন্তু চোখের নজরটা যেন কেমন কেমন। মাথার সহস্র-শলুই কিলবিলে চুল বেয়ে পড়েছে ঘাড়ে। গালে দাড়ি নেই। কিন্তু থুতনিতে আর গালে গোঁফদাড়ি বড় হয়ে ঝুলে পড়েছে।

সাইদার কিনা! সমুদ্রের নিয়ম, যারা আসবে, সেই মাছমারারা চুল-দাড়ি কাটবে না, কাপড় ছাড়বে না। করলেই অনাচার। যখন যেমন, তখন তেমন। জলের আচার-বিচার ডাঙায় চলে না। সমুদ্রে এলে, সমুদ্রের মতো। অনাচার করলে মরণ। ওই একটি জিনিস, মরণ। জীবনের শেষ আর প্রথম, এইখানে পদে পদে ফেরে। জীবন-মরণের পাশাপাশি বাস যে!

তবে দিনকাল বদলে গেছে। আগের মতো কিছুই নেই আর। এখন দু-শো আড়াই-শো লোকের হয়ে শুধু সাইদার না কামালে, না কাপড় ছাড়লেই হয়। তাই নিবারণের মুখে গোঁফ-দাড়ি, মাথা-ভরতি চুল। তিবড়ির আগুনের আলোয় পাঁচু দেখলে, সামনে তার বসে আছে হিংস্র বাঘ। নিবারণের নাকের পাটা উঠছে ফুলে ফুলে। চোখ জ্বলছে ধ্বক ধ্বক করে। নজরে যেন শিকার খোঁজার

ছল। কিসের যেন গন্ধ শুঁকছে। একবার দেখছে বনের দিকে, আর একবার বারোগণ্ডা নৌকার উপর। পাঁচুর মনটা কু গাইতে লাগল। এ তো রকমসকম ভালো নয় গুণীনের। কিসের সন্ধান পেল, কে জানে। বুকের ছাতি শক্ত হয়ে উঠেছে। হাতপায়ের পেশী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আওড়ের জলের মতো। দানোর খোঁজ পাওয়া গেল নাকি।

পাঁচুর আর ডালের কাঁটা ঘোঁটা হল না। দেখল, দাদা তার ছইয়ের ওপর লটকানো লগার উপরে জাল ছাড়িয়ে দিল। দিয়ে ডাকল চুন্নুরী বশীরকে। বশীরও গুণীন মানুষ, তবে জোয়ান বলেই নাম বেশী। বশীর আসতেই নিবারণ বললে, কিছু টের পাচ্ছ বশীর?

চোখে চোখ মিলল দুজনের। যেন ঘষাঘষি হল চকমকি পাথরে। তাতে, অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল পাঁচুর চোখে। সেও টের পেল।

বশীর বলল, একবার ধরেছে আমার চকে। তবে, ত্যাখন ত্যাতো গা দি নাই। তোমার চকেও য্যাখন পড়েছে, ত্যাখন আর ভুল নাই নিবারণদাঁ। কবার দেখলে?

নিবারণ বললে, বার তিনেক। ওই সামনের হেতাল বন দেখতেছ, পেছনে তার সুঁদুরী। ওই সুঁদুরীর আগডাল থেকে মেরেছে।

বশীর বললে, আমুও তাই দেখেছি। শলাইয়ের কাটি জ্বালার ইশারা মনে হল।

নিবারণ ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, ওতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইশারাটা মারছে কাকে? সে তা হলে এই বারোগণ্ডার মধ্যেই আছে?

আবার চোখাচোখি হল দুজনের। সর্বনাশ! আট হাজার টাকা রয়েছে সাইয়ের সঙ্গে। উপায়? দিনমান নয় যে, নৌকার মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে যাবে। নোঙর তুললে টেনে নিয়ে যাবে ভাটার

সমুদ্র। অন্ধকারে দিক্‌শূল হয়ে, চির-জীবনের জন্যে সমুদ্রে ডুবে থাকতে হবে।

নিবারণ বলে উঠল, বশীর, বারো গণ্ডার বেশী লৌকো আছে তবে সাইয়ে। শালারা আছে আমাদের ভিড়ের মধ্যেই। কখানা লৌকো আছে গুনে দেখতে হয়।

আরে বাপ রে, সেকি চাট্টিখানি কথা! আটচল্লিশটি নৌকার মধ্যে যদি দুখানি বেশী থাকে, কে গুনবে এই অন্ধকারে। গাছ-গাছালির অন্ধকারে মাস্তুলও অস্পষ্ট। নইলে মাস্তুল দেখে গোনা যেত।

নিবারণ এক মুহূর্ত দূরের বনের দিকে তাকিয়ে রইল। শীত-আড়ষ্ট গভীর জঙ্গল, দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল জুজুবুড়ির মতো। চোখ ফিরিয়ে নিবারণ বলল, মনে হয়, পাড়ের দিকে আমাদের যে লৌকোগুলান ভিড় করে রয়েছে, ওদিকেই ওদের লৌকো আছে। ইশারা চলছে ওখেন থেকেই। এক কাজ করো। তুমি একদিক দিয়ে যাও বশীর, আমি এক দিক দিয়ে যাই। পিতি লৌকোর লোকজনই আমাদের চেনা। যে লৌকোয় দেখবে, সবাই শুয়ে পড়েছে এর মধ্যেই, ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কে আছে সে লৌকোয়। তিন ডাকে জবাব না পেলে ছেড়ে দেবে, নজর রাখবে। তবে আমাদের কিন্তু নোঙর তুলতে হবে।

নোঙর তুলতে হবে? এই ভাটার সময়ে? সমুদ্র টেনে নিয়ে যাবে যে।

নিবারণ বলল, এখন নয়, পরে। জোয়ারের মুখে। এই যে দেখছ, পুব কোলের তারাটা, বনবন করে ঘুরছে, নাল-নীল-হলদে রঙ বদলাচ্ছে, ওটা যাখন মাথার উপরে আসবে, ত্যাখন জোয়ার ডাকবে। তার দেরি আছে এখনো। ত্যাতখোনে ইশারাটা বন্ধ রাখতে হবে। যে লৌকো থেকে ডাঙায় ইশারা চালাচালি হচ্ছে, সেই লৌকোর

শব্দটি করতে না হ্যে, ওখানেই পেড়ে ফেলতে হবে। ইশারা না পেয়ে সুঁদুরী গাছে সুমুন্দিরা ওত পেতে বসে থাকবে আশায় আশায়। যেমনি জোয়ার আসবে, নোঙর তুলে ফেলে একেবারে ওপারে।

পাঁচু বলে উঠল, যদি পেছু নেয়?

নিবারণ বলল, ত্যাখন দেখা যাবে। পেঁচো, তুই ডাল নাম্‌মে খেয়ে নে, আর খাওয়া-ধোয়ার ফাঁকে খবর দে আশপাশে।

বলে উঠে গেল দুজনেই। বোঝো ব্যাপার! ডাল নামিয়ে তখন আবার খাওয়া। বলে, নজর সেই যে গিয়ে পড়ল আঁধার বনে, তাই আর নড়ল না পাঁচুর, সে খাবে! কোনো রকমে ভাত-ডাল চাপা দিয়ে রেখে, পাশের নৌকার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বললে সে। পাশের নৌকা বলল, তার পাশের মাঝিকে। দেখতে দেখতে অনুমান করা গেল, সাই সজাগ হয়ে গেছে। সাইয়ের সঙ্গে মোটরলঞ্চের সারেঙ, খালাসীও সজাগ।

দেখা গেল, বারোগণ্ডার উপরে তিন নৌকা বেশী। ঘাপটি মেরে আছে সাইয়ের তিনদিকে। সজাগ হয়েছে তারাও। উশখুশ করছে। তিন্ নৌকায় লোক আছে জনা সাতেক।

একে একে সব নৌকার তিবড়ির আগুন আর হ্যারিকেন নিভল। অন্ধকার দরকার। তারপর নিবারণ আর বশীর আরো দুজন বাছা লোক নিয়ে এক-এক নৌকায় ঢুকল। সাতটাকে খাপলা জালে ধরার মতো পিছমোড়া করে আর মুখ বেঁধে ঢুকিয়ে দিল ছইয়ের মধ্যে। কিন্তু গোটা বারো গণ্ডা-ই তখন ভয়ে কাঁপছে। সকলের নজর সুঁদুরী বনের আগডালে আর আকাশের তারার দিকে।

বশীর বলল, সব কটাকে একটা লৌকোর মধ্যে ঢুক্‌কে ছেইড়ে দেও ভাটার মুখে। যাক সমুদ্দুরে।

নিবারণ বললে, না। আগে বাড়িয়ে দমকায় শেষ। মওজুদ-করা টাকাটা চালান করে দিতে পারি তবেই রক্ষে। পানে মারলে, আমাদেরো পান নে়ে টানাটানি হবে। শালারা থাকবে এখানে নোঙর করে। সকাল বেলা এসে ওদের নোকেরা নে়ে যাবে।

সাইদারের উপযুক্ত কথা। প্রাণ নিয়ে কারুর সঙ্গে টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে, গহীন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলেই সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে।

সে যে শুধু সমুদ্রে তা নয়। খালে বিলে, এমন কি গঙ্গায়ও আসে সে নানান বেশ ধরে—যেমন এল এবার ডাকাতের বেশ ধরে। কিন্তু এ শুধু তোমাকে ভয় দেখানো, ওশকানো। তোমাকে হুঁশিয়ার করা। জলে ডাঙায় সমান নজরে হুঁশিয়ার থাকতে বলছে তোমাকে। ভাগ্য নিয়ে খেলা। একটু ভুল করবে, আর ফিরতে পারবে না প্রাণ নিয়ে। এইটা সংসারের নিয়ম। মানুষের সংসারের বাইরে তোমার বাঁচার জায়গা। যেখানে জীবনকে আড়াল করে মরণ সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে। ঐ হাতের পাশ কাটিয়ে ফিরতে হবে, যতক্ষণ বুকের ধুকধুকি চলবে।

সাতজনকে মারলে, আমাদের চোদ্দজন মরতে পারে। টাকার জন্যে ডাকাতেরা পিছন ছাড়বে না। ওইটাকে বাঁচাতে পারলে, ওদের স্বার্থ গেল। আক্রোশ থাকবে, কিন্তু তার রকম হবে আলাদা। সে ফুঁসবে, সুযোগ খুঁজবে। সবাই সুযোগ খোঁজে, না পেলে ফুঁসে মরে। তুমি মাছ না পেলে ফোঁসো। তোমার মরণও ফুঁসবে। যতক্ষণ পার, তাকে সুযোগ দিও না।

শব্দটি করতে না ছে, ওখানেই পেড়ে ফেলতে হবে। হুশারা না
সুঁদুরী গাছে সুমুন্দিরা ওত পেতে বসে থাকবে আশায় আ
যেমনি জোয়ার আসবে, নোঙর তুলে ফেলে একেবারে ওপারে।

পাঁচু বলে উঠল, যদি পেছু নেয়?

নিবারণ বলল, ত্যাখন দেখা যাবে। পেঁচো, তুই ডাল না
খেয়ে নে, আর খাওয়া-ধোয়ার ফাঁকে খবর দে আশপাশে।

বলে উঠে গেল দুজনেই। বোঝো ব্যাপার! ডাল নামিয়ে
আবার খাওয়া। বলে, নজর সেই যে গিয়ে পড়ল আঁধার বনে,
আর নড়ল না পাঁচুর, সে খাবে! কোনো রকমে ভাত-ডাল চ
দিয়ে রেখে, পাশের নৌকার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বললে
পাশের নৌকা বলল, তার পাশের মাঝিকে। দেখতে দেখ
অনুমান করা গেল, সাই সজাগ হয়ে গেছে। সাইয়ের স
মোটরলঞ্চের সারেঙ, খালাসীও সজাগ।

*দেখা গেল, বারোগণ্ডার উপরে তিন নৌকা বেশী। ঘাপটি মে
আছে সাইয়ের তিনদিকে। সজাগ হয়েছে তারাও। উশখুশ করছে
তিন নৌকায় লোক আছে জনা সাতেক।*

একে একে সব নৌকার তিবড়ির আগুন আর হ্যারিকেন নিভল।
অন্ধকার দরকার। তারপর নিবারণ আর বশীর আরো দুজন বাছা
লোক নিয়ে এক-এক নৌকায় ঢুকল। সাতটাকে খ্যাপলা জালে
ধরার মতো পিছমোড়া করে আর মুখ বেঁধে ঢুকিয়ে দিল ছইয়ের
মধ্যে। কিন্তু গোটা বারো গণ্ডা-ই তখন ভয়ে কাঁপছে। সকলের
নজর সুঁদুরী বনের আগডালে আর আকাশের তারার দিকে।

বশীর বলল, সব কটাকে একটা লৌকোর মধ্যে ঢুক্‌কে ছেইড়ে
দেও ভাটার মুখে। যাক সমুদ্দুরে।

করা টাকাটা চালান করে দিতে পারি তবেই রক্ষে। পানে মারলে, আমাদেরো পান নে্য টানাটানি হবে। শালারা থাকবে এখানে নোঙর করে। সকাল বেলা এসে ওদের নোকেরা নে্য যাবে।

সাইদারের উপযুক্ত কথা। প্রাণ নিয়ে কারুর সঙ্গে টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে, গহীন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলেই সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে।

সে যে শুধু সমুদ্রে তা নয়। খালে বিলে, এমন কি গঙ্গায়ও আসে সে নানান বেশ ধরে—যেমন এল এবার ডাকাতের বেশ ধরে। কিন্তু এ শুধু তোমাকে ভয় দেখানো, ওশকানো। তোমাকে হুঁশিয়ার করা। জলে ডাঙায় সমান নজরে হুঁশিয়ার থাকতে বলছে তোমাকে। ভাগ্য নিয়ে খেলা। একটু ভুল করবে, আর ফিরতে পারবে না প্রাণ নিয়ে। এইটা সংসারের নিয়ম। মানুষের সংসারের বাইরে তোমার বাঁচার জায়গা। যেখানে জীবনকে আড়াল করে মরণ সব সময় হাত বাড়িয়ে আছে। ঐ হাতের পাশ কাটিয়ে ফিরতে হবে, যতক্ষণ বুকের ধুকধুকি চলবে।

সাতজনকে মারলে, আমাদের চোদ্দজন মরতে পারে। টাকার জন্যে ডাকাতেরা পিছন ছাড়বে না। ওইটাকে বাঁচাতে পারলে, ওদের স্বার্থ গেল। আক্রোশ থাকবে, কিন্তু তার রকম হবে আলাদা। সে ফুঁসবে, সুযোগ খুঁজবে। সবাই সুযোগ খোঁজে, না পেলে ফুঁসে মরে। তুমি মাছ না পেলে ফোঁসো। তোমার মরণও ফুঁসবে। যতক্ষণ পার, তাকে সুযোগ দিও না।

[illegible]

ভয় আছে নীচে থাকতে। যদি বাঘের পেটে যায়? এবার সে
সবাই সভয়ে। টেরও পায় নি, কী ঘটে গেছে বাছাধনে
সাইদার নিবারণের পেছনে লাগা সহজ নয়। ভেবেছিল স
ঘুমুবে, আর তিন নৌকা নিঃশব্দে তরতর করে যাবে পারে। কি
ওই হোগলা-হেতালে ঢোকানো আছে হয়তো আরো নৌকা। ইশ
পেয়ে, এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘুমন্ত সাইয়ের ওপর।

তার পর চাক্ষুষ—ঘুরন্ত তারাটা এল প্রায় মাথায় মাথা
নৌকা ঠেলা খেল উত্তরে। ঢেউয়ের বাড়াবাড়ি কমেছে। গর্জনও
দিয়েছে একটু জলে। জোয়ার ডেকেছে। সাড়া-শব্দ নয়। নিঃশব্দে
নোঙর তুলল বারো গণ্ডা। তরতর করে ভেসে গেল নতুন চটির দিকে
নতুন বাংলো হয়েছে সেখানে। ডাকাতেরা সাহস করে সেখানে
আসতে পারে না।

তবে ব্যাঘাত বলে একটা কথা আছে। সব সময়ই সেবার মনে
হত, ডাকাতেরা আছে পিছনে পিছনে। সারা সাইয়ের বুকে কাঁটা
বিঁধেছিল সে মরশুমটা। কাঁটাটা আর কিছুই নয়, আসলে
সাবধানতা। সাবধানের মার নেই। সেই বারো গণ্ডা-ই সেই
ট্যাকের মুখে রাত কাটিয়েছে আবার। কিন্তু কোনো বিপদ-আপদ
হয় নি।

গ্যাকো গ্যাকো, মাকড়ার কাণ্ড গ্যাকো তোমরা।—পাঁচু ধমকে
উঠল বিলাসকে। বলল, আরে শুয়োটা, তিবড়ি নিবে তোর ভুঁস
হল, ওদিকে কী দেখছিস তুই তাকে তাকে, অ্যাঁ? শহর দেখিস
নি কখনো?

বিলাস চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, সত্যি, তিবড়ির কাঠ ছাই হয়ে

ধরে খেয়ালই নেই তার। শহর দেখেছে অবশ্য দুবার। তবে মাছ ধরতে এসে নয়। কলকাতার বাজারের ফড়েরা যায় তাদের ওদিকে চাষীদের কাছে। চাষীরাও আসে মাঝে মাঝে কলকাতায়। সে চাষীদের সঙ্গে দুবার পালিয়ে এসেছিল। একবার এসেছিল খুবই ছোট থাকতে। আর একবার এসেছিল বড় হয়ে। প্রথম বারে পিঠে পড়েছিল বেড়ন আর দ্বিতীয় বারে গালাগাল। ডাগর শরীরে হাত তোলা যায় না। পাল্টা গায়ে হাত তোলার অলীক ভয় থাকে একটা মানুষের। আসলে ওটা বাপ-দাদার আপন সমাজের ভয়। মনে মনে মারতে হয়, মুখে বলতে হয়।

কিন্তু বিলাসের বড় শহরের টান। বেড়নে গালাগালে তার শেষ হয় নি। দুবারের দুই পাকে তৃষ্ণাটা বরং বেড়েছে বিলাসের। শহরে থাকবার যে সাধ আছে বিলাসের, তা নয়। শহরের মানুষের উপর তো তার টান নেই। আপন-জন নেই, টানবে কে। শহর ঘেঁটে দেখবার বড় শখ। তা সে হবার জো নেই। বলে, ছেলে বকে যাবে। খেতে হবে মাছ মেরে, তার আবার অত শহর-টান কিসের।

মাছ মারতে জানে বিলাস। অনেক কিছু জানে। সমুদ্রেও ঘুরে এসেছে দুবার এর মধ্যেই। তাও অনেক করমকষ্মি করে। ওই যে বাপ মরেছে সমুদ্রে। বাপ মরেছে তো ছেলের আর সমুদ্রের ধারে-কাছেও যেতে নেই। তবে কি তোমাদের হাতে পুতুল হয়ে থাকতে হবে নাকি। শহর দেখব না, সমুদ্রে যাব না! রাজা হয়ে গেলুম আর কি! মটমট করে কাঠ ভেঙে, তিবড়ির মুখে ঠেলে দিল বিলাস। দিয়ে তলদা বাঁশের নল দিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। ধোঁয়া উঠল কুণ্ডলী পাকিয়ে।

পাঁচদা ?

পাঁচু জবাব দিল বিলাসের দিকে চোখ রেখেই, এই বলছি ম

বলার। বলে বিলাসের দিকে ফিরে আবার বলল, ডাল সেদ্ধ হ

নাই এখনো ?

বিলাস ফুঁ দিতে দিতেই বলল, কেন, খিদের জ্বালায় আর থাকতে

পারতেছ না ?

ওই শোনো কথা। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। ওর বাপ হলেও বোধ হয় এমনি করেই বলত। ওতে যে রাগ আছে খুব বেশী, তা নয়। স্বভাব। মটমট করে কাঠ ভাঙবে। কটকট করে কথা বলবে। বাপের মতো বুকের ছাতি। গাছের গুঁড়ির মতো চওড়ায় আর পাশে। নড়লে চড়লে মাংসপেশী সারা অঙ্গে কেউটের মতো ওঠে কিলবিলিয়ে। যদি বল, কোথায় চললি রে! মন ভালো না থাকলে বলবে, 'দক্ষিণে'। অর্থাৎ মরতে। যমের দোর ওই দিকে যে। মন ভালো থাকলে সেইখানেই বসে পড়ে বলবে, এই তোমার কাছেই।

মা-খুড়ীও হেসে খুন। আ মরণ! বলল হয়তো, দুখানা কাঠ চেলা করে দে দি-নি।

মেজাজ ঠিক থাকলে তো ভালো। নইলে, যত কাঠ আছে ঘরে, সব উঠোনে ছড়িয়ে চলবে কুড়োল কোপানো। মা-খুড়ী চেঁচাবে, আ মুখপোড়া, আ মরণ রে! রাখ রাখ ড্যাকরা, তোকে আর কাঠ ফাড়তে হবে না।

আর হবে না বললে কে শুনছে। বলবে, কাঠ আর তোদের আ-চেলা রাখব না আমি। রোজ রোজ এক কথার নিকুচি করেছে। কেন, দুখানা কেন, সবই ফাড়ব আজ।

পাঁচুর বাপ, অর্থাৎ বিলাসের ঠাকুর্দা দাওয়া থেকে চেঁচাবে, রক্ত, রক্ত, রক্তের দোষগুলান যাবে কম্‌নে? বাপ যা করেছে, তাই করবে তো।

বিলাস বলবে, তবে কি সুরীনের বাপের মতো করব?

মা-খুড়ী আর বোনেরা হাসবে আড়ালে। যে সুরীনের বাপের কথা বলছে, সে লোকটি জাতে মৎস্যজীবী হয়েও আসলে সিঁদ-কাটা চোর। তাই বিলাসের কথা শুনে, পাঁচুর রাগ হল না। ওই কথার মধ্যে বিষ নেই। আসলে মিষ্টতা নেই ছোঁড়ার গলায়। কথা বলতে শেখে নি একেবারে। কথা বলেও কম। চুপচাপই থাকে বেশী। বললে ওইরকম। অবশ্যি নিজের জনকে। অচেনা মানুষ দেখলে তো ঠাঁট আজও বুজল, কালও বুজল। নতুন লোকে বলে যায়, লোকটা বাবা নাকি হে।

পাঁচু বলল, তা পেট জ্বলবে না খিদেয়? সেই তো কোন বেলায় খেয়ে এসেছি খাল-গেটে।

আর কথা নেই মুখে। কাঠ জ্বলে উঠেছে গনগন করে। সেই আলোয় যেন দপদপ করছে কালো কুচকুচে নাগ।

সবাই চেনে একটু-আধটু বিলাসকে। তেঁতলে বিলেসকে। সবাই জানে, বড় রগচটা আর গোঁয়ার। গায়ে শক্তিও তেমন। বলে, বারণ মালো বসানো একেবারে। ভাবসাবও সেই রকমের। এ-সব ছেলেকে নিয়ে ফ্যাসাদ হয় মহাজনের কাছে। সে মাছমারার বাপ-চোদ্দপুরুষের ধার ধারে না! এই পৌষ মাসে হল এক কাণ্ড। ঘরে একটি দানা নেই। ঘরে চলছে পোষ-পোড়া। পাঁচু নিজে যেতে পারে নি মহাজনের কাছে। বিলাসকে বলে পাঠিয়েছে, 'পাল মশাইকে বলিস, দশটা টাকা যেন অতি অবিশ্যি দেন।' এদিকে ছেলে দড়ো। যা বলবে, ঠিক তেমনটি বলবে। গিয়ে বলেছে।

মহাজনেরও বোধ হয় মন-মেজাজ খারাপ ছিল। বলেছে, টাকা দিতে পারব না।

—কেন ?

আ মলো। কেন কী রে! বল, আজ্ঞে দয়া করুন। তা নয়, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। মহাজন তো চটেই অস্থির। খেঁকিয়ে উঠেছে, আমার খুশি।

—তবে আর মরতে মহাজন হওয়া কেন ? মাছ হয়ে জন্মালেই হত ?

—মাছ ?

—হ্যাঁ, তবে খুশিমতো চলাফেরা করতে পারতে।

আর যায় কোথায়। মহাজন এই মারে তো এই মারে। তবে ওই যে তেঁতুলে বিলেস উনি। মারামারি করে আসতে একটুও চিন্তা-ভাবনা নেই।

পালমশাই ছুটতে ছুটতে একেবারে পাঁচুর কাছে। বাড়ির সকলে মিলে ক্ষমা চেয়ে তবে উদ্ধার পায়। কিন্তু তিনদিন ভাত খেল না বিলাস। ওর মা যে বলেছিল, গিলতে পারিস, আর এ বুদ্ধিটুকু নেই ঘটে ?

ওর বাপ ছিল বাছাড়। সে-সব আগের দিনের বিষয়। চার-পাঁচ মণের তালগাছের গুঁড়ি একদিকে ধরে তুলে, টেনে যে সবচেয়ে বেশী দূরে নিয়ে যেতে পারবে, তাকে সবাই সম্মান দেয়, বাছাড় বলে। সে-সব খেলা আজকাল উঠেই গেছে। তা গত সনে গঙ্গাপুজোর দিনে হঠাৎ আবার সেই খেলা হয়ে গেল। সবাই টানলে। গাঁয়ের বুড়োরা খুব খুশী। এক সময়ে পাঁচুও আসরে নেমেছে। তবে, বাছাড় হতে পারে নি কোনোদিন।

গত সনে, বাছাড় হল পুরোখোঁড়গাছির পঞ্চাশ বছরের জোয়ান কেদমে পাঁচু। অর্থাৎ কদমতলার পাঁচু। কিন্তু তেঁতুলে বিলেস

কাত করলে শেষ পর্যন্ত। কেদ্‌মে পাঁচুর মুখ দেখে বড় কষ্ট হল পাঁচুর। আর রাগ গিয়ে পড়ল ভাইপো বিলেসের উপর। বাড়ি এসে ঝেঁজে বললে, এঃ, ভারী একেবারে বাছাড়ের পো বাছাড় হইয়েছেন।

বিলাস অবাক হয়ে বলল, বাছাড়ের পো বাছাড় হবে না তো প্যাঁচা হবে নাকি? কী কন্ন্‌ তোমার?

পাঁচু বললে, বুড়ো মানুষটার মুখ হাসাবার কী ছেল! সবাই জানে, তেঁতলে বিলেস ষণ্ডা।

যাঃ বাবা! বিলাস তার অপরাধ না বুঝে গুম খেয়ে গেল। ঝাল পড়ল অন্যের উপরে। ওরই বন্ধু সয়ারাম অর্থাৎ সখারাম পর দিন এসে ডাক দিলে, কই গো বাছাড়?

বিলাস বেরিয়ে এসে তাকে কষালে তুই চড়। বাছাড় কেন, ষণ্ডা বলতে পার না?

সয়ারাম গালে হাত দিয়ে বললে, যাঃ বাবা!

ঘরে বসে আড়াল থেকে পাঁচুও মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে বললে, যাঃ বাবা! ছোঁড়ার পরে রাগ করারও জো নাই।

কেদমে পাঁচুর মুখ দেখে যতই কষ্ট হোক, ভাইপোর জন্যে যে আনন্দ হয় নি, তা নয়। খুবই আনন্দ হয়েছিল। তবে দিনকাল অন্য রকম হয়ে গেছে। কী হবে আর এ-সব করে। এত বড় সংসার দেখবে কে? আজো এক ফোঁটা জমি নেই। মাছমারারা সবাই নজর দিয়েছে ওইদিকে। অনেকে চাষ-আবাদ ধরেছে। মাছের কাছে নেই আর তারা। এখানে জীবনে বড় সংশয়। বাঁচা-মরা জলের হাতে। যা দেন সবই তাঁর দয়া। না দিলে জল মইয়ে ফেললেও কিছু হবে না। এই বুড়ো বয়সে বড় ভয় হয়েছে পাঁচুর। জগৎ সংসারের তিন ভাগটাই জলে জলময়। কিন্তু এ জলের সবটাই

বড় অনিশ্চিত। তিনি রাজা করেছেন কাউকে। কাউকে দিয়ে ডুবিয়েছেন। তাঁর লীলা অন্য রকম। চাষের কাজেও কম-বেশী তাই। তবু লাঙল চালিয়ে, কাদা মাঠে নিজের হাতে চারা পুঁতে দেওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটু ভরসা আছে।

আজ, আজ মনে হয় সে কথা। বড় ভয়ে আর দুর্বল মুহূর্তে সে কথা মনে হয়। কিন্তু, অতীতে কেন, এখনো মন গায়, মীনের রাজ্যে চলাফেরা করার জন্যে জন্মেছি। তার গহীন স্রোতের অন্ধিসন্ধি জানি আমি, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে পালাতে পারবে না! আমার সীমানা পেরিয়ে সে একদিন চলে যাবে সমুদ্রে। আর-একদিন তাকে ফিরতে হবে। নির্ঘাত ফিরতে হবে, ধরা দিতে হবে। আমার জীবন আর তোমার জীবন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে জন্মকাল থেকে।

তবু, একফোঁটা জমির মধ্যে কোথায় যেন একটি বাঁধা সুখের ঠিকানা লেখা রয়েছে। মানুষের মন ওই রকম। বাঁধা সুখের সন্ধান করে সে। আবার মনে হয়, চাষের জীবনে বা বাঁধা সুখ কোথায়। লোকগুলি হাঁপিয়ে মরে জলের জন্যে। কখনো জলকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণ দেয়। তার নৌকা নেই, বাঁধাও থাকে না মহাজনের কাছে। কিন্তু গোটা আবাদী জমিখানি থাকে। সে দাদন নেয় না ফড়ে ব্যাপারীর কাছ থেকে। তবে ঋণ করে শোধ দিয়ে আসে সারা বছরের ফসল।

তবু, তবু। জলের পোকারও মাটির স্বাদ পাওয়ার বড় বাসনা। বড় ভয় পাঁচুর। নিজের বউ-বোঠান ছেলে-পুলের জন্ম দিলে বড় দেরিতে। দেবেই তো। বিয়ের বয়সে যখন বিয়ে দিলে বাবা মা, তখন বউয়ের বয়স পাঁচ কি ছয়। সে বউ না পারে রাঁধতে

বাড়তে, না জানে জাল বুনতে, সেলাই করতে। স্বামীর সঙ্গে শোয়া তো দূরের কথা। এক্কা-দোক্কা খেলছে, পিটুলির গোটা দিয়ে খেলছে ঘুটি। শ্বশুর-শাশুড়ীর বকুনি আর মার খেয়ে কেঁদেছে বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে। কাজ-কর্মের ঘরে অত ছোট মেয়ে হলে কি চলে।

ডাগর মেয়ের দরকার এ-সব ঘরে। কাজ করবে, বিয়োবে বছর না ঘুরতেই। বাপের রক্তে টান ধরতে না ধরতে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে ছেলে। কাঁড়ারে বসে দাঁড় টানবে, গলুয়ে বসে ধরবে হাল। যেমন ঘর তার তেমনি কাজ।

তা নয়, চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল—এখনো বিয়োচ্ছে বৌ। ঘরে একপাল কুঁচো। ভরসা যা কিছু বিলাস। পাঁচুর নিজের যেটি বড় ছেলে, বিলাসের সঙ্গে নৌকায় আসতে তাকে এখনো কম করে আরো দু-সন ঘরের খেতে হবে।

সেই জন্যেই বিলাসকে নিয়ে বড় ভাবনা পাঁচুর। নিবারণ সাইদারের ছায়া। সব বিষয়ে এর মধ্যেই টেক্কা মারতে চায় খুড়োকে। খুড়োর উপর বিদ্বেষ পুষে নয়। কাজকর্মের চেহারাই অমনি। ভাবও উড়ু-উড়ু আর এমন কিছু নয়। সংসারের আরশি যেমন রাখবে, মুখটি তেমনি দেখবে।

পাড়ার অমর্ত অর্থাৎ অমৃতটা চিরকালের শোস্ বাতের রুগী। বাপ বেঁচে থাকতে কিছু জমিজমা করে গেছল। সেই দৌলতে ন্যালাপ্যাংলা অমর্ত বিয়ে করে নিয়ে এল খাস চন্দননগরের পুব পারের এক মালোর ঘরের জাঁহাবাজ খাণ্ডার মেয়েকে। বড় চটক মেয়েটার, সাজতে-গুজতেও জানে। তাদের কি এই পুবের মাছ-মারাদের ঘরে মানায়। তবে কেন বিয়ে হল এখানে? না, গায়ে গতরে খেটে মেয়ে দুটি খেয়ে বাঁচবে। বাঁচা কি শুধু দুটি পেটে খাওয়ার জন্যে? মনুষ্যজন্ম নিয়েছ তুমি। সংসারধর্ম চাই তোমার।

মেয়েমানুষ ধারিত্রী। জল হলে সে মাছ দেয়, তৃষ্ণা মেটায়। মাটি হলে দেয় ফসল। না হলে সে আগাছার পোড়ামাটি হয়, নর্দমার জল হয়ে যায়।

অমর্তর বউ তাই হল। অমর্ত তো সংসারধর্ম করতে পারে না। পরের মুখে চেয়ে বেঁচে থাকা। বউ হল দেখনবউ। তা বললে কী হয়। সে মেয়েমানুষ! তুমি যেমন ইছামতীকে ছেড়ে গঙ্গায় যাও, মাছের সন্ধানে, সেও তেমনি সন্ধানে খর করল দু চোখ। আজন্ম সাধ তার অপূর্ণ রয়েছে। সে পূর্ণ করতে চায়। এইটা যাবৎ জীবের ধর্ম।

কিন্তু এ সংসার প্রথম বিষ দিল অমর্তর বউকে। অমর্তর কয়েক বিঘা জমি আছে, তাই অমর্তর হাতে তুমি দিলে জোয়ান মেয়েমানুষ। সেই বিষের ক্রিয়া হল। সে ভুল পথে পাড়ি দিল গঙ্গায়। আদর সোহাগ, ভাব ভালোবাসা ছেড়ে, সে চাইল শরীর জুড়োতে।

সে হল বাঘিনী। বাঘিনী দিবানিশি থাবা মেরে ফেলে রাখে অমর্তকে। রক্ত খোঁজে বাইরে। কেন? না, চাল দেখলে বোঝা যেত, রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে আগে।

তা হাঁ, এর মধ্যে দুঃখ আছে মেয়েমানুষের। কিন্তু চরিত্র খারাপ করলে দুঃখ কি দূর হয়? হয় না। সে মেয়ে লাগলো বিলাসের পেছনে। তেঁতলে বিলেসকে দেখলে আর ঘরে থাকতে পারে না সে। নাম শুনলে, কথা শুনলেই ছুটে বেরিয়ে আসবে। দশজনের সামনেই ঢলে পড়বে হেসে। দাঁড় করিয়ে দুটি কথা বলবে। তাও সোজা কথা নয়, বাঁকা বাঁকা। চোখ ঘুরিয়ে, নাক তুলে ইশারা করে হাসবে।

সে ছোঁড়ারও তো ভয়-ডর নেই। তবে, বাঁকা কথা বোঝে না। কী বলে সেই মেয়েমানুষ, ঠোঁট বাঁকিয়ে, ঠারে-ঠোরে, ধরতে পারে

না। তখন যায় রাগ হয়ে। আরে ধুত্তোর তোর নিকুচি করেছে! যা বলবি তা সাফ-সাফ বল। কিন্তু জোয়ান ছেলে। রক্তে তার জ্বালা ধরে যায়। চোখে উঠে আসে রক্ত। সেই মূর্তিকে সবাই প্রায় ভয় পায় এ তল্লাটে। কিন্তু অমর্তর বউ খেলা করে।

সব খবরই পাঁচু পেত সয়ারামের কাছ থেকে। ঘরে বসে রাগে আর ভয়ে মরে মা-খুড়ী। পাঁচুও তাই। কিন্তু বিলাসের সে-সব ভাবনাও নেই। পাঁচু জিজ্ঞেস করে সয়ারামকে, কি রে, কী খবর?

সয়ারাম হেসে বলে, কী খবর আর। বুঝলে খুড়ো, ছেলে তোমাদের হয় হাঁদা, নয় তো ভগবান। গাঁয়ের অন্য ছেলে হলি কবে গ্যে অমর্তর ঘরে রাত কাট্টে আসত।

তা ঠিক। তবে এ যে আগুন নিয়ে খেলা। বিষদাঁতওয়ালা সাপ নিয়ে খেলা। কখন কী হয়, কে বলতে পারে।

যে পথে যাবে বিলাস, সেই পথেই অমর্তর বউ। বাঁশঝাড়ে, বাওড়ে, খালের ধারে, পথে বিপথে। মেয়েমানুষের শরীর, তা কী বেহায়া পুষ্টি তার! চোখে লাগে কটকট করে। বুড়ো মানুষেরও লাগে। যত খিলখিল হাসি, ততই যেন শরীরে বাঁধুনিতে আর বাগ মানতে চায় না। ভরা জোয়ারের জল তার সীমা ছাড়িয়ে যেতে চাইছে।

সামনে পেলে, বিলাসকে বলবে, দেখতেই পাও না যে গো!

বিলাস বলবে, এই তো দেখছি! আবার কেমন করে দেখব।

—কই, মনে তো হচ্ছে না যে, দেখছ।

বিলাসের রাগ হয় মনে মনে। অমর্তর বউ প্রথম থেকেই বাঁকা। সহজ করে হেসে কয়ে যে মানুষ ভাব-ভালোবাসা করে, এ তা নয়। চরিত্রে দোষ দাঁড়িয়ে গেছে কিনা। নইলে গাম্‌লি পাঁচী যে তাকে দেখে হাসে, তাতে তো বিলাসের রাগ হয় না। এক পাড়াতেই

সাতটা মেয়ের নাম পাঁচী। একটাকে ডাকলে সাতটা সাড়া দেয়। ওহ তেঁতলে বিলেসের মতো। পাড়ায় বিলেস আছে তিনটি। তেঁতলতলার বিলেস, তেঁতলে। তেমনি গাম্বিলতলার পাঁচী, গাম্লি পাঁচী। আসলে গাম্লিটা গাম্বলি। সে পাঁচীর হাসির মধ্যে কী আছে কে জানে। বিলাসের ভারী আনন্দ হয়। বুকের মধ্যে কেমন করে। খারাপ লাগে না একটুও। ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে।

আর অমর্তর বউ শুধু জ্বালা ধরায় বুকে। যেন ফোঁসফোঁস করছে সাপের মতো। কখন কাকে ছোবলাবে।

পাশ কাটায় বিলাস।

অমর্তর বউ বলে, কী হল গো তেঁতুলে বিছে?

বিলাস বলে, হুল খাও নি তো তেঁতুলে বিছের? খেলে মজাটা টের পাবে।

বিলাস তো হাসতে জানে না। মেয়েমানুষটাও রেগে যায়। বলে ভ্রূ কুঁচকে, হুল ফোটাবার মুরোদ চাই, বুঝলে হে?

—তাই নাকি?

—নয় তো?

এক নজরে চেয়ে চেয়ে কী যে করে মেয়েমানুষটা। যেন সাপের মন্ত্র পড়ে। আর নিজেকে দেখাবার কত ছলা-কলা জানে।

কখনো পান খেয়ে ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে করে এসে দাঁড়াবে। অর্ধেক চুল পিঠে রেখে বাকি চুল দেবে বুকের উপর এলিয়ে। ঘোমটার বালাই তো কারুর সামনেই নেই। ও-সব চাল গাঁয়ে কেউ কোনোদিন দেখে নি।

জামার কী বাহার, কত রকমের শাড়ি। মুখেও নাকি কী সব মাখে। পাশ দিয়ে গেলে সুগন্ধটি নাক থেকে মগজে গিয়ে থাকবে লেগে।

সন্ধ্যাবেলা যদি বিলাসের ও পথে ফেরার কথা থাকে, তবে, শহরের মতো কাপড় পরে পায়ে জুতো চাপিয়ে দাঁড়ায় দরজার মুখে।

—আহা, সাঁজবেলায় এট্টু দাঁইড়েই যাও না হয়।

—গেলে কী হবে?

কী কাট-কাট কথা রে বাবা! গামলি পাঁচীর কথা শুনেছে অমর্তর বউ। তার চেয়ে কি নিরেস নাকি সে।

যদি বা সরেস-হলে, ভাব কই। অ-ভাবের গোড়াই যত স্বভাবটা বাঁকা করে দেয়। বলে, কত দেমাক তোমার, তাই এট্টু দেখব চেয়ে চেয়ে।

—আরো কিছু দেখাতে পারি।

বলে বিলাস চলে যায়। অমর্তর বউ বলে দূর থেকে, ক্ষ্যামতা আছে?

তারপর একদিন শেষ হয়ে গেল। পাঁচু ভাবে, সংসার কী বিচিত্র! সংসারের এই জলময় রূপ। তলে তার কত বিচিত্র বিস্ময়। কত রকম তার জীব, কত রকম তার জীবনধারণ। কী বিচিত্র তার লীলা। ভাবতে ভাবতে বিশ্বের এই সর্বচরাচরের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবশ হয়ে যায়। মানুষও যে কত বিচিত্র। নিজের দাদাকে দিয়ে বুঝেছে। বিলাসকে দিয়ে বুঝেছে। বুঝেছে অমর্তর বউকে দিয়েও।

একদিন ঘোর দুপুরে ফিরছিল বিলাস। মেজাজ বড় খারাপ। পাঁচু পাঠিয়েছিল মহাজনের কাছে। নৌকা বাঁধা আছে। আরো বিশটা টাকা যদি এখন দেয়, খেয়ে বাঁচে। দেয় নি, বরং দুটো কথা শুনে ফিরছিল।

অমর্তর বউ গোয়ালের পাশ থেকে বলে উঠল, কাঁটা দিয়ে রেখেছি পথে।

[illegible] বলল, কিসের কাঁটা ?

—মনের কাঁটা।

—মনের কাঁটা ? রাগ হয়ে গেল বিলাসের। যেন ফণা তুলে বলল, কোন পথে ?

—তোমার পথে।

—কেন ?

ঠোঁট টিপে বলল অমর্তর বউ, বিঁধবে তোমার চলতে ফিরতে।

—ও, গুণ করেছ তাহলে। হেসে বিলাস চলে যাচ্ছিল।

অমর্তর বউ বলল, কী হল ? কাঁটায় মরবে, তার চেয়ে এক দণ্ড থেমে যাও।

থেমে গেল বিলাস। এল হনহন করে গোয়ালের কাছে, একেবারে অমর্তর বউয়ের গায়ের উপর।

কোথায় গেল হাসি-মসকরা। পুরুষ দেখেছে অনেক অমর্তর বউ। এমন দপদপে নাগ দেখে নি। ভয়ে এক পা পেছুল সে।

বিলাস কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো তার হাত ধরে বলল, 'পালাচ্ছ কেন, কাঁটার গুণ দেখে যাও। বলে টেনে নিয়ে ফেলল গোয়ালের বিচুলি গাদার অন্ধকারে।...

রাইমঙ্গলের জোয়ার এসেছে তখন, যত হাজা-মজা ফালি-ফ্যাকড়া নদীর ঝুঁটি নেড়ে, বুক ডুবিয়ে। ইছামতী তার জোয়ারের ঠোঁটে নিয়ে এসেছে চৈত-টোটার বাতাসের শাসানি। নির্জন দুপুরটা বাতাসের মারে উলটিপালটি খেতে লাগল।

সেই থেকে অমর্তর বউ একেবারে ঠাণ্ডা, আর কোনোদিন পথ আটকায় নি বিলাসের। এ যেন গহীন জলের বিস্ময়।

সবদিকে, একেবারে চেহারায় চরিত্রে বাপ বসানো। বড় ভাবনা হয় এ ছেলেকে নিয়ে পাঁচুর। সংসারে নানান রকম দোষগুণ আছে

ছড়িয়ে। তার হাত থেকে কেউ-ই পার পায় না। শুধু দোষের মানুষকে নিয়ে কেবল ঘৃণা। শুধু গুণের মানুষকে নিয়ে সংসারে অচল হতে হয়। বিলাস দোষ-গুণের মানুষ। ওর উপরে রাগ করতে পারে নি পাঁচু।

ছেলেটা কাজে কর্মে খুবই দড়ো। শুধু যে চেহারায় বাপের মতো তা নয়। এর মধ্যেই আকাশ-বাতাস চিনেছে। কোন্ মেঘ জল ঢালবে, কোন্ মেঘ ঢালবে না, বুঝেছে। জল চিনেছে, জলের লীলা বুঝেছে, গণ কোটাল ধরতে শিখেছে। সব শিখল এই পাঁচুর হাত দিয়ে।

বিলাসকে দেখতে দেখতে পাঁচুর সেই রাম মালোর গল্পের বাদার প্রথম পুরুষের কথা মনে পড়ে। বিলাস তার ভক্তির পাত্র নয়। কিন্তু পাঁচুর বুকের ভিতরে এক বিচিত্র ভয় ও বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলাস। তবে আজকালকার দিনে সাইদার হওয়া কঠিন। সে রকম ওজনের মানুষ হওয়া দরকার। তোমার মুখ দেখে তো আড়তদার কারবারী পাঁচ-সাত হাজার টাকা ছেড়ে দেবে না। সেই ওজনের মানুষ হতে হবে। জনাজনের মাথার উপরে দাঁড়াতে হবে। কইয়ে বলিয়ে হিসেবী হওয়া চাই। যাতে সবাই মানে। আবার সমুদ্রের কারসাজি বুঝতে হবে। দশ-বিশ গণ্ডা নৌকা নিয়ে যাবে তুমি। এতগুলো লোকের কিসে আপদ-বিপদ সে-সব তোমার জানা দরকার।

তা ছাড়া ওই যে বংশে একটা কাঁটা পড়ে গেছে। একজন সমুদ্রের গর্ভে গেল। টাকির ঠাকুর মশাই বলেছেন, আর কাউকে সমুদ্রে পাঠিও না পাঁচু। তোমাদের বংশের আর কারুর সমুদ্রযাত্রা নেই।

যদি যাত্রা করে?

তবে আসল জীবের নজর খাড়া আছে, একটা সর্বনাশ হতে পারে।

এ তো আর তোমার আনাড়ী গাঁজাড়ি মানুষের কথা নয়। মাটিতে খোলো ঘর কেটে, সমুদ্রের শমনকে বেঁধেছে। ছেড়েছে কথা আদায় করে। রীতিমত আঁকজোক কষার ব্যাপার। ...কে ঠাকুর, তায় গুণীন। অব্যর্থ শুলুক সন্ধান করে বলেছে।

তা কে শুনছে সে কথা। শ্রীমানের এর মধ্যে দুবার ঘুরে আসা হয়েছে সমুদ্রে। ওঁর যে বড় নেশা। বড় টান। একবার যাকে ধরেছেন উনি, সে তো আর থির থাকতে পারবে না। ওঁয়ার ডাক যে কেমন করে কখন আসে সে পাঁচু টের পেয়েছে অনেকবার। নিজেকে দিয়ে নয়, দাদা নিবারণকে দিয়ে। এই গঙ্গাতে নৌকোর গলুইয়ে বসে বসে দেখেছে, কাঁড়ারে বসে দাদা তার দক্ষিণ দিকে চেয়ে রয়েছে গালে হাত দিয়ে। যে বারে বিশেষ করে মা গঙ্গা নির্দয় হতেন। মা গঙ্গার নির্দয় হওয়া যে কী বস্তু, সে জানে ...রা, যাদের জীবনমরণ গঙ্গার গহ্বরে। এই তাবৎ চব্বিশ পরগনা, হুগ... নদীয়া, ওদিকে খুলনার পশ্চিম, যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিমের মাছম...রা সব আসে গঙ্গায়। এখন দেশ ভাগাভাগি হয়েছে। পু... হিন্দু মাছমারারা সবাই এখন সার করেছে গঙ্গা।

গঙ্গা-ই আসল। বিশেষ এই মরশুমে। টানের দি... ...মুদ্রে পাটাজালের সাই দমে ভারী হয়ে ফেরে না। পাটাজা... সাই ইলিশের চক খোঁজে। পান্‌সা জালের সাই হল টানের সমুদ্রের আগল।

যে মরশুমে গঙ্গা নির্দয় হয়েছে, নিবারণ মালো চেয়ে থেকেছে দক্ষিণে। আর থেকে থেকে বলেছে, না, আর ফিরে কোটালটা দেখা চলবে না রে পাঁচু। ফিরে গো আড়তদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিই।

ওই! ওই বোঝা গেল, ডাক পড়েছে।

সেই ভয় পাঁচুর, ভাইপোকে নিয়ে। সে যে মুখ দেখলে বুঝতে পারে, ও ছোঁড়াও ডাক শুনতে পায়। ওই যে কান খাড়া করে একবার এদিকে তাকায়, ওদিকে তাকায়, এ-সব ভাবভঙ্গি যে পাঁচুর নখদর্পণে। তার মানে, ছোঁড়ার মন দিবানিশি উথালি-পাথালি। শুধু সমুদ্রে যাবার জন্যে নয়, সব কিছুতেই।

যার তুমি সবটুকু দেখ নি, জান না, চেন না, সেইদিকেই তোমাকে টানে। তার দিকেই বার বার তুমি চোখ তুলে তাকাও। মন মানে না। শহর, সমুদ্র, গঙ্গা, মানুষ,—সব কিছুতেই বড় বেশী ঔৎসুক্য বিলাসের।

যা ওর মন বলে তা না করে ও ছাড়ে না। যা প্রাণ চায়, তা ছাড়বে না প্রাণ থাকতেও। তা নইলে আর মালোর ছেলে হবে কেন।

ওই যে বলে না, ঝালো আর মালো, দুই ভাই। এক মায়ের সন্তান, জন্ম নিলে ভগবানের গলার মালা থেকে। কে করেছে আর পাঁজিপুঁথির তত্ত্ব-তল্লাস। গাঁয়ে-ঘরের লোকে বলে, শোনেও গাঁয়ে-ঘরের লোকে। তা ও দুই ভাই-ই ভগবানের বিধেনে হয়েছে মাছমারা। মা-মনসার বৃত্তান্তের মধ্যেও আছে দুই ভাইয়ের কথা।

এক জায়গা থেকে জন্ম নিলে দুই ভাই, কিন্তু এক ভাই হল পতিত। তার জল চলে না সমাজে। কী বা আছে জাতের। তবে, ওই একটা কথা। মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছ, তোমার একটা বৃত্তান্ত থাকবেই।

পতিত হল মালো। কেন? না, ওই যে, যা মন চাইল, তা-ই ভালো। যা চাইল না, তার কাছে আর নয়।

সে বহুদিন আগের কথা। ঝালো-মালোর ঘরে এসেছেন তাদের গুরুদেব। গুরুদেব বলে কথা। সাক্ষাৎ ভগবান-তুল্য। সেবা

করো, ভক্তি করো। তখন মালো পতিত নয়। দুই ভাই ভাণ্ডারে সেবা করলে গুরুর।

তারপর গুরুদেবের ভোজন হল। নিদ্রা দিয়ে উঠে গুরুদেব গেলেন পায়খানায়। বললেন, মালো রে মালো, জল একটু এগিয়ে নিয়ে আয়।

গুরুর আদেশ। তার ওপরে তো কথা চলে না। কিন্তু মালো যে। জল সরবেন গুরুদেব, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে! তবে রইল গুরুর আদেশ। আমার দ্বারা হবে না।

গুরুর আদেশ অমান্য। ওরে মালো, পতিত হবি যে!

হই হব। তবু, ওটি আমার দ্বারা হবে না। গুরুরও এক কথা, মালোরও এক কথা। যা পারব না, তা পারব না।

মালো গিয়ে তাড়াতাড়ি জল এগিয়ে দিল গুরুদেবকে। গুরুদেব খুব খুশী। সেই থেকে মালো গেল পতিত হয়ে। না, পাঁজিপুঁথির কথা জানি নে, বাপ-ঠাকুদ্দার মুখে শোনা কথা। আমরা জানি, এই আমাদের বৃত্তান্ত।

তা বিলাস হল সেই মালোর ঘরের ছেলে। গুরু মানে না, বাপ-খুড়ো মানে না। আর যদি মানে, সে ওর শমন হলেও প্রাণ সঁপে দেবে তার পায়ে।

বড় ভয় পাঁচুর। এই ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হবে গোটা গেরস্থি সংসার। এই ছেলেকে নিয়ে একটু জমির স্বপ্ন দেখছে সে। সেই বাঁধা সুখের ঠিকানা। গত পাঁচ বছর ধরে, এই গঙ্গাই পাড়ি দিয়েছে সে বিলাসকে নিয়ে। কোনো রকমে গোটা সংসারের কয়েক মাসের খোরাকি নিয়ে ফিরে গেছে। যা দিয়েছেন গঙ্গা, তাই নিয়ে ফিরেছে। কিন্তু উপচে পড়ে নি কোনো দিন, যে ওপচানোটুকু দিয়ে একটু জমির বন্দোবস্ত করতে পারবে।

—নেও, বোসো সে। কল্পয়ের থালায় ভাত বেড়ে দিল বিলাস পাঁচুকে। চুড়চুড় করে বেড়েছে ভাত। এখনো মুখ গোমড়া করে রয়েছে। আর একবারও ফিরে তাকায় নি শহরপারের দিকে।

জাল সরিয়ে রেখে, গঙ্গার জলে হাতমুখ ধুয়ে, খেতে বসল পাঁচু। ভাতের মাঝখানে গর্ত করে মুসুরি ডাল ঢেলে দিয়েছে।

পাঁচু বলল, তুঁও বসে যা।

—বসছি।

পাঁচু আবার বলল, কতটা চাল ফুটেছিস?

বিলাস নিজের ভাত বাড়তে বাড়তে বলল, পাঁচপো।

ওর কমে হয় না ছুটো মানুষের। কুলো আর বিশ দিনের ভাত আছে নৌকোয়।

পাশের এক নৌকোয় ছিল কেদমে পাঁচু। জিজ্ঞেস করল এই পাঁচুকে, বসে গেলে নাকি পাঁচদা?

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, ঠাকুরের নাম স্তে। এদিকে তো সময় যায়। জোয়ার এলে তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারব না। ত্যাতক্ষোণে আর এট্টুস্ জিরেন হয়ে যাবেখনি। তোমাদের কদ্দূর?

জবাব এল, এই বসলুম বলে। তো পাঁজি-টাজি দেখে এয়েছ এবারে? পাঁজি কী বলে?

পাঁচু মুখের গরাস গিলে বললে, আজকালকার পাঁজিগুলানও হয়েছে তেমনি। গেছলুম একবার পুবের বাউনবাড়িতে। নতুন ঠাউর দেখে বললে, এট্টাতে বলছেন দশ, আর এট্টাতে পাঁচ। নেও এখন, বোঝো ঠ্যালা।

তাও বটে। যাবৎ সংসারের সব কিছু ঘোষণা করেন আগে পঞ্জিকা। বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন সব গুনেগেঁথে। ওঁয়ারা হলেন

আবার গুণীনের বাপ। ভূত প্রেত দানো, সে সব ছাড়াও, জগতে কত জল আসবেন এ বছরে, কত ধান শস্য মৎস্য, সব লেখা আছে। ভাগের ভাগ। মায় তোমার সাপ শ্বাপদ, মারী মড়ক কোনো হিসেব বাদ নেই।

পঞ্জিকা বেরুবার আগে থেকে মাছমারারা ছটফট করে। দশটা কথায় আজকাল একটা মিলতে চায় না। তবু ওই যে পেটে থেকে পড়ে, বাপ-পিতামোর আমল থেকে দেখে আসছে। লেখার সঙ্গে কাজের মিল না হলে বোঝে, অদৃষ্টের লিখন খারাপ হয়েছে। নইলে, যুগযুগান্তর ধরে শুনে আসছি, আজ ফলেনা কেন সব? মাছমারাদের পাপ ঘটেছে নিশ্চয়।

তাই, পঞ্জিকাখানি এলে আগে দেখবে খুলে, মা-গঙ্গা এবার মাছ দিয়েছেন কত। কিন্তু তার মধ্যেও আজকাল আবার নানান ফ্যাকড়া দেখা দিয়েছে। দশজনের হয়েছে দশটা পাঁজি। তা না হয় হল, শুনেগেঁথে সবাই এক কথা লেখো। না তা লিখবে না। দশজনের দশরকম, নানা মুনির নানা মত। ভেবে মরে মাছমারারা। যদি বল, দেখ কেন দশটা, একটা দেখলেই পার। তা কি হয়। তুমি না দেখলে তোমাকে এসে শোনাবে আর-একজন।

তবে হ্যাঁ, শেষবেলায় আসল মর্জি মাছের! মন চাইল তো সে গোটা সমুদ্র ছেঁকে আসবে তোমার কাছে। নয় তো একেবারেই কানা। এমনো হয়েছে কতবার।

কেদমে পাঁচু বলল, এ পাঁজি-লিখিয়েদের ভাবসাব বাপু কিছু বুঝতে পারি নে! কলকাতার সেই পুরনো পাঁজিটা কত লিখেছে?

পাঁচু বলল, সে লিখেছেন পাঁচ। নতুন পুরনো, সবই তোমার কলকাতার। নতুনটা লিখেছেন দশ।

এতক্ষণে বলে উঠল বিলাস, পাঁচ দিলেও তোমার আর দশ দিলেও তোমার। পাঁজিপুঁতির কথা ছাড়ান দেও। ও-সব বাজার-গরম-করা কথা।

ওই শোনো কথা। বাপ-খুড়োর কোনো কথাতেই প্রত্যয় নেই। ফলুক না ফলুক সব কথা, তারা এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে। মাছমারার ব্যাটা মাছমারা, তুও বিশ্বেস যা তা হবে না। রাগ হয়ে গেল পাঁচুর। বলল, তবে কি ওগুলান মাঙনা মাঙনা লেখা হচ্ছে?

বিলাস বলল, মাঙনা হবে কেন? মাছের চে৷ কি পাঁজি বিক্কির কম হয়? ট্যাকের টাকা খসিয়েই হয়।

—গুয়োটা কমনেকার! খেঁচিয়ে উঠল পাঁচু।—আরে মাকড়া, আমি তোর পয়সার মাঙনা-মাঙনির কথা বলি নি। বলছি ঘটের বুদ্ধির কথা। মাঙনা বুদ্ধিতে তো আর ওগুলান লেখা হয় নি।

—আর সে বুদ্ধি স্যে আমি মলুম ফাঁপরে। কী আমার শখ রে!

ঢকঢক করে জল খেল বিলাস ঘটি কাত করে। পাঁচুর মনে হল ঠাস করে এক চড় কষায় ছেলেটার গালে। আবার বলল, যা আসবে, তা আমার জালে আসবে। পাঁজি লিখলেও আসবে, না লিখলেও আসবে। ও সবই তোমার জলের মর্জি। কী বলো পাঁচকা?

কেদমে পাঁচুকেও বিলাস কাকা বলে। কেদমে পাঁচুর মনটা আবার তেমন প্রসন্ন ছিল না বিলাসের উপর। সেই যে সেবারে 'বাছাড়' হয়ে গেল বিলাস, সেই দুঃখে। ...লি বলল, হ্যাঁ, যেমন দিনকাল পড়েছে—

আবার বলল বিলাস, এতখানি বয়স হল, কোনোদিন তো দেখলাম না যে পাঁজি একেবারে অব্যথ লিখেচে।

—এঃ, বড় তোর বয়স হয়েছে।

—ওই যা হয়েছে, তাই কে সামলায়।

দেখো, দেখো কথার ছিরি।

আবার বলল, ও পাঁজির কথা পাঁজিতে থাক। জলে আছি, জলের কথা বলো।

পাঁচু বলল, নে নে, তোর বক্তিমে রাখ দি-নি। সব ভুলে পেড়ে ফ্যাল। ভারী একেবারে দিগগজ এসে গেছেন।

এঁটো থালা গঙ্গায় ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধুঁতে ধুতে জলের দিকে তাকিয়েই নির্বিকার গলায় জবাব দিল বিলাস, তা, বাপ-খুড়োরা য্যাখন এতখানি দিগগজ করেছে—

ওই রকম গা-জ্বালানে কথা ছেলেটার। খুড়োকে রাগাবার জন্যে যে এমন করছে, তা নয়। বলে দিল, যা মুখে এল। তোমার কতখানি লাগল, কতখানি রাগলে, সে বোঝো গে তুমি।

পাঁচু রেগে বলল, মরবি কিন্তু গুঁতো খেয়ে।

বিলাস তখন গুনগুন করছে, শহরের আলো-কাঁপানো গঙ্গার দিকে তাকিয়ে।

কলকেটি নিজে সাজিয়ে হুঁকোয় চড়িয়ে টানলে খানিকক্ষণ পাঁচু। টেনে ছইয়ের মুখছাটে ঝুলিয়ে রেখে, কাঁড়ারে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসল জাল নিয়ে। বিলাস হুঁকোটি নিয়ে বসল গলুয়ে, অন্যদিকে মুখ করে।

পাঁচু বলল কাঁড়ার থেকে, তোর মা যে স্যাংলোখানা বুনে দিয়েছিল, সেটা কোথায় রেখেছিস?

বিলাস বলল, ছইয়ের মধ্যে আছে।

স্যাংলো হল ইলিশ মাছের হাতের জাল।

গুড়গুড় করে শব্দ হচ্ছে হুঁকোয়। গঙ্গাপারের শহর অন্ধকার হচ্ছে একটু একটু করে। আছে শুধু রাস্তার বাতিগুলি। বিজলী গাড়ির শব্দ আর নেই ঘন ঘন। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক যাচ্ছে দু-একটা স্টীমলঞ্চ, ছোট স্টীমার।

কৃষ্ণপক্ষের আজ ষষ্ঠী। চাঁদ উঠেছে, ঢাকা পড়ে রয়েছে মেঘের কোলে। মেঘের আড়ালে আড়ালে উঠছে, লুকোচুরি খেলছে, নইলে যেন ধরবে তাকে খপ করে।

তবে ঢাকা কি থাকে। সোনার চাদ বলে কথা। কালো মেঘও ফরসা দেখাচ্ছে তার রোশনাইয়ে।

নৌকা অনেকখানি নেমেছে। ভাটার টান এখনো মন্দ না। ঢেউ লেগেছে খুব। জল কমেছে কিনা। তার মানে বয়স কমল। এখন ছেলেমানুষের মতো কলকল ছলছল হচ্ছে। আবার যখন ভরে হবে টইটুম্বুর, তখন দেখবে, মুখে আর বাক্যি নেই। সংসারের নিয়ম। এই গঙ্গার বুকে বসে কখনো তোমারো বাক্যি হরে যাবে। জোয়ার কখনো দুঃখের, কখনো সুখের। মাছমারারা তার মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে গঙ্গার সুখ-দুঃখ। সুখে নয়, দুঃখে জোয়ার হলে, এমনিই হয়। বুকখানি ভরে যায়। প্রাণখানি টইটুম্বুর হয়ে, ফুলে ফুলে ওঠে। শুধু কথা সরে না মুখে।

এখন যেন ঝাপাই ঝুরছে গঙ্গা। তার সঙ্গে আছে দক্ষিণা বাতাস। দক্ষিণা বাতাস। বাতাসে ঠিক সেই গন্ধটি পায় পাঁচু, সেই ডাক শুনতে পায়। দক্ষিণের ডাক। যেন বুকে বান ডাকে,—পাঁ—চু!…

বয়স হল বৈকি দক্ষিণে যাওয়ার। ওই যে দেখা যায়, আকাশের পুব কোণে কে যেন চিকচিক করে হাসছে। বোঝে পাঁচু, খালি তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, মালোর পো, সময় হয়ে এল যে! যেন মীনচক্ষুর হাসি। বলছে, এইটাই সংসারের খেলা। মাছমারা, এবার তোমার পালা এসেছে! বিদ্যুতের চিকচিক চিকুর সেই কথাটার চমক দিয়ে যায়।

পালা আসবেই। শুধু বিলাসকে নিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হতে চায় পাঁচু। মরণের ভয় তো মাছমারার নেই। মরণ ও মারণ, ঐ যে তার প্রত্যক্ষ জীবনের পথ।

এ আষাঢ়ে রাত নেমেছে এখন পুবের ধলতিতা-বীরপুরেও।

এখানে জাগে মাছমারা এই গঙ্গার বুকে। ঘরে জাগে বউ-ছেলে মেয়ে-মায়েরা। ঘুম কি আছে। পুরুষ নেই ঘরে, বাপ নেই, ছেলে নেই। ঘুম-ঘুম বুক ছ্যাত ছ্যাত করে ওঠে। কে জানে, কোন অকূলে ভাসছে এখন তারা।

যখন যাবৎ সংসার ঘুমোয়, তখন মাছমারার বউঝিয়েরা জাগে। এইটা নিয়ম। তারা জাগে বারোবাস।

বর্ষার মরশুম যায় চার মাস। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। মাছমারা তখন অমাবস্যা-পূর্ণিমার, জোয়ার-ভাটার গোন-কোটালের পিছে পিছে ভেসে বেড়ায় গাঙে-নদীতে।

বউ তার ঘুমন্ত সন্তান বুকে নিয়ে জাগে ঘরে। অন্ধকারে দু চোখ মেলে সেও ভেসে বেড়ায় ঘরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে। এ বিধির বিধান নয়। বিধি দেয় রাত আর ঘুম। এই ঘরনী জাগে পোড়া প্রাণের বিধানে।

নদীতে পুবে শাওটার ঝড় বয়। বউ একা ঘরে শুয়ে বুকে চাপে দীর্ঘশ্বাস। অমন নিশ্বাস ফেললে অকল্যেণ হয়। নিশ্বাস চেপে সে শুধু প্রহর গুনে।

গাঙে বৃষ্টিতে ভেজে মাছমারা। বউ অন্ধকার ঘর থেকে আঁচলের ঢাকা দেয়। তবু নৌকার মানুষ জলে-ধোয়া হয়ে যায়। সে ঘর রাখতে পারে না।

তাই তোমার প্রাণ পোড়ে। কেন? না, তুমি মাছমারার বউ।

যখন মীনচক্ষু উত্তাল তরঙ্গের বেশে, ঘূর্ণির ছদ্মবেশে, ঝড়ে রুদ্র দাপটে ঘিরে ধরে মাছমারাকে, তখন ঘরে জাগে সতর্ক দৃষ্টি। মীন যাকে ছিনিয়ে নেবে নদীতে, তার প্রথম হ্যাঁচকা লাগবে এই ঘরে।

কেন? না, সে মাছমারার বউ। তার জন্যে বাঁচে, তার জন্যে মরে।

বর্ষার চারমাস কাটিয়ে যদি গাঙের মানুষ, চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রার ফেরে কাটিয়ে আসে কার্তিক, তবে পাঁচমাস। তারপরে ঘরে ফেরে সে।

তবু বউ জাগে ঘরে। উত্তুরে বাতাস বয়। জল ধরে টান। সমুদ্রে সাই যাওয়ার সময় হয়েছে। হাতে মাত্র কয়েকদিন।

বউয়ের সারাদিন কাটে ঘরকন্নায়। মাছমারা পুরুষ, রক্তে তার আগুন। সেই আঁচ লাগে বউয়ের রক্তে। এটা আগুনের ধর্ম। তখন সে মাছমারার সঙ্গে শোয়। এইটা সংসারের ধর্ম। তার পুরুষের সঙ্গে যে যাবে হাল টেনে, সেই সঙ্গীকে বউ গর্ভে ধারণ করে।

তারপর রাতভর বউ জাল বোনে। পাটা জাল পেতে বসে কোলের কাছে। সমুদ্র যাবে পাটা জালের সাই। ছেঁড়া জাল সারায়। নতুন জাল বোনে। লম্পর শিষ এঁকেবেঁকে নাচে তার চোখের সামনে। সে জাল বোনে, আর ঘুমন্ত স্বামীকে দেখে চেয়ে চেয়ে। এ জীবন তার মাছমারার নিয়মের জালে জড়ানো।

দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়। সাইদের ডাক শোনা যায়। ডাক আসে সাগরের। গাঙ, নদী, খাল, বিলের দিন পেরিয়ে, মাছমারা যাবে সাগরে। বউ বসে থাকে না।

বউ জাগে আবার। সতর্ক চক্ষু তার জাগে সমুদ্রে। নীলাম্বুধি অন্ধকারের বুকে, শাবরের আনাচে কানাচে, মাছের চকের পিছনে পিছনে, বনের অদৃশ্য দানোর সঙ্গে সঙ্গে, দক্ষিণ রায়ের পায়ে পায়ে, মা বনবিবির আঁচলে আঁচলে জাগে তার চোখ। আর তার বিনিদ্র আত্মা মাথা কোটে মাছের দেবতা খোকাঠাকুরের পায়ে। বলে, হে দক্ষিণরায়, তোমার খাড়া নজর দূরে রাখো। মা বনবিবি, মাছমারার শাবরে তোমার দৃষ্টি দিও না। খোকাঠাকুর, জাল ভরে, খোল ভরে মাছ দাও। তুমিই মাছমারার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তুমি দিলে, আমি আমার সোয়ামীর হাসিমুখ দেখব, ঘরে আমার সোহাগের বান

ডাকবে। আমার ছায়েরা হেসেখেলে বেড়াবে, আমার হাঁড় ভরে থাকবে। নতুন সুতো আসবে, নতুন জাল বুনব আমি। আমি পুজো দেব তোমাদের সকলের পায়ে।

অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন। ফাল্গুন পড়তে না পড়তে আসে দখনে বাওড়। সমুদ্র মেতে ওঠে নিজের লীলায়। তার ফোঁসানি গর্জানি দেখে মরণ আসে দুহাত তুলে।

মাছমারা ফিরে আসে। কিন্তু বউ জাগে। কেন? না, এর নাম চৈত্রমাস। কথায় বলে চৈত-টোটা। অর্থাৎ চৈত্র-মন্বন্তর। সমুদ্রে পাওয়া কড়ি গেছে মহাজনের বকেয়া সুদ শুধতে। দুদিন প্রাণ খুলে হাসতে না হাসতে হাঁড়িতে যায় টান ধরে। তখন আবার জলে। কিন্তু জল নেই জলাশয়ে—বাওড়ে-বিলে-খালে। পুরনো-পাঁক জলে শুধু পোকা। যা পাওয়া যায়, তাতে ঘরের একবেলার পেটও ভরে না। ঋণ বারোমাস। মহাজনেরও সময় বুঝে মেজাজ খারাপ হয়। জাল-নৌকা-ভিটে, তখন সব বাঁধা পড়ে আবার।

বউ রাত জেগে বসে ভাবে, রাত পোহালে কী ফোটাবে সে আগুনে, কী বেড়ে দেবে সামনে!

তখন মাছমারা কাপড় ছুপিয়ে সন্ন্যাস নেয় গাজনের। বলে, জয় বাবা বুড়ো শিবেরো লাগি……

সন্ন্যাসের হাঁকের আড়ালে মাছমারার খিদের কান্না কেউ শুনতে পায় না।

নয়তো পাপ দেখা দেয়। অভাবে অ-কাজে কু-চাল ধরে মাছমারাকে। তখন রঙ্গ, রস, পীরিত—সব যায়। পাপ করে সে, পীড়ন করে ঘরের মানুষকে। তখন রাত্রি কাটে কেঁদে কেঁদে।

তারপর বৈশাখে নতুন জল আসতে থাকে, জ্যৈষ্ঠে চলে প্রস্তুতি, আষাঢ়ে আসে অম্বুবাচী।

বড রাত জেগে আবার জাল বোনে, সারে। ঘরের খরচের জন্যে মহাজনের সুতোও নেয়। হাত-পিছু ফুরনে বোনে জাল।

তুমি মাছমারার বউ, তুমি জাগো বারোমাস।

এইটা নিয়ম।

এখন এই আষাঢ় রাত। ঝিঁ ঝিঁর টানা-ডাকের সঙ্গে তোমার মনেও একরকমের ডাক শোনা যাচ্ছে সর্বক্ষণ। ভাবো, কোথায় ভাসছে ঘরের মানুষেরা।

পাঁচু ভাবে, ভাসব আর কোথায়। এ তো সমুদ্র নয়, মা-গঙ্গার কোলে এসেছি। যার পেছনে পেছনে এসেছি, সে শুধু জলের তলে নয়। সে আমার জীবনমরণ, সে মেঘে মেঘে, বজ্রে বজ্রে, জলের ঢেউয়ে, দক্ষিণের বাতাসে।

বিলাসের হুঁকোর শব্দ থেমেছে অনেকক্ষণ। ছইয়ের মুখে নিভেছে লম্প। কাঁড়ারেই চোখ বুজে এসেছে পাঁচুর। সমুদ্রের টানে ভাটা নামছে তখনো কলকল করে। এখানে শেষ করে সে অশেষের বুকে যায়। তাই এত কথা। কানে গেল, বিলাস গান করছে। শোনো! কোথায় ভাবছে, ছোঁড়া ঘুমোচ্ছে, তা না, গান ধরেছে গলুয়ে শুয়ে শুয়ে!

আমার প্রাণে নাই সুখ—হে
বড় উথালি-পাথালি আমার বুক।

ওদিকে কেদমে পাঁচুর গলা শোনা গেল, হুঁ!

ভাবখানা, বুঝেছি তোমার গানের মানে। একটু বিদ্রূপ যে আছে, তা জানে খুড়ো পাঁচু। কেদমে ভাবছে, তেঁতলে বিলেস মনে মনে দেখছে অমর্তর বউকে। তাই গান ফুটেছে গলায়।

আসলে গাঁ-ঘর ছেড়ে নতুন জায়গায় এসেছে বছর ঘুরে। তাই ঘুম আসছে না। আর অমর্তর বউয়ের কথা! পাঁচু তো জানে, ও-সব সত্যি নয়। সত্যি নয়, অর্থাৎ অমর্তর বউয়ের কাছে যাবার জন্যে বিলাসের প্রাণ উথালি-পাথালি নয়। বলে, সাপে মানুষকে ছোবলালে, বেশীদূর যেতে পারে না। মানুষের বিষক্রিয়া হয় তার প্রাণে। সংসারের নিয়ম এইটি। কুড়োল দিয়ে কোপাও কাউকে। তোমারে কোপ লাগবে কোথাও। কাউকে প্রাণে মারলে, তোমার প্রাণেও লাগবে। সে কি তুমি সব সময় ঠাহর করতে পারবে? তা পারবে না। তুমি মাছ মারো, তোমাকেও সে মারে পলে পলে। সে

কি তুমি বুঝতে পার! কিন্তু মারছে দিবানিশি। কখনো একটু একটু করে, নির্ঘাত কখনো।

সেই তুপুরে অমর্তর বউকে ছুবলে এল বিলাস। কিন্তু বিষ নিয়ে এল। সবটাই এ সংসারের বড় বিস্ময়ের ব্যাপার। এই জল, মাটি, আকাশের মতো, আকাশের চাঁদ-সূর্য-নক্ষত্রের মতো। সবাইকে তুমি দেখতে পাও, কিন্তু তার সবটুকু তুমি জানতে পার না। কী দিয়ে অনুমান করবে পাঁচু বিলাসের এই ব্যাপারটি।

না, এ যেন সেই হেতম পাগলার ব্যাপার ঘটল। কে নাকি ওর সম্পত্তি মেরেছে ফাঁকি দিয়ে। পাড়ার সুরীনকে দেখলেই রোজ ছুটে আসে খাঁড়া নিয়ে। একদিন, তুদিন, দশমাস। পাগল হোক ছাগল হোক, হাতে তো আছে খাঁড়াখানি। সুরীনের মনটা আটকা পড়ে গেল ওই খাঁড়ার ধারেই। হাসি পায়, ভয়ও হয়। একদিন খাঁড়া কেড়ে নিয়ে মারলে কষে হেতমকে। সেই থেকে হেতম আর খাঁড়া হাতে করে নি।

কিন্তু সুরীনের মনটা গেল বেজায় খারাপ হয়ে। হেতম আসে নি আর কোনোদিন ছুটে, তুজনের দেখা-সাক্ষাৎও নেই। কী দরকারই বা ছিল তার। কিন্তু কী জ্বালা বল। পাগল মেরে সুরীনের মনটা গেল মুষড়ে।

বিলাসের হল যেন তাই। সবই তো শুনেছে পাঁচু ওর বন্ধু সয়ারামের কাছ থেকে। সয়ারাম বলে, খুড়ো, ভাইপো সামলাও।

—কেন রে?

—না, কী যেন ওর হয়েছে।

—কী হয়েছে? বলে কী?

সয়ারাম বলে, বিলাসের কেমন ভাব-বেরভোম্ হয়েছে। চলে

ফেরে, বলে, আবার থেকে থেকে চুপ মেরে যায়। কী যেন দেখে ইতিউতি। হাত ঝাড়া দেয়, পা ঝাড়া দেয়।

সয়ারাম বলে, কেন? জিজ্ঞেস করি, কী হল রে তোর বিলেস? বলে, কী আবার হবে, হয় নি কিছুই। তবে মনটা দিবানিশি কেমন যেন ফসফস করে। ফসফস করে? কেন? ওই, জিজ্ঞেস করলেই চটে গেল। এই এক থাপ্পড় তুলে, ভেংচে বলবে, কেন, তা কি আমি জানি রে মাটো। জানলে তো বলতুম আগেই। হুঁ। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলি, হ্যাঁ রে বিলেস, অমর্তর বউয়ের জন্যি তোর মন আলগা আলগা লাগে না তো।

কথা বলে না। হুঁ। ওইখানেই ওস্তাদের ঘুণ ধরেছে। বলি, বল না, চুপ করে রইলি কেন। কালামুখী আবার কী তুক করল, সেটা দেখতে হবে তো। নইলে শেষে প্রাণে মরতে হবে। গুণীন ওঝা দেখাতে হবে তাড়াতাড়ি।

অমনি মারমূর্তি! সয়ারাম এবার মাটো ছেড়ে শালা। বলে, তোর গুণীনের ইয়ে করি। চলছি ফিরছি খাচ্ছি, কাজ করছি, কোথায় তুই আমাকে খারাপ দেখলি?

সয়ারাম বলে, কী আর বলব। চুপ করে থাকতে হয়। শুধু দশটা কথা বলে আর চড়-চাপড় খেতে পারি নে বাপু। শত হলেও বিয়ে-থা করেছি, একটা ছেলে হয়েছে। লোকে দেখলে কী ভাবে! কিন্তু চুপ করেই বা থাকি কেমন করে। দেখি, ও পাড়ায় গেলে, গাম্‌লি পাঁচী ঠোঁট টিপে হাসে আড় চোখে চেয়ে। বন্ধু আমার মায়ের কোলের ছা-ছের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পাঁচীর দিকে।

তখন আমারই ওকে শালা বলতে ইচ্ছে করে। হয় হাস, নইলে তাকিয়ে থাকিস নে শুধু। তেরো বছরের গাম্‌লি পাঁচী, সেও ভাবে,

লোকটার হল কী? যেন নতুন দেখছে পাঁচীকে। খুঁটে খুঁটে দেখছে। তখন বলি, ছাখ বিলেস, এট্টা কথা বলব?

—বল।

—তোর প্রাণে ভাই কোনো দুঃখু আছে?

—আছে।

—আছে? তবে সেইটে কেন বলছিস নে? সয়ারামকেও বলতে পারিস নে, যার কাছে তোর ঢাকাঢুকি নেই? বলি সেটা বল।

একটু চুপ করে থেকে বলে, কাজটা ভালো হয় নি সয়া।

—কোন্ কাজ?

—ওই ব্যাপারটা।

বলতে পারে না মুখ ফুটে, অমর্তর বউয়ের ব্যাপারটা। গতিক তো সুবিধের নয়। তাহলে কি মেয়েমানুষটা একটা 'খারাপ' কিছু করে দিলে। ভয়ে আমি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করি, কী তোর মনে হয় বল দি-নি।

আবার রাগ হয়ে গেল। ওই যে, দুহাতে জড়িয়ে ধরে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছি। বলে, অমন মেয়ে-ন্যাকড়ামো করছিস কেন?

তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলি, বল।

বলে, কাজটা আমার ভালো হয় নি।

—কেন?

—কি জানি! মন বলছে, কাজটা আমার ভালো হয় নি।

হু, ধরেছি। জিজ্ঞেস করি, ওর কাছে যেতে মন করছে আবার, না?

কী যেন ভাবে। ভেবে বলে, না।

না বললে শুনব কেন। বিয়ে-থা করেছি, ও বিষয়ের টান তো

বুঝি। ভগবানের ওটা মস্তবড় খেলা। কত স্বাদ সৃষ্টি করে রেখেছেন সংসারে। তার শেষ নেই, সীমা নেই। এই মায়ার সংসারে বাস কর তুমি। ওই স্বাদ আসলে মায়া। প্রথম মায়া মাটি। মানুষ দূরের কথা, ইট-পাটকেলটিও ছুঁড়ে দাও উঁচুতে, ঝুপ করে পড়বে সে মাটিতে। তোমাকে সে টানে দিবানিশি। ওই টান হল মায়া। ওই মায়ার আর-এক স্বাদ। তুমি বাঁধা আছ ওই মায়ার বাঁধনে। সে স্বাদ মাটিতে, জলে, গাছে, মানুষে। সংসারের যাবৎ স্বাদ পেলে তুমি পুরো মনুষ্য। আর যে এই সংসারের স্বাদ পেয়েছে, সে আর তা কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

বিলেস না বললে শুনব কেন। বলতে বন্ধুর সরম লাগছে। বলি, না কেন? যেতে মন করলে দোষ কী, আমার কাছে বল না।

চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবে।—কী রে, বল না। আমি তো আর পাড়াঘরে বলে বেড়াতে যাচ্ছি নে। মুনি-পুরুষের মতি-বেরভোম্ হয় তোর কী দোষ। তুই তো আর জোরজবরদস্তি করে কিছু করিস নি। যা করেছে, সে-ই করেছে। তবে হ্যাঁ, পেতনীর দশদিন, ওঝার একদিন। তা কী করা যাবে। তা বলে এট্টা ভালো-মন্দ দেখতে হবে তো।

ফিসফিস করে বলি, মন করে তো যা। মন করে থাকলে ওইতেই সব ঠিক হয়ে যাবে'খনি।

কথা শেষ হল না। আমার ঘাড়ে যেন লোহার মুগুর পড়ল। মারলে আমাকে। খেঁকিয়ে উঠল, বলছি তখন থে না না না, অ্যাকার কানে ঢোকে না। আমি কি তোর মুনিপুরুষ যে আমার বেরভোম্ হবে?

আমার লজ্জা নেই, তাই আবার বলি, তবে?

দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, বড় ঘেন্না করছে নিজেকে।

ঘেন্না করছে নিজেকে! এ তো মনের কথা। [illegible]
বলি কেন?

—কী জানি! নিজের পরে ঘেন্নায় বাঁচছি নে সয়া। আর অষ্টপোহর আমার মন ফসফস করে।

—কেমন?

—বুকটা বড় খালি খালি মনে হয়। অমর্তর ভিটের ধারে আমার চোখ তুলে চাইতেও মন করে না। কিন্তন্ আমার শরীলের কী য্যানো গইড়ে বেড়াচ্ছে। ওই যেমন পদ্মপাতায় জল টলমল করে, তেমনি। আমার বুকের ভিতরে ভিতরে। আমি বসতে শুতে টাল সামলে বেড়াচ্ছি। আমার মন, আমার শরীল যেন কে বেঁধে রেখেছে। আমার কী হয়েছে। আমি ছাড়ান চাই। ছাড়ান অর্থাৎ মুক্তি চাই।

সয়ারাম বলে, যাঃ, আমার হাতছাড়া হয়ে গেল। এট্টা কথাও বুঝলুম না। আমার বুদ্ধিতে আর কুলোল না। কিন্তু ভয়ে প্রাণ বাঁচে না। এ যদি গুণ-তুক না হয়, তবে গুণ-তুক কাকে বলে। তবু বলি, হ্যাঁ রে, গাম্‌লি পাঁচীর কাছে যেতে মন করে?

—না। বড় একফোঁটা মেয়ে।

একফোঁটা মেয়ে! পাঁচী যদি একফোঁটা মেয়ে, তবে গাঁয়ের মধ্যে ডাগর আছে কে আর। বাইরে বাইরে বয়স তেরো। ওদিকে ঘরের মধ্যে চোরাবাণ এসে যে পনেরো পার হতে চলল, সে খবর কে রাখে। পুরুষমানুষের খবর কম জানতে পারে সয়ারাম। মেয়েদের খবর তার নখদর্পণে। কেন, না, ভালো বল, মন্দ বল, মেয়েমানুষের মতন, মেয়েদের সঙ্গে তার ওঠাবসা বেশী। গাঁয়ের বউ-ঝিয়েরা মন খুলে তার সঙ্গে ঘরের কথা বলে শান্তি পায়।

তাই সে জানে, পাঁচী একফোঁটা মেয়ে নয়। গতরে বল, গতরেও

মরশুমের জোয়ারে, ছেয়ালো ছেয়ালো ভাবখানি বেশ হয়েছে। নাকখানি একটু বোঁচা। তা, মেয়েমানুষের বেশী তোলো নাকও ভালো নয়। চোখ দুটি ডাগর। শুধু ডাগর নয়, চোখ দুটিতে কিছু কথা আছে। সব চোখে কথা পাওয়া যায় না। চোখের মতো চোখ হলে কী সব কথা যেন থাকে। সে কথা তোমাকে বুঝতে হবে। মাথায় থুপিথুপি চুল আছে একরাশ। বলে, মালোপাড়ার জোয়ানেরা অষ্টপ্রহর ছুঁকছুঁক করে বেড়ায় কেন হিদে মালোর গাম্বিলতলায়। গাম্‌লি পাঁচীর জন্যেই তো। নেহাত গাঁয়ের বাছাড়ে বীর তেঁতলে বিলেস আছে, তাই বেশী এগুতে পারে না। সে মেয়ে একফোঁটা হয় কেমন করে বুঝতে পারি নে।

আর মনের কথা বল, সেটিও কম ডাঁশে নি। চোখ দেখলে তো বুঝতে পারি। কেম না, মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করি। ঠাওর করতে পারি চলন দেখলে। অতবড় মেয়ে, ঘুরে ঘুরে খালি খালধারে যায়।

ও পাঁচী, খালধারে কেম গো?

না, দেঁইড়ে আছি।

কার জন্যে?

অমনি চোখের কোণে চোরা হাসি চিকচিক করে ওঠে। কিন্তু মুখখানি শুকনো। বলে, কার জন্যে আবার! খালধারে কে আসবে?

আসে, আমার বন্ধু আসে। তার যাওয়া-আসার এইটি পথ। কিন্তু পাঁচীর কথার মধ্যে একটু নালিশ আছে। ওই যে বলে, 'খালধারে কে আসবে?' অর্থাৎ সয়ারাম, খালধারে সবাই আসে, তোমার বন্ধু আসে না।

মনে মনে হেসে বলি, আচ্ছা, দেখা যদি হয় কারুর [illegible], তবে পেইটে দেবখনি খালধারে।

অমনি পাঁচীর ঠোঁট দুখানি উলটে যায়। বলে, আহা-হা! দিও, আমার বয়ে গেছে।

তার বেশী বলতে পারে না। সয়ারাম তো পাঁচীর ঠাট্টার মানুষ নয়। সে তার সয়া খুড়ো।

বলে, ও সয়াখুড়ো', নদীর পারে নাকি আজ মারামারি হয়েছে? ঠিক্ খবর পায় পাঁচী। কেন? না, মারামারি হয়েছে বিলাসের সঙ্গে। বলি, হ্যাঁ, এট্টু-আদটু হয়েছে।

পাঁচী বলে, শুদু মারামারি হল? খুনোখুনি হল না কেন?

বোঝো ব্যাপারটা। অর্থাৎ রাগ হয়েছে বিলাসের ওপর।

সয়া খুড়ীর সঙ্গেও বড় ভাব পাঁচীর। খুড়ী আবার খুড়োর চেয়ে দড়ো। প্রাণের কথা টেনে বার করে। বলে, পাঁচী ঘুরে ফিরে এ পাড়ায় আসে। ব্যাপার বড় গুরুতর।

বটেই তো। সে মেয়েকে সয়ারাম একফোঁটা বলে মানবে কেমন করে।

বিলাসকে বলি, সে মেয়ে যদি একফোঁট্টা তবে কি এট্টা ধুম্‌সী মাগী চাই তোর?

দমাস করে একটা ঘুষি মারলে আমাকে। বললে, বানচত, তোর কাছে কি বিলেস মাগী চেয়ে ফিরছে, অ্যাঁ? শালার খালি আর আনতে কুড়।

যখন মনের ঠিক থাকে না, তখন ভালো কথা বললেই মারতে আসে। তার ওপরে একটু বাঁকা কথা বলে ফেলেছি। পাঁচীকে একফোঁটা বললে, তাই। মারবে বৈ কি। আমার লজ্জা নেই,

তবে কোনটা।

—তা কি জানি। জানলে তো বলব।

হ্যাঁ, ব্যাপার বড় শক্ত। নইলে, পাঁচীকেও মনে ধরে না। আসলে ও পথেও কাঁটা দিয়েছে অমর্তর বউ।

হুঁ, বন্ধুর আমার মন বুঝলুম না। তাই বলি, পাঁচখুড়ো, গতিক সুবিধের নয়। ভাইপোকে সামলাও।

পাঁচু ভাবে, সামলাব আর কী। কাউকে ছোবলালে, তার বিষক্রিয়া হবেই। তাই হয়েছে বিলাসের। এখন চাই একটি বউ। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওইটি দরকার তাড়াতাড়ি। এইবার, এই বছরটিই শেষ।

এবার দয়া করুন মা-গঙ্গা, নৌকোর খোল ভরে দিক মাছে মাছে। গামুলি পাঁচীতে মন না ওঠে, আর কোথাও দেখা যাবে। তবে এই মরশুমটা কাটলেই, আর দেরি নয়। বিলাসের দিকে তাকিয়ে যে এমনিতেই কাঁটা ফোটে চোখে। অমন জোয়ান ছেলে, ঠিক থাকে কখনো।

এখন উজানে চলার সময়। ঠেলে, ধাক্কা দিয়ে, ছিঁড়ে প্রলয় করবে সে। মাছের দিকে তাকিয়ে দেখো, জলের গতি দেখো। যখন যেমন তখন তেমন।

তবে ছেলে ডাগর মেয়ে চায়। চাইবেই। পোড়-খাওয়া ছেলে কি না। আলতা পায়ে মল পরে, নথ-পরা মেয়ে খালি মন্দার সোহাগ খাবে, দুটি কথা বললেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে, তা হবে না। মাছমারার বউ যে হবে, সে হবে ডাঁটো মেয়েটি। দশ রকম কাজকর্ম করবে, ঘরের মানুষের মন বুঝতে হবে। সবদিক দিয়ে বেশ শক্ত চৌকস হওয়া চাই।

ছেলে পাকা হলে যেমনটি চায়, তেমনি চেয়েছে। সংসারের নানান প্যাঁচের মধ্যে বড় হয়েছে। বাপ হারিয়েছে সাত বছর। কে একটি পুঁটকে মেয়ে এসে দুদিন বাদে অমর্তর বউয়ের কথা শুনে, ব্যাপার না বুঝেসুঝে শুধু জ্বলে মরবে, সেটা ঠিক হবে না। সংসারে একটা ওজন বলে বস্তু আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একটা ওজন আছে। শরীরের নয়, মনের ওজন। সংসারের পাল্লা-বাটখারায় তার ওজন হয় প্রতিদিনের ঘর করার মধ্যে। ওখানে কোনো কারচুপি চলে না। পাল্লা সমান না হোক, যে-কোনোদিকেই ঝোঁকতা বেমানান রকম বেশী হলে ঘরে অশান্তি হয়। এইটা নিয়ম।

আরো মানতে হবে, বিলাসেরা একালের ছেলে। ওরা তৈরি মেয়ে চায়। তুমি আমি যে ভয়ে ঘরের মেয়েকে গলার কাঁটা ভেবে বিদেয় করি, ওরা সেটা মানে না।

মেনে লাভ নেই, তা জানে পাঁচু। তা হলে অনেক কথা বলতে হয়। নিজের যৌবনের কথা, দাদা নিবারণের পাঁচালী আওড়াতে হয় মনে মনে।

থাক সে-সব কথা। বিলাসের একটি বউ চাই শুধু। একটি ডাগর-সাগর বউ।

বিলাস থামছে। অন্ধকারে দেখছে এদিকে ওদিক। আবার গান ধরছে,

> না দেখে তোমারে, আমার নয়নে নাই সুখ-হে
> বড় উথালি-পাথালি আমার বুক।

বড় উথালি-পাথালি আমার বুক। সে তো একজনের নয়, সারা সংসারের বুক উথালি-পাথালি। পাঁচুর বুক উথালি-পাথালি করছে না! করছে, তবে অন্য কারণে। এই যতগুলি নৌকো রয়েছে, সকলের প্রাণই করছে।

টানাছাঁদি টেনে চলি, পাথালি নৌকোর বুক হে
ওই আওড়ের ঘূর্ণি-জলে দেখব তোমার মুখ ॥
বড় উথালি-পাথালি আমার বুক ॥

হ্যাঁ, টানাছাঁদি জাল বেয়ে সে যাবে। জাল ফেলে স্রোতের মুখে নৌকা সোজা যায় না। তখন নিয়ম আলাদা। নৌকা পাথালি চলে। অর্থাৎ নদীর আড়াআড়ি চলে। বিলাসের বুক এখন ওইরকম, খাড়া বাতাসের মুখে আড়ে পড়ে গেছে। মনের সোজা পথ গেছে ঘুরে। আওড়ের ঘূর্ণিতে যেখানে মরণ আছে, সেইখানে তার মুখ দেখতে চায়।

কলকাতা শহর চুপ করে না কখনো। কিসের যে শব্দ হচ্ছে চারিদিকে, কে জানে। যেন রাত এখানে আসতেও পারে না একটু নিঝুম শান্তি নিয়ে। এদিকে ওদিকে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা লাল আলো। ওগুলো কলকারখানার চিমনির আলো! বন্দরের দিকে আকাশটি যেন ভোরের সদ্য-উদিত সূর্যের আলো ছড়িয়ে ফুটফুট করছে। ওই দূরে দেখা যাচ্ছে শ্মশান। শ্মশান! সব লীলা সাঙ্গ করে সবাই আসে ওইখানে।

কিন্তু ভেবে অবাক পাঁচু, অমন আলো-ফুটফুটে শ্মশান-ঘাটে শেয়াল আসে কী করে। আসে না নিশ্চয়। বাস করবার জায়গা কোথায় তার আশেপাশে। এত বড় শহর। এ শ্মশানে শেয়াল বড় জব্দ হয়েছে তো।

গঙ্গা কিছুক্ষণ যেন ন যযৌ ন তস্থৌ হয়েছিল। এখনো রয়েছে। চাঁদ-ঢাকা মেঘলা আকাশ। শহরের আলো নয়, ওই মেঘলা আকাশেরই আলো যেন চিকচিক করছে অস্পষ্ট গঙ্গার জলে। চিকমিক করে বেশী দু-তিনটি জায়গায়, যেন দু-তিনটি লম্বা রেখা চলেছে তরতরিয়ে। কোনোটি উত্তরে। কোনোটি দক্ষিণে। হঠাৎ

ঠাহর করতে পারবে না। আনাড়ীতে, জোয়ার এল, প [illegible]
দক্ষিণে। এ শুধু রাতের অন্ধকারের খেলা নয়। দিনমানেও তাই। আসলে, তোমার সব কটি ধারাই সত্যি। জোয়ারও এসেছে, ভাটাও যাচ্ছে। এক দিক দিয়ে আসে, আর-এক দিক দিয়ে যায়। এ হল, যাওয়া-আসার মাঝামাঝি। আসলে, যার আসার সে এসে গেছে তলে তলে। যাওয়ার যে সে চলে গেছে অনেক দূরে, অগাধ সমুদ্রে।

তারপর হঠাৎ মনে হল, কাঁড়ার যেন দুলে উঠল একটু। দুলে উঠে সরে এল একটু উত্তরে। চোখের ঝিমুনি ঘষে নিলে পাঁচু। তাকালে ভালো করে। ডাকলে, হ্যাঁ রে, বিলেস!

বিলাস জবাব দিল কাঁড়ার থেকে, হ্যাঁ, এসে পড়েছে। ওঠো।

পাঁচু ডাক দিল, কই গো, ও কদমপাঁচু।

জবাব এল, হ্যাঁ, টের পেয়েছি। বলে সে আবার ডাক দিল, কই হে অনাথ, ঘুমুনে পড়লি নাকি?

জবাব শোনা গেল, না, আন্দাজ লইছি।

উঠল সবাই। সাত নৌকার সব মাছমারারা, বাছাড়ি নায়ের মাঝি। জোয়ার এসেছে। সাত নৌকা, সবাই উত্তরের যাত্রী। পুব থেকে পশ্চিমে এসে, যাত্রা এবার উত্তরে।

হাওয়ার গতিক কেমন? ভালোই। দক্ষিণে বাতাস, তার সঙ্গে আছে একটু পুবে হ্যাঁচকা। সাত নৌকায় উঠল মাস্তুল। পাল খাটানো হল। নিঝুম গঙ্গা সচকিত হয়ে উঠল সাত নৌকার মাঝিদের কথাবার্তায়। মাস্তুল দাঁড়াল, পাল উঠল। বাতাস লেগে উঠল ফুলে। নৌকা কাত হল বাঁয়ে, অর্থাৎ পশ্চিমে। বাতাসের চাপ গলুয়েও কম নয়। নোঙর উঠেছে পালের আগেই।

মেঘ-ঢাকা চাঁদের আলোয়, মাস্তুল আর পালগুলি জীবন্ত অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হয়ে দেখা দিল।

গলুয়ে বসে বিলাস দাঁড় খাটালে ডাইনে। জলে চাড় দিয়ে বললে, মেঘ উড়ে যাবে মন নিচ্ছে।

সেই রকমই মনে হচ্ছে আকাশের গতিক। বাতাস বেশ জোর। দাঁড় টানার সুযোগও নেই বিশেষ।

সাত নৌকা চলেছে আগে পিছে। বাছাড়ি নৌকা। হাত তিনেকের বেশী চওড়া নয়। লম্বায় আটাশ হাত থেকে একত্রিশ হাত। কাঁড়ার আর গলুয়ের উঁচু-নিচু ঠাহর হয় না। ছই না থাকলে বাঁশের গুড়োয় মনে হয়, গোটা নৌকাখানি যেন পেল্লায় একটি জানোয়ার দাঁত বার করে আছে। এই নৌকা সমুদ্রে যায়, নদীতে আসে, খালে বিলে ঘোরে।

কথায় বলে ময়ূরপঙ্খী। সেটা হল রাজসিক। যে যাবে লড়াই করতে স্রোত পেছনে ফেলে, বাতাসের আগে, সে হল এই সাপের মতো সরু হিলহিলে বাছাড়ি নৌকা।

পুবের বাচ খেলায়, সে তোমার টাকির বাবুরাই দিন আর গাঁয়ের পয়সাওয়ালা আমুদে লোকেরাই দিন, জয়তিলক আঁকা থাকে বাছাড়ির কপালে। বাছাড়ি নৌকা হারে নি কোনোকালে। বিশেষ পাঁচুর এই বাছাড়ি। ধলতিতার নাম রেখেছে এই নৌকা। নাম কি আর এমনি এমনি রেখেছে। যেমন নৌকা আর তেমনি ছিল মাঝি। কাঁড়ারের মুখে থাকত স্বয়ং নিবারণ মালো। কালো কুচকুচে হাতে থাকত কালো বৈঠা। বানের গুণ-ছোঁড়া তীরের মতো সেই বৈঠা বাতাসের আগে সামনে ছুটত যেন। কী একটা হাঁক দিত। সেই হাঁকে যেন অন্য নৌকার বেচুড়েদের হাতে আলগা হয়ে যেত বৈঠা। তাদের নৌকার তলে জল যেত থিতিয়ে। মাঝিরা বলত, গুণ জানে, গুণ করেছে।

মাথায় করে নাচত ধলতিতার মানুষেরা। টাকির অনাথ বেজায়

ওস্তাদ মাঝি। সেও হেসে বলত নিবারণকে, পিতি বছরেই তুমি আস নিবারণদাদা, এ বছরডা কামাই দেও।

পাঁচুর দাদা বলত, দিই কেমন করে বল। যমে ছাড়ে না যে। গাঁয়ে বাস করতে হয় তো!

অর্থাৎ আদর করে গাঁয়ের লোককে যম বলা হল। জবাব দেওয়া হল অনাথকে। আর উত্তরের সারাপুলের অর্জুন মাঝি বলত, নিবারণের ঠ্যাং না ভাঙলে ধলতিতার হার হবে না কোনো কালে।

ঠ্যাং ভাঙতে পারে নি, কিন্তু ভাঙতে চেয়েছিল অর্জুন। নইলে গাঁয়ে ডেকে নিয়ে, ঘুটঘুটি অন্ধকার রাতে, ভাঙা সাঁকো দেখিয়ে দিত না।

ক্ষমতায় আর আক্রোশে ওইখানে তফাত।

আর এই এক বড় খেলুড়ে হয়েছেন পাঁচুর ভাইপো। গত সনের আগের সনে, তিনটে মাঝিকে জখম করে, তাদের নৌকো ডুবিয়ে, তুলকলাম কাণ্ড করে, ধলতিতার নাম রেখে এইয়েছেন। অবশ্য দোষ ছিল সারাপুলওলাদেরই। অর্জুন বাপের সঙ্গে পারে নি, ব্যাটাকে জব্দ করতে চেয়েছিল। তার বাঁ দিকে ছিল বিলাসের নৌকা। বাওনদার ছিল সব কটি বিলাসেরই চেলা। অর্জুন নিয়ম ভঙ্গ করে, কাঁড়ারের মুখ ঘুরিয়ে আটকাতে চেয়েছিল বিলাসদের।

নিবারণের ব্যাটা হাঁক দিলে, ওপর ছে যা।

তাই গেল। অর্জুনের কাঁড়ার ভেঙে নৌকো ডুবিয়ে নিশানের কাছে গিয়ে পৌঁছল।

বাবুরা মহাজনেরা বললেন, বিলেসের কোনো দোষ নেই। বে-কায়দা করেছিল অর্জুন।

এ তো চোখের আড়ালে ঝোপেঝাড়ের বিষয় নয়। সকলের চোখের সামনে। চব্বিশ পরগনার গোটা পুব তল্লাটের মানুষেরা সেখানে। সবাই একবাক্যে সায় দিলে, কোনো দোষ নেই বিলাসের।

খেপে আগুন পাঁচু নিজে। দশজনের সামনেই বিলাসের গালে থাপ্পড় কষিয়ে দিলে, গুয়োটা, লৌকো ঘুরিয়ে চলে এলি নে কেন তুই?

দশজনে ধরে বলল, আরে কর কী কর কী পাঁচদা?

কিন্তু অর্জুন ছাড়ল না। সেই রাত্রেই ফেরবার পথে মারামারি হল। আজো দাগ আছে বিলাসের পিঠে।

দেখতে দেখতে কাশীপুরের সীমানা ছাড়াল। উঁচু পাড়ে মাল-গুদামে ঠাসাঠাসি। জেটি এসে দাঁড়িয়েছে গঙ্গার কোমর ঘেঁষে।

সাবধানে হে। বড় গাধাবোটের ছড়াছড়ি। একে জোয়ারের টান। তায় পালে ঠেলা বাতাসের। ধাক্কা লাগলে আর সামলানো দায় হবে। আর আছে এপারে ওপারে বড় বড় জেটি। যেন বড় ফাঁদের লোহার জাল। জেটির নীচের জবরজং লোহার ফাঁদে পড়লে, রক্ষে থাকবে না।

তারপরে, ওই যে দেখা যায় বরানগরের সেই বাড়ি। নাম মনে নেই আজ আর পাঁচুর। শুনেছে, বাড়ি ছিল কোন রাজার। এখন ভেঙেচুরে একসা। বাড়ির মাথা ফুঁড়ে উঠেছে অশ্বথ, ভাঙা দেয়াল পাঁচিল জানালা দরজা, জড়িয়ে ধরেছে লতাপাতা। দিনের বেলা দেখলে গা ছমছম করে।

রাজার বাড়ি এখন ভূতের বাড়ি। আগে পুবের মাছমারারা প্রথম এসে ঠাঁই নিত এখানে। তারপর যাত্রা করত উত্তরে।

তা ছাড়া খালের মোড়ে জায়গা কম। তারপরে কলকাতা শহর বলে কথা। তার ধার ঘেঁষে থাকতে গিয়ে কখন কী ঘটে যায় বলা

তো যায় না। সবাই সরে আসত এই তল্লাটে। আর একটু টান ছিল। উত্তরে যে দেখা যায় টালি আর চালা ঘরগুলির ইশারা, ওইটি মাছমারাদের গ্রাম। অধিকাংশই পাঁচুদের পুবের মানুষ, এসে ঠাঁই নিয়েছে এখানে। গঙ্গার ধারে ওই জোয়ার-ভাটার যাওয়া-আসার মধ্যে একটু দেখাশোনা একটু সুখ-দুঃখের কথা বলা। যদিও এই শহরের কানায় থেকে মানুষগুলো একটু কেমন ধারা হয়ে গেছে যেন। তবু এক কালের গ্রামের মানুষ। মন চায় একটু কথা বলে।

তা যিনি আছেন ও বাড়িতে, তাঁর সইল না। কী ইঁট-পাটকেল ছোঁড়া! বাবা রে! ছই ভেঙে, তিবড়ি ভেঙে, মানুষ ঘায়েল করে এক তছনছ কাণ্ড। একে অশরীরী, তায় বাক্যি নেই। ভাবখানা, পালা শীগগির আমার কোল ছেড়ে।

মাছমারারা দেখলে গতিক সুবিধের নয়। কে জানে কোন্ বামুন-বিধবা ব্রহ্মচারী আছেন ওই পোড়ো ভিটেয়। মেছো নৌকা দেখলে আর রক্ষে নেই। সেই থেকে এখানে আর কেউ নৌকা বাঁধে না।

এই এক জিনিস, সমুদ্র থেকে গঙ্গায়, গঙ্গা থেকে ইছামতীর কোলে, কূলে কূলে, কোড়নের মুখে সর্বত্র আছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে। বাগে পেলে ছাড়ান নেই। ঘাড় মটকে ছেড়ে দেবে। দিয়েছে অনেককে। কখনো সে জানান দিয়ে আসে, না দিয়েও আসে।

চোখের আড়ালে সে ঘোরে নানান বেশে। আসলে যাকে মারো, সে-ই ঘোরে তোমার পিছে পিছে।

পাশের নৌকা ডাক দিলে, ও পাঁচু।

পুরোখোঁড়গাছির অনন্ত ডাকছে। পাঁচু বললে, বলো।

নৌকার মুখ ঘোরানো পশ্চিম কোণে। ছলছলাত করে জল আছড়াচ্ছে নৌকার গায়ে। পলকে পলকে পার হচ্ছে চেনাশোনা জায়গাগুলি। কী তীব্র গতি এখন। কোম্পানির স্টীমার থাকলে,

পিছনে পড়ে যেত। খুব সাবধানে চলো। একবার ঘুরে গেলে এখন সামলানো দায় হবে। আওড় নেই, ঘূর্ণি নেই, কিন্তু বোঁ করে পাক খেয়ে যাবে নৌকা। গলুই সিঁধোতে পারে জলের মধ্যে লাঙলের ফালের মতো। জোয়ার আসছে কূলে কূলে। তোমার চোখে ঠাহর করতে পারছ না। কিন্তু এতক্ষণে কত উঁচুতে উঠে গেছ, একবার আন্দাজ করো। আষাঢ়ে তেমন বান আসে না সমুদ্রের। কিন্তু, তলে তলে, ফুলে ফেঁপে, গঙ্গা এখন ফুঁসছে নৌকার পিঠে। চাপো, চাপো হাল-বৈঠা। বিলাসের এখন কোনো কর্ম নেই, বসে থাকা ছাড়া। সামনে মায়ের বাড়ি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি। রেলপুল মাথার পরে। কেমন এক ছমছমানি ছায়া পড়েছে পুলের তলায়। যেন কোন এক দৈত্যের ঠ্যাঙের তলা দিয়ে পার হতে হবে এবার।

ওই শোনো। জলের শব্দ ওখানে যেন কেমন গমগম করছে। যেন, ওই ছায়ার মধ্যে গঙ্গা নেই। ডাকিনীরা ডাকছে বিশাল লোহার গায়ে তাল দিয়ে। জলের টানেও একটু ঘোরপ্যাঁচ। ডুবিয়ে মারতে পারবে না, টানবে একটু এদিক ওদিক। হাল তোমার হাতে। শক্ত থাকলে এক চুলও এদিক ওদিক হবে না। তা ছাড়া, মায়ের তলা দিয়ে যাচ্ছ। নাম নাও একবার, হ্যাঁ।

চাঁদে মেঘে লড়াই হচ্ছে। দম আটকে মরছে সোনার চাঁদ। ওই এক পলক, চুক করে একবারটি দেখা দিল মেঘের কোলে, কৃষ্ণপক্ষের ছ দিনের চাঁদ। ওই যে শ্মশান, দক্ষিণেশ্বরের গাছগাছালি কেমন মাথা নাড়ছে এদিক ওদিক করে। যেন রাত্রিবেলার অবসরে রাতের জীবেরা সব খেলায় মেতেছে।

তুমি চলে যাও মাছমারা। তোমাকে এরা কেউ কিছু বলবে না। যার বলার, সে ঠিক টের পাইয়ে দেবে। টনক তোমার আগেই নড়বে। নইলে, মানুষের শরীরে টনক পদার্থটি আছে কেন?

তবে সামলে। বেশী পুবে ঘেঁষো না এখন। একটা আওড় আছে। ধরে রাখতে পারে তোমাকে সাঁড়াশির মতো।

হ্যাঁ, কী বলছিলে গো অনন্ত।

ত্বজনেই হালে বসে আছে। কথা শুরু করে, হঠাৎ থেমে এক দণ্ড পরে তার জবাব দিতে হয়। ত্বজনকেই আবার এদিকে সামলাতে হবে তো। অনন্ত বলল, বলছিলুম মহাজনের কথা। তিন সন ধরে টোটা গেল, ওদিকে মহাজনের ছাড়বার নাম নেই। পালমশাইকে বললুম, স্থদটা গেল সনের ছেড়ে দেও। তা রেগে বললে, 'ও-সব বোলো না অনন্ত। তাহলে আমি লৌকোও ছাড়তে পারব না। মকুব কোথায় হয়? না, যেখানে ঠিক ঠিক নেয়া-দেয়া চলে। তোমরা নেবে, দেয়ার বেলায় পুরো শোধ দেবে না। এখানে মকুব-টকুব হবে না।'

সকলের প্রাণেই এক কথা। পাঁচুর বুকের মধ্যে একই ভয় শিউরে শিউরে উঠছে বার বার। কী বলবে। বলল, সব মহাজনেরই এক কথা হয়েছে আজকাল। বলে, তোমরা মাছ মারতে পার না, সে কি আমার দোষ। পেটে খেতে না পেলে এসে লৌকো বাঁধা রেখে টাকা ন্যে যাবে। আবার আষাঢ় মাস পড়তে না পড়তে বিনা উশুলে লৌকো ন্যে যাবে। আমাদেরো দিতে হয়, নইলে উশুল হবে কী করে? তাও তোমরা না পারলে আমরা কী করব।

অনন্ত বলল, হ্যাঁ, অবিশ্যি মহাজনের পিতি বছরেই কিছু শোধ হয়। একেবারে মাঙনা তো আর ছেড়ে দিচ্ছে না গো। গেল সনে ত্ব শ ট্যাকা দিইচি মহাজনকে। দিলে কী হবে, বাকি রয়েছে তার দেড়া। এবারে তোমার বাঁধাছাঁদি জালখানিও দিয়ে দিয়েছিলুম মহাজনকে। বললে মহাজন, বুড়ো হয়েছ অনন্ত, জালখানি রেখে দেও আমার কাছে। যদি বর্ষায় গঙ্গায় না যেতে পার, মরে-ধরে যাও, তবে লৌকোয় আর জালে আমার কিছু শোধ হয়ে যাবে।

অমান কথা মহাজনের। বড় ভালো মানুষ, তা [illegible] খেতে জানে না। একখানি তিরিশ-হাত বাছাড়ি নৌকার দামই তো কম করে সাত-শ টাকা হবে। বাঁধাছাঁদি জালও কিছু না হোক শ দেড়েক দুয়েক টাকা। তিন-শ টাকার দায়ে প্রায় হাজার টাকার ঘা মারবে তুমি। কথার বেলায় বলছ, 'কিছু শোধ হয়ে যাবে।'

মর্মে মর্মে জানে পাঁচু, হাড়ে হাড়ে পাক দিয়ে রয়েছে মহাজনের ঋণ। তার নিজের ঘরের পাটাজালখানি রয়েছে মহাজনের কাছে। নিবারণ সাইদারের জাল। পাটাজাল সমুদ্রে মাছ ধরার জাল। বাঁধা দিয়ে মনে করেছিল, বিলাসের সমুদ্রে যাওয়ার পথ মারা গেল। কিছু টাকার দায়ও মিটল। কিন্তু সমুদ্রে যাওয়া আটকানো গেল না। পরের নৌকায় কাজ নিয়ে চলে গেল বিলাস সমুদ্রে। আর বছরখানেক সময় দেবে মহাজন। তারপর বিক্রি করে দেবে জালখানি।

নিবারণের রয়েছে পান্‌সা জাল। জলে ধুয়ে, পাতলা গাবের জল ছিটিয়ে এখনো প্রতি বছর শুকিয়ে জালখানি তুলে রাখে বৌঠান, বিলাসের মা। অত বড় জাল, উঠোনে ধরে না। তিন বাঁশ দিঘলে টাঙিয়ে, মেলে দেয় জাল। দিতে দিতে চোখ ফেটে জল আসে বৌঠানের। সমুদ্রের গন্ধ আছে ওতে। নিবারণ মালোর গায়ের গন্ধ। আর তো কোনোদিন সেই হাতে এ জাল ধরা হবে না। বৌঠান বলে আপন মনে ফিসফিস করে, একদিন কী করে ছিঁড়ে ফেলনু পাটা জালের কোনা। কত বকঝকা করলে আমাকে। মুখে মুখে জবাব দিনু, মেরে আমাকে একসা করলে। আজ যদি ছিঁড়ি...?

পাঁচু হালে চাপ দিয়ে একটি দমকা নিশ্বাস ফেললে। পান্‌সা জাল নিয়ে আবার কে কবে সমুদ্রে যাবে, সে কথা পরের ভাবনা। ও যে মাছমারার ঘরের সম্পত্তি। তা এ বছরে গঙ্গা কথা না বললে সেটিও যাবে।

বলল অনন্তকে, জান হে, জানি। আমার নৌকাখান তো পাঁচ বছরেই বাঁধা পড়েছে, ছাড়িয়েও আনছি পিতি বছর। তবে ওই, সুদের ট্যাকাটা জমে যাচ্ছে।' মহাজনের হল আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশী, আর সুদ হল দেনাদারের যম। আসল ছাইড়ে যেতে চায় কিনা। এবারে আমাকেও বড় কড়কে দিয়েছে মহাজন। বললে, পাঁচু, কিছু না পার, এবারে আমার তিনবছরের সুদসমেত, এই সনের খোরাকি আর সুদটাও শুধতে হবে। নইলে কিস্তন চলবে না। বন্নু, তা কী করে হবে মশায়? মা-গঙ্গার মর্জির ওপরে তো সব। বললে, তোমাদের খাজনা-ট্যাক্‌সো লাগে না গঙ্গায়, রানী রাসমণির জলে মাছ ধর। এবার পাঁজিতেও লিখেছেন, 'মৎস্য দশ'। এবারে ও কথা বললে হবে না। বোঝো এখন। খাজনা-ট্যাকসো লাগলে তো আর গঙ্গায় আসা-ই হত না। কবে পটল তুলতে হত এখানকার মাছমারাদের। তা বলে, পাঁজি যা লিখেছেন, তা যদি না ফলে, তবে?

বিলাস বলে উঠল গলুই থেকে, তবে মহাজনকে বলো, সে একখান পাঁজি নিয়ে এসে একবার নড়ুই করে যাক গঙ্গার সঙ্গে।

বোঝো এখন। সেই তো পাঁচুর ভাবনা, চোখ বুজলে বিলাস যদি মহাজনের সঙ্গে ওই ওজনের কথা বলে, তার গতি কী হবে। তবে, কথায় ওই রকম, কাজ কিন্তু অমনটি নয়। বললে, হ্যাঁ, খত নিখে য্যাতো খুশি চোপা কর, মহাজনের কলাটা। তুই চুপ যা।

—কেন?

—কেন? কেন আবার কী রে মাকড়া।

—বলছি, মহাজনের কলাটা কেন? কলাটা যে দেখাবে, কলাটা আসে কম্‌নে থেকে। মাছের টাকায় তো?

—তা কী হল?

—তবে মাছের নামে এট্টা খত লিখে গাঙে ভাসসে দিলেই হয়। শালার য্যাতো মাছ গাঙে আছে, একেব্বারে মহাজনের পায়ে এইসে ঝাপ্পে পড়বে'খনি।

ওই শোনো কথা। পায়ে পা দিয়েই আছে। এই ছেলে নিয়ে সংসার করতে হয় পাঁচুকে।

খেঁকিয়ে উঠল পাঁচু, গাড়ল কমনেকার! সে মহাজন, ঋণ দ্যে শোধ নেবে, এইটে তার আইন।

—আরে আমার আইন রে! আমার লৌকো জাল রেখে দেবে, তবে আর কী। তার চে ঋণ নেব না। আমাকে ঋণ দ্যে তো মহাজনে খায়। আমি যদি ঋণ না ন্যে না খেয়ে মরি, মহাজনে বাঁচে কমনে? ঋণের জোরেই তো?

পাঁচুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল নানান কথার ভিড়ে। আশেপাশে যারা শুনল, তারাও চুপচাপ। যেন কারুর মুখে কোনো কথা যোগাল না হঠাৎ।

তারপর, একটা দুর্বোধ্য রাগে পাঁচু চীৎকার করে উঠল, থামবি? তুই চুপ যাবি, অ্যাঁ? যাবি, কি না, অ্যাঁ? বড় আমার আইনদার এইয়েছেন, সোমসারে জন্মেছেন এইসে বড় এক মাছমারা রে।

চুপ করল বিলাস। পাঁচু, পাশের নৌকার অনন্তও চুপচাপ। শুধু নৌকার তলায় ফুলে-ওঠা জলের শব্দ। চলকা ভাঙার ছলছলানি। চলকা হল নৌকোয়-ছিটকে-ওঠা জল।

অনন্ত বললে আগের কথার খেই টেনে, যদি পাঁজির বাক্য না ফলে, তবে মাথা গোঁজবার ঠাঁইখানি আছে, সেটি চাইবে।

পাঁচু বলল, গতিক তো সেইরকমই দেখছি এখন। তা এ বোশেখ চোত জষ্টি, বাওড়ে বিলে নদীতে যত মাছ ধরনু, তার পেরায় অদ্ধেকখানি তো রোজই মহাজনের কাছে গেল, ও-সবের তো লেখা-

জোখা নেই। তারপর, বিল-বাওড়ের ইজারা যানাদের কাছে, তাদেরটাও মিটুতে হয়। যাবে কোথায়।

হঠাৎ মনে হয়, নৌকো যেন চলছে না। বুকের মধ্যে দুর্ভাবনার কাঁটা এমন অসাড় করে দিল! মনে হল, জল যাচ্ছে না, নৌকাখানিও বুঝি চলে না। সহসা যেন সব থম মেরে গেছে।

কিন্তু তা নয়। চলেছে, বড় জোর চলেছে। সে থেমে নেই। এদিক ওদিক কোরো না, শরীরের রক্ত দিয়ে হালের আন্দাজ ঠিক রাখো। পেশী তোমার টনক। সে জানান দেবে। কামারহাটির কোল গেছে। পুবের জমি হুড়মুড় করে ছুটে এসেছে গঙ্গায়। ওই দূরে পশ্চিমে, গঙ্গা মস্তবড় বাঁক নিয়েছে। মনে হয়, সামনে আর জল নেই। পার দাঁড়িয়ে গেছে। তা নয়, বাঁকের সীমানায় গঙ্গা হারিয়ে গেছে উত্তরে। চওড়া হয়ে উঠেছে। পশ্চিমে একটু কোণ মারো, নইলে উলটো আওড়ে পড়ে যাবে। জোয়ার টানছে উত্তরে। পার ঘেঁষে গেলে, আবার দক্ষিণে টান ধরে যাবে। ওটা জোয়ারের লীলা। কিছুটি থেমে নেই এ সংসারে। সব চলছে ফিরছে দিবানিশি। ওই তোমার শেষ থামাটা এমনি করে নাড়া দিয়ে যায় মাঝে মাঝে। তখন তোমার ঠিক ঠিক জল চলবে না, নৌকা থম খেয়ে যাবে।

পাঁচু বলল, মাছমারার ঘরে আর শান্তি নেই।

অনন্তর নৌকা একটু সরে গেছে। শুনতে পেল না। বললে, অ্যাঁ?

পাঁচু বলল, না, বলছি বলে, আর শান্তি নেই।

অনন্ত বলল, নাঃ। গত সনে সমুদ্রে গেনু, তাও কিছু হল না। তিন ব্যাটাকে নিয়ে গেছলুম। চারজনের খোরাকিতেই কাত হয়ে গেনু।

হ্যাঁ, সমুদ্রও তোমায় এমনি করে। মজি তো। পাঁচু বলল, খোরাকি কেমন দিলে এবার মহাজনে?

অনন্ত বলল, ওই দিয়েছে, তুমন চাল। তিনটি মনিষ্যি এয়েছি। তা ধর, এক মাস পুরলে হয় ওই চালে। দাম ধরেছে ষোলো ট্যাকা মন।

ষোলো টাকা মন! পাঁচুর চমকাবার উপায় নেই। বলল, হ্যাঁ, আউশের মোটা লাল চাল দিয়েছে। তোমার নিয়েছে ষোলো, আমার নিয়েছে পনেরো। বাজারে দাম হল বারোর মধ্যে।

অনন্ত বলল, বোঝো তবে। এর ওপরের সুদটা ধরো। তা পরেও আছে, পাঁচপো সরষের তেল, আড়াই সের মুসুরী আর পাঁচপো কলাই। তা ওই মাস ঘনাঘন হবে। ওতেও মহাজনে লাভ রেখেছে, আবার সুদ। বনু, পা্লমশাই, আর আধমনটাক চাল ছে দেও। মাছের মন, না পেলে আবার গঙ্গায় পড়ে শুকোব। ঠোঁট উলটে বললে, শুকোবে কেন, তোমাদের চেনাশোনা জায়গায় যাচ্ছ, ওখেনকার ফড়েরা টাকা ধার দেবে। চাল-ডালও দেবে, সে আমি জানি। তা সে যা খুশি তাই করো গে, আমার কী! তবে বাপু, একটা কথা বলি, থাক গে মা গঙ্গার বুকে, তবু তোমাদের অত পেটের জ্বালা হয় কেন বল দি-নি?

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, মহাজনের কথা তো। তাই বলি, গঙ্গা, শুনে রাখ গো মা, তোর ছেলেকে কী শুনতে হয়।

বিলাস বলে উঠল, বললে না কেন মহাজনকে, তুমো চলো, গঙ্গার পুণ্যির বাতাস খেলে পেট জ্বলে কি না-জ্বলে, এটু ঠাওর করে আসবে।

হ্যাঁ, ওইটা বাকি আছে। মাকড়া কমনেকার। মনে মনে বলল পাঁচু। কিন্তু কনকন করতে লাগল বুকের মধ্যে। এ পেটের লজ্জা নেই, বেহায়া জিভ। জাল ফেলে, তুই গড়ান দিলে, পেট দানা চায়। জালে কিছু পড়ুক বা না-পড়ুক দানা চায় পেট। নুন না ফেলে তখন মুখের ভাত নোনা লাগে চোখের জলে। হাত ওঠে না, পেটের জ্বালায় ওঠে।

মহাজন তো মিথ্যে বলে নি। ঋণ তো এখানেও হয়। চন্দন-নগরের ফড়েনী, বুড়ি দামিনীর মুখখানি বার বার ভেসে উঠল পাঁচুর চোখের সামনে। ঘরে বাইরে ঋণ। দামিনীর কাছে এখনো পঞ্চাশ টাকা ধারে পাঁচু। দাদা নিবারণও ঋণ করত দামিনীর কাছে। দামিনীর মায়ের কাছে ঋণ খেয়েছে পাঁচুর বাপ। সবটাই বংশপরম্পরায় চলেছে।

কিন্তু উপায়ই বা কী না নিয়ে। গঙ্গা নির্দয়, এদিকে ডাল-চাল সবই শেষ। হয় ফিরে আসতে হয়, নয়তো দুদিন দেখতে হয়। দেখতে হয় কি, হবেই। গঙ্গা তোমাকে একেবারে না ছাড়লে তুমি ফিরছ কী করে। এক কোটাল যাবে, আর-এক-কোটাল আসবে। গঙ্গার কোটাল শেষ করে ফিরতে হবে মাছমারাকে।

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, মহাজনে সব বোঝে, বুঝে ঘাই মারে কিনা! আমাকে চাল দিয়েছে একমন। নগদ এনেছি দশটা ট্যাকা। নইলে চলে না। ধরো যদি, ফেরবার দরকার হয় বাড়িতে, তবে মরতে মরতেও রেলগাড়িতে করে পৌঁছুনো যাবে।

অনন্ত বলল, আমার সে গুড়েও বালি। ব্যাটার বউয়ের রুপোর বালা চুড়ি বাঁধা থুয়ে, কিছু নগদ এনেছি সঙ্গে।

হ্যাঁ, ওতে প্রাণ পোড়ে বৈকি। অনন্তর ব্যাটার বউ আছে। বিলাসের বউয়ের হাত থেকে যদি নিতে হয় এমনি! অনন্তর কথা শুনে প্রাণে লাগছে। হাতে করে নিতে আরো কতখানি লাগত।

তবু আসতে হবে, আসছে। অম্বুবাচী গেছে। ওদিকে টনক নড়ে গেছে মাছমারাদের। ইছামতীতে কি তা বলে থাকবে না কেউ। তাও থাকবে। ইছামতীতে থাকবে, আরও নীচে, ডানসা, বিদ্যেধরী, পিয়ালী, ঠাকরুনের কিছুটা পর্যন্ত থাকবে অনেকে। গঙ্গায় আসবে

তার অনেক গুণ বেশী। আসবে অনেক দূর তল্লাট থেকে। সংসারের যাবৎ জল, সবই ভগবতীর জল। গঙ্গার জল সাক্ষাৎ ভগবতীর। এত বিস্তার তুমি কোথায় পাবে।' ভগবতীর জলে মাছ মারবে, তুমি মাছমারা, তার খাজনা নেবে মানুষে। বিল বল, বাওড় বল, তুমি নিজের হাতে গড় নি। কিন্তু তার প্রাণী থেকে ঘাস কচুরিপানা, সবকিছুর খবরদারি করবে তুমি। গাঙ-বিল-বাওড়ে যে প্রাণ দেবে আর নেবে, তার ওপরে তোমার আইন খাটাতে চাও মানুষ হয়ে। খাজনা ধর, ট্যাক্‌সো ধর। মাছ তুমি ছাড় নি। কিন্তু ভাত না দিয়ে তুমি কিল মারার গোঁসাই। কিসে তোমার হক? না, তুমি জমা নিয়েছ, দেশের তুমি রাজা হয়েছ।

যে দৌলত তুমি দাও নি, আমার বাপ-পিতামোর কৌশল খাটিয়ে যাকে পাই, তার ওপরে তোমার খবরদারি! নির্যাতন করবে তুমি। কেন? না, আমি মাছ মারি। তোমার শক্তি আরো বড়, তুমি আমাকে মার। জানিনে কার হয়ে মার। আমাকে যে মারে দিবানিশি। সেই মীনচক্ষু দেখি নে তোমার চোখে।

আমার মাথার পরে আছে অনেকে। মহাজন, আড়তদার, ফড়ে-পাইকের। কিন্তু গঙ্গার এই তল্লাটে খাজনা নেই। একে বলে ভগবতীর মিঠে জলে সুদিনের বান ডেকেছে।

দুই নৌকো পাল গুটোচ্ছে, মাস্তুল নামাচ্ছে। ওই যে দেখা যায়, পুবে মন্দির। মেঘলা ভাঙা জোছনায় দেখা যায়, সাদা মন্দির। খড়দহ এল! শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ না রাসমঞ্চ। এখানে আস্তানা নিচ্ছে দুই নৌকা।

পাঁচু বলল, কারা রইল?

জবাব দিল কেদমে পাঁচু, দণ্ডিরহাট আর শাঁখচুড়োর দুই নৌকা। সনাতন আর সকল মিঞা।

পুবের কয়েকঘর মাছমারা যাবজ্জীবনের বাস নিয়েছে এখানেও গঙ্গার ধারে ধারে, আরো কত জায়গায় নিয়েছে। বাবুদের ধরে-করে, পেয়েছে একটু জমির বন্দোবস্ত। ভগবতীর কোলে পেয়ে গেছে ঠাঁই। যে পেয়েছে, পেয়েছে। যে পায় নি তাকে আসতে হবে সাত গাঙ ঠেলে।

মাছ মেরে তাকে পচালে চলবে না। বেচতে হবে। হাট-বাজার দেখতে হবে। এখানে হাট-বাজার ভালো। মাছ নিয়ে ঘুরতে হবে না দোরে দোরে। ঘোরাঘুরি যেখানে, সেখানে দাম ওঠে না মেহনতের। সবাই দয়া করে। দয়া নিয়ে তুমি কাপড়ের খুটে চোখের কোল শুকোতে পার। তার বেশী কিছু নয়।

তাই তোমাকে আসতে হবে। এই শ্যামরায়ের পায়ের তলে থাক, বারাকপুরের পুলিশ মিলিটারী আস্তানায় থাক, নবাবগঞ্জ, শ্যামনগর, জগদ্দল কিংবা আরো দূরে হালিশহর ছাড়িয়ে ত্রিবেণীর তল্লাটে যাও, তোমাকে আসতে হবে।

তা ছাড়া, এখনও তোমাকে দখনে বাওড় তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। পোষ-পোড়া, চোত-টোটা গেছে তোমার উপর উপর দিয়ে। সে গঙ্গায় থাকলেও তুর্দিন তোমার সঙ্গ ছাড়বে না সব সময়।

মোহনায়ও টেঁকা যাবে না। দক্ষিণে বাতাস নিপাত করবে। ওদিকে, সেই পাট-পচানির কাল থেকে, তুর্দিন শুরু হয়েছে। পাট পচতে আরম্ভ করেছে, মাছ পালিয়েছে। যারা পালাতে পারে নি, তাদের মড়ক হয়েছে পাট পচায়।

চৈত্র মাসে সবখানে তুর্দিন। তুর্ভোগের মধ্যে গাজনের সন্ন্যাস নিয়ে কাল কাটে একরকম। অসময়ে তোমার বিবেক বিবেকছাড়া হয়। ঘরে বাইরে মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা কর। নেশা-ভাঙ কর।

ওদিকে সমুদ্র ধাক্কা দিচ্ছে চৈত-হ্যাকায়, কলিযুগের মালোরা

তিষ্ঠোতে পারে না সেখানে। এদিকে জল শূন্য, যেন পোকাটিও নেই। তখন কী হয়?

না, গুণ-ছপটি নিয়ে এসে দাঁড়ায় গাঁয়ে গুণীন ওঝা। কী হয়েছে? না, পেতনীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। গাঁয়ের মুখে দাঁড়িয়ে গুণীন। লিকলিকে গুণ-ছপটি হিলহিল করে। দুচোখ ভরে আগুন নিয়ে, মুখের ভাঁজে ভাঁজে ক্রোধ নিয়ে তাকায় একবার ঝোড়নের দিকে, বিল-বাওড়ের ন্যাড়াচণ্ডী, কাক-চিলের খপিস চোখ মেলা, বিষ্ঠা-ছড়ানো গাছগুলির দিকে। তারপর বলে, হুঁ! কাকে ভর করেছে?

ভর করে মেয়েমানুষকে বেশী। যে মাছমারার নৌকা নেই তার ঘরনীর উপর পেতনীর নজর বেশী। সে-ই দেখবে স্বচক্ষে, জলের ধারে বসে বসে কে কাঁদছে খোনা গলায়।

গতরে মাংস নেই, হাড়ে কালি পড়েছে। রুক্ষু শুকু শনবুড়ি চুল, ছেঁড়া কানি পরনে। খোনা গলায় কাঁদছে ইনিয়ে-বিনিয়ে।

যাকে ভর করে, ঠিক তার মতো। চুনুরীর বউয়ের মতো, নিকিরীর বেটীর মতো, ঘরনীর মতো মালোর। দেখে ভয় হয়। অচৈতন্য হয় থেকে থেকে। আর কাঁদে ঠিক পেতনীর মতো। কোনো তফাত নেই।

তুমি পুরুষ। তোমার প্রাণে লাগবে সবচেয়ে বেশী। তোমার অভাব মেটাতে গিয়ে, বউ-বেটী পড়েছে পেতনীর খপ্পরে। তোমার ক্ষমতা নেই, তাই। সেই সময়ে মাথা গরম করলে চলবে না। বিবাগী হয়ে পালালে চলবে না।. ওই সময়ে মাছমারা সবাই বিবাগী হয়ে, ঘর ছাড়তে চায়। যাবে কোথায়? শহরের রাস্তায় গিয়ে, হাত পেতে বেড়াবে, বাবু এট্টা পয়সা দিন গো অভাগারে।

ভিখিরী সবাই হতে পারে। বুকে হাত দিয়ে বলো মাছমারা, চৈত্র মাসে সন্ন্যাস নিয়ে যখন দাঁড়াও গৃহস্থের দরজায়, 'ও বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগে, বাবা, মহাদেবো, জয় শিবো...' তখন কি একবার

মনটা তোমার সিঁটোয় না। মনে গায় না, তুমিও ভিখিরি হয়েছ? একবার বলো না কি মনে মনে, হে মা ধরিত্রী, তোর চোত-টোটার মার বড় জবর গো।

লোকে বলে, শিয়রে সংক্রান্তি। কেন বলে? ওটা যাওয়া-আসার মাঝখানের সময়। একটা মাস শেষ হয়, আর-একটি মাস আসে। এর চেয়ে বড় হল, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ। লয়-সৃষ্টির সন্ধিক্ষণ। ওই সময়ে পবিত্র থাকতে হবে। মন শান্ত রাখতে হবে।

সংসারে দুঃখের ভাগ বেশী। সুখ কম। দুঃখ আসবে। তাতে দিশেহারা হলে, দুঃখ তোমার বাড়বে বেশী। চেয়ে দেখো, সেইজন্য সংসারে অনাচার বেশী। বেশী মনের পাগলামি।

প্রাণে তোমার লাগবে, কিন্তু এই অসময়টা সাবধানে পার হও। এই এক-একটি টোটা তোমার এক-একটি সংক্রান্তি।

গুণীন-ওঝা এসে হুঙ্কার ছাড়ে বাড়ির উঠোনে। শুনে কাঁপ ধরে যায় সকলের বুকে। গোবর নিকিয়ে জায়গা করো। লাল ফুল আনো। ধূপ-দীপ জ্বালো।

তারপর যাকে ভর করেছে, তাকে আনা হয় গুণীনের কাছে। ঠিক পেতনী। সেই মাছখাউনী, পেটের জ্বালায় ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে যে পেতনী, ঠিক তার মতো দেখতে, তার মতো হাবভাব। বুড়ীর চেয়ে ছুঁড়ীর ভর বেশী।

তখন তো সে আর মানুষ নয়। শনমুড়ি-চুল এলানো। গায়ে গতরে কাপড়ের ঠিক নেই। খবরদার পুরুষ, কামিনী জ্ঞানে দেখিস নে ওই মেয়েমানুষের অঙ্গের দিকে। মাতৃজ্ঞানেও নয়। ও এখন অন্য জগতের জীব, যে জগতে ছায়া নেই।

কী শক্তি মেয়েমানুষের। ধরে রাখতে পারে না পাঁচজনে। খালি বলে, যাঁবঁ নাঁ যাঁবঁ নাঁ যাঁবঁ নাঁ!...

তা বটে, গুণানের রক্তচোখ ঘুরছে চরকির মতো। হাতের ঝাঁটা করছে ফটাস ফটাস। আসন করে বসে, ছোঁড়ে গুণ-সরষে। ও হল সরষে বাণ। তারপরে ধুলো-বাণ। না হলে, খ্যাংরা-বাণ।

তুমি দেখছ সরষে-ধুলো-খ্যাংরা। আসলে ওটা জ্বলন্ত আগুন। নইলে যাকে মারে, সে কেন চিৎকার করে পরিত্রাহি। কেন মাথা কুটে, দাপিয়ে দাপিয়ে পড়ে আর বলে, অ গ আর মেরো না, আর মেরো না, আর মেরো না গ।

তখন জিজ্ঞেস করে গুণীন, তোর নাম কী? জাত কী? আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

—আমার নাম মাছখাগী, জাতে পেতনী, বাস নরকে।

—কোথায় ধরলি একে?

যার উপরে ভর হয়েছে, তার মুখ দিয়েই খোনাস্বরে শোনা যায়, কেন, ফোড়নের জল গেছে যে পুবের মাঠের নয়ানজুলির মুখে, সেখেনেই আমার পিটুলিগাছের গোড়ায় ধরনু।

—কেন ধরলি?

—ধরবঁ না! মাথার সিঁথেয় বাসি সিঁদুর, পেটে দু'দিন ভাত নেই। এয়োস্ত্রী মানুষ, রুক্ষু চুল, কানি পরনে, লাজ নেই, লজ্জা নেই, আঁচলে গিঠ নেই, পায়ের আঙুলে আংটা নেই, হাতের নোয়ায় মেছো জল লেগে রয়েছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান নেই, আমার ওপর দে ছলক ছলক করে গেল হাঁটুজল ভেঙে। ফোড়ন আর নয়ানজুলির হাঁটুভরা কাদায় হাত দিয়ে মাছ ধরবে পাঁকাল, সিঙ্গি, মাগুর, শোল, ল্যাঠা, চ্যাং—আহা লো আমার মাছ-খাউনী। একদিন ডাইনে যায়। দুদিন ডাইনে যায়। বাঁয়ের দিন কি আর এমনি ছাড়ে।

হ্যাঁ, এমনি করে কথা বার করে ওঝা। কথাগুলো শুনেছ? বোঝো তা হলে, কেন ধরেছে তোমার ঘরনীকে।

আবার বলে খোনা গলায়, অত যদি পেটের জ্বালা ভাতার লৌকো করুক, মহাজনের কাছে বাঁধা খালাস করুক, জাল করুক, ভগবতীর মিঠে জলে গ্যে মাছ ধরুক, আমার কী!

ওঝা হাসে ঠোঁঠ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে। চোখ আধবোজা করে মাথা নাড়ে দুলে দুলে। বলে, তা তুই দে না কেন, লৌকো দে, বাঁধা খালাস করে দে।

—জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরে, শাঁকচুন্নী হয়েছি। আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব।

—কেন, তুই লক্ষ্মী হ।

—না না না। বড় সব ঠাউর এইয়েছেন, বড় সব নক্কীমন্ত ভাতারের ঘর। আবাগের ব্যাটাদের হা-ভাতে ঘরে আবার নক্কী। থু-থু-থু।...

মাছমারা, তোমার মনে হয় তোমার ঘরের উপবাসী বউ যেন তোমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। যেন ঝগড়া করছে তোমারই সঙ্গে।

ওঝা বলে, তা তো বুঝলুম, এখন যাবি না থাকবি?

—যাব কেন? যাব না। মড় মড় করে ঘাড় ভাঙব, মস্‌টে মস্‌টে খাব, শুষে শুষে খাব।

অমনি বলে, কিন্তু অভাগীর চোখ ভাসে জলে। তুমি বোঝ একবার মনে মনে, তোমার বউ-বেটী কেন পেতনীর হাতে পড়েছে।

গুণীন বলে, হুঁ। বলে ভালো ভালো কথা, তোবামোদ করে, খোশামোদ করে। তোর পিটুলীর গোড়ায় দেব ছাঁকা তেলে মাছভাজা ভাত, দেব টোপর করে সাজ্জে, প্রাচিত্তির করব। এখন বিদেয় হ।

অমনি খেপে উঠবে মেয়েমানুষ। সে খ্যাপে, যে ভর করে আছে। চোখে গড়ায় নোনাজল। ঠোঁটের কষে গড়ায় যে জল,

সেটুকুন তো মিঠে। তখন তার লজ্জা নেই। বে-আবরু বুক থাপড়ায় চটাস চটাস, খামচায় শুকনো পেট। চেঁচিয়ে বলে, মিছে কথা, মিছে কথা তোদের। নিজেরা পাস নে খেতে, তোরা আমাকে খাওয়াবি। আমি যাব না যাব না যাব না—

ঠিক খিদেয় পাগল হলে, যেমন বলে মানুষ। শুনতে শুনতে তোমার কত কী মনে পড়বে। কত কী! তুমি পুরুষ, বুকে তোমার কেটে কেটে বসবে, মিছে কথা, মিছে কথা, মিছে কথা।

তখন মুখ খারাপ করে ওঝা। সে-সব বাছা বাছা গালিগালাজ শোনা যায় কালে ভদ্রে। ভালো মানুষের আত্মা হলে পালায় সেই গালাগালির তোড়েই। তবে, এর নাম মেছো পেতনী, সে সহজে যায় না।

তখন, গুণ-ছপটি পড়ে সপাং সপাং। কালশিরা পড়ে, রক্ত ফুটে ওঠে বুকে মুখে পাছায়।

বউ-বেটীর গায়ে নয়, ছপটি তোমার গায়ে পড়ছে। কিন্তু, শক্ত করে রাখো নিজেকে। অসবুর হোয়ো না, দিশেহারা হোয়ো না। তোমার কত আদরের বউ, কত সোহাগের শরীর। দাঁতে দাঁত মেরে থাকো। যে রোগের যে ওষুধ। তারপরে, বুকে করে তোমাকেই তেল মাখিয়ে দিতে হবে বউয়ের সর্বাঙ্গে।

যত মার, তত চেঁচানি, যাব না, যাব না। মাছ নেই মাছ নেই মাছ নেই। জল নেই, জাল নেই, নৌকো নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই, পান নেই। যাব না যাব না যাব না।

মার মার মার। সারা গায়ে পিঠে ছপটি। সারাদিন চলে যায়, সারারাত্রি চলে যায়।

তারপর সে যায়। যেতে হয়। তখন ভয় যায়, বিভীষিকা যায়। শুধু ফুলে ফুলে উঠতে থাকে কান্না।

তোমার ঘরনাকে ধরে একজন। তোমাকে ধরে আর-একজন।

তখন তোমার ধর্মজ্ঞান নষ্ট হয়। গাজনের সন্ন্যাসীর গেরুয়া রঙের মধ্যে তুমি পালাও। ভিক্ষে কর। নইলে তাড়ি খাও। ঋণ করে নেশা-ভাং কর।

বিলাসের দোষ দেখ তুমি। কিন্তু তোমারো মন তখন ছোঁক-ছোঁক করে। এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঢলানীদের হাসি-মশকরা বড় ভালো লাগে তখন।

মন বলে, এত দুঃখ-ধান্দা করি, ঘরে একটু সুখ পাই নে। কেন না, ঘরের বউয়ের মুখে হাসি নেই, বাঁচি কেমন করে?

হুঁ, আসলে মরণ তোমার পায়ে পায়ে ঘোরে তখন। মরণকেই বাঁচার চোখে দেখ। সু যায়, লোভ দেখায় কু। আসল সুখ যায়, মদের মতো নকল নেশায় থাক মজে। নকল সোহাগ নকল পীরিতের ঝাঁজ আসলের চেয়ে বেশী। অল্প জলের মতো। হালে পানি নেই, তাই লাফালাফি।

একে বলে অভাব আর অকাজের মার।

তখন পরের জমা-নেওয়া পুকুরে বাওড়ে বিলে চুরি করে জাল ফেলতে তোমার আটকায় না। পঞ্চায়েতের সামনে তোমাকে অপরাধ স্বীকার করতে হয়, দুঃখে তখন কাঁদতে হয়, জরিমানা দিতে হয়।

দুঃসময়ে কলঙ্ক ছায়া ফেলে। নিবারণের মতো মানুষ শেষ দিনকে সারাপুলের হাবরে যেত লুকিয়ে মাছ ধরতে।

বাঁশের চটা দিয়ে তৈরী হাবর। তাতে জিয়নো থাকে নোনার মাছ। ভাঙন, ভেটকি, নোনার যত মিঠে মাছ হাবরে পোষা হয়।

দাদা নিবারণের হাবভাব দেখলেই বুঝতে পারত পাঁচু, মানুষটাকে হাবরের সর্বনাশ ডাক দিয়েছে। আর বুঝত বৌঠান।

মানুষটা এই এত ঘোরাফেরা করছিল, কথাবার্তা বলছিল।

তারপর হঠাৎ একেবারে চুপ হয়ে গেছে। যেন বসে আছে সব ভাবনার অবসান করে।

—কী হল তোমার?

—কিছু না। এক ছিলিম তামাক দে দি-নি।

বৌঠান কলকেয় ফুঁ দেয় আর আড়চোখে দেখে। আপন মনেই বলে, হুঁ, মাথায় শনি ঢুকেছেন।

থেমে থেমে, একটু একটু করে বলে। বলে ভাবসাব দেখে। বলা তো যায় না, মেজাজ কেমন আছে। এমন মা-বাপ নেই মেজাজের। গাঁক করে উঠে, দু ঘা দিলেই হল। মেজাজ ঠিক থাকে বা কেমন করে। বৌঠানেরা মেয়েমানুষ। পেটের ছা না হলেও, ঘরের পুরুষের সব বুঝতে তার দেরি হয় না। সময়ে তার কাছে সোয়ামী ছেলে এক হয়ে যায়। তখন একই বেশে দাঁড়াতে হয় দুজনের কাছে।

জানে, মহাজনের মন গলে নি। সমুদ্রের কাল নয়, গঙ্গার কাল নয়, মহাজনের মন তাই পাথর হয়ে গেছে। এখন সে নিবারণ সাইদারকেও মানে না। মাছমারাদের খারাপ কথা বলে মহাজন। বলে, তোমার বাড়িতে যাব হে। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলব। বউয়ের শরীলে কাপড়চোপড় আছে তো। শুনেছি, মেয়েটি তোমার ডাগর হয়েছে।

জলে মাছ নেই। ঘরে মেয়েমানুষ আছে। মহাজন উশুল চায়। চায়, শতকরা দু-চারটে বাড়িতে মহাজন যাওয়া-আসা করে।

ইছামতীতে জোয়ার আসে, ভাটা যায়। রাইমঙ্গলে তুফান তুলে বাতাস আসে সমুদ্রের চাপা গর্জন নিয়ে। ইছামতীর কালো টলটলে জল নোনা। মাছমারার চোখের জলের মতো। পুবে, নোনা কালিন্দীও কেঁদে কেঁদে যায় সমুদ্রে।

গোটা জীবনের টোটার সংবাদ নিয়ে সবাই যায় অকূলে। গঙ্গা, ঠাকরুন, পিয়ালী, বিদ্যাধরী, ইছামতী, রাইমঙ্গল, কালিন্দী।

শুনে সমুদ্র ফোঁসে।

মাছমারার মেজাজের ঠিক থাকে না। কিন্তু মন মানে না ঘরের মেয়েমানুষের। মাছমারার বউ সে।

হুঁকোর ডগায় কলকে চাপিয়ে বলে বৌঠান, হুঁ, গতিক বড় জুতের মনে হচ্ছে না। মাথায় পোকা ঢুকেছে বুঝিন?

জবাবে শুধু খেলো হুঁকোর গুড়ুক গুড়ুক শোনা যায়। বড় খারাপ লক্ষণ। নাড়িনক্ষত্র চেনা তো। বৌঠানের গলা চড়ে। না, ও-সবে আমার দরকার নেই। ঘরে শুকে মরব, তবু পান গ্যে খেলা আমি চাই নে।

প্রাণ নিয়ে খেলা বটে। হাবরের মাছ চুরি করতে গিয়ে প্রাণে মরেছিল অভয় মালো। সাপে কাটে নি। ডুবে মরে নি। কোন্ অন্ধকার থেকে ছুটে এসে এফোঁড় ওফোঁড় করেছিল একখানি মস্ত ধারালো ট্যাটা।

শুধু তার হাতে ধরা ভেটকি মাছটার গোল চকচকে চোখে ছিল অপার রহস্য। অন্ধকারে মীন-চক্ষুর হাসিটুকু চোখে পড়ে নি অভয়ের। তার শমন হয়ে এসেছিল সে হাবরের জলে। ওজন ছিল তার বারো সের।

অভয় গিয়ে মরল টাকির পুলিসের ডাক্তারখানায়। বিচারে সাজা পায় নি কেউ। গেছে শুধু একটা মাছমারা।

মরার চেয়ে ধরা পড়ে বেশী। ধরা পড়লেও বেড়ন খাওয়া রুখতে পারে না কেউ।

নিবারণের এ গুম খাওয়া তো সহজ কথা নয়। চেনে যে। চুপচাপ মানুষটার হুঁকো টানার বহর দেখলে বোঝা যায়, বুকের রক্ত কেমন

চলকে চলকে উঠছে। হুঁকোর গুড়গুড়োনি যে আসলে ঘরের লোকের বুকে। বৌঠান বলে, কথা নেই কেন ছিমুখে, শুনি? আমি যে ফঁ্যাচফঁ্যাচ করে মরছি, জবাব নেই কেন?

বড় শান্ত গলা শোনা যায় নিবারণের, তবে ফঁ্যাচফঁ্যাচ করিস কেন? চুপ মেরেই থাক না।

—আর তুমি সন্‌জে হলে বের হইয়ে যাবে, না?

তাই যায়। একটু ঘোর ঘোর হয়ে এলেই আর পাত্তা নেই। চিতাবাঘের মতো জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এদিকে তো গুণ-জানা মানুষ। গাব আঠার মতো জমাট অন্ধকারেও চোখ জ্বলে দপদপ করে।

থির থাকতে পারে না পাঁচু। তক্কে তক্কে থেকে, না ডাকলেও যেতে হয় তাকে। প্রাণ ধরে সে এমন জায়গায় একলা ছেড়ে দেবে কেমন করে।

ধরা পড়ে নি কোনোকালে। কিন্তু তাতে দুঃখ না থাক, সুখ নেই একফোঁটা। দুভোশেই প্রাণ শুকিয়ে যায়।

সেই মাছ বিকোতে যায় গঞ্জে, হাটে। পয়সা পাওয়া যায় ভালো।

কিন্তু মনের ভালো যে থাকে না। চোলাই রস আর মেয়েমানুষ পাওয়া যায় কাছাকাছি। বারোমাসের বাসিন্দে আদিবাসীগুলির চরিত্রের আর আদি-অন্ত থাকে না। হাটবাজারের [illegible]রবারী-ব্যাপারীরা থাকতেও দেয় না। চাষের মরশুমটি গেল তো, পেটের ভাতও গেল। আরম্ভ হয় অকাজ কুকাজ।

ধান বল আর মাছ বল, তার চেয়ে অনেক কম দামে তখন মানুষ বিকোয়। শরম নেই। মদ খেয়ে পুরুষের সঙ্গে হুড়-যুদ্ধ করে পথের উপরেই। খিলখিল করে হাসে। হাসির দমকে তার কাপড় থাকে না গায়ে।

গোটা হাটের পুরুষের রক্তে আগুন জ্বলে।

জ্বলবেই। মেয়েমানুষ, অল্প বয়স, তার সর্বাঙ্গে যেন কাঠফাটা পিপাসার জল টলমল করে। তার উপরে, সে কারুর অধীন নয়। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে গণ্ডূষ গণ্ডূষ খায়।

নিবারণ মাতামাতি করে ফিরে আসে। পাঁচু আসে রক্তে জ্বালা নিয়ে। বড় তিরিক্ষি, রক্ত-ওঠা মেজাজ নিয়ে।

একজন সব দেখে। সে মীনচক্ষু।

শুধু বৌঠান কথা বলে না। ঘরনীকে ফাঁকি দেবে তুমি। তত সাধ্য নেই। সে তোমাকে চেনে। ক্ষমা চাও, হাত টানাটানি কর, পুরুষ হয়েও দুটি ঝটকা খেতে হবে ওই হাতের।

—কেন, লজ্জা করে না? হাটের মেয়েমানুষের মুখে মুখ দে পড়ে থাকো গে।

জায়ের আঁচ লাগে পাঁচুর বউয়েরও। তারও মেজাজ সপ্তমে উঠে থাকে। বলে, থাক, আর তোমার মুখসাপুটি করতে হবে না। পুরুষ জাতকে চিনতে বাকি নেই।

—আমি আবার কী করলাম। মুখসাপুটি করলাম কার!

—একই দাদার ভাই তো!

অমনি পাঁচুর মেজাজ খারাপ।—এই চুপ, মুখ সামাল দে। যারটা সে বলছে। তুই আমার দাদার ওপরে কথা বলিস না।

পাঁচু নিজেও বলে না। সে যোগ্যতা চাই। ওই মানুষই যখন মাছ মারতে যায়, তখন দশটা মেয়েমানুষ এসেও তার নজর ফেরাতে পারে না। মাছমারার জ্বালা তুমি কী বুঝবে।

নিজের আগুনে সে নিজে জ্বলে। লোকে দেখে আর বলে খালাস। সে পোড়ে নিজের ধিক্কারে।

তবু বৌঠানের প্রাণ শান্ত হয় না।—মরণ! ঘরে তোমার অত

বড় ব্যাটা, বোটর বে দিলেই হয়। সে মেয়ে আমার কালার গলা-ভর্তি জল। কখন কত ট্নি চলকে এদিক-ওদিক পড়ে, সে ভয়ে বাঁচি না, আমার যে কেউ নাই এ সোসারে।

বলে, আর জ্বলেপুড়ে কাঁদে।

—ও বিলির মা, শোন্।

—না।

—ক্ষ্যামা দে। এই মনটায় পাপ আসে গো, সব সময় বশে থাকে না।

ওই শোনো, ওইটি আসল কথা। এই তোমার অভাব আর অকাজের মার। জীবনের পাপকে তুমি দূর করতে চাও, সে তোমাকে ঠেসে ধরতে আসে। তুমি সব সময় এঁটে উঠতে পার না।

আবার এই মাছমারা-ই না ফিরে আসে মিলের শাড়ি নিয়ে, সিঁদুর-আলতা কিনে! স্যাকরার বাড়ি যায় বালা গড়াতে।

বৌঠান তা জানে। জানে, তার দুটি হাতে, যতখানি পারা যায়, রক্ষা করতে হবে মানুষটাকে। দুর্দিনে যেন সে দিশেহারা না হয়। যার এদিক আসতে ওদিক যায় ফসকে।

শেষবার সমুদ্রে যাওয়ার আগের বছর বিয়ে দিয়ে গেল মেয়ের। বাপ বলল, আমার জীবনের সাধ মেটালি রে নিবারণ, লাল জামায়ের মুখ দেখালি তুই আমাকে।

অমর্তর বউকে যেদিন ধরল বিলাস, সেদিন সে ফিরে আসছিল মহাজনের কাছ থেকে। পিরিতে যার বড় সাধ ছিল, সেই ছেলে পিরিতের মুখে কালি দিয়ে, কাঁটা নিয়ে ফিরল। মহাজনের কাছ থেকে ফেরবার সময় মন তার বশে ছিল না।

যে-সে কাঁটা নয়। বড় উথালি-পাথালি এখন বুক।

আরে মাছমারা, তোর লজ্জা নেই। সুদিনে তুই এক, দুর্দিনে তুই আর-এক মানুষ।

এমনি করে তোর ঘরনীকে ধরে একজন। তোকে ধরে আর-একজন।

তারপর আসে বৈশাখ মাস। নতুন জল নিয়ে আসে মুখে করে। সমুদ্রে যেতে পারবে না অবিশ্যি তখন। তখন ঝড়ের কাল। নতুন আশা নিয়ে আসে বৈশাখ। পাঁজি-পুঁথি বেরোয়। বান দেখো, জল দেখো, মাছ দেখো। তারপর চলো, যেখানে সুদিনের বান ডাকছে।

নৌকা যদি না থাকে, মহাজনের কাছে যাও। ভাড়া পাবে। মরশুমে নৌকা ভাড়াও পাওয়া যায়।

কতজনা আসছে ভাড়া নিয়ে। একবার দেখতে হবে এই সময়ে।

ডাইনে বড় ঘিঞ্জি কলকারখানা। এর নাম টিটাগড়। গাছ-গাছালির আড়ালে দেখা যায় কলকারখানার বাতি, বড় বড় বাড়ি। চিমনির মাথায় লাল বাতি।

সামনে বারাকপুর। আবার বাঁক। নদীবক্ষ। এপার ওপার বেশ বাড়ন্ত হে। ওই পশ্চিমের 'তেলা'তে যেও না। হাওয়া ওখানে ঢিল দিয়েছে। দেখছ না, মেঘঢাকা চাঁদিনী আঁধারে জলের চলকানি ছেড়ে, ওখানে যেন তেল গড়িয়ে গেছে। ওখানে বাতাস নেই। বুঝে নাও, বাতাস গতি নিয়েছে কোন্ দিক দিয়ে। ওখানে গেলে নৌকার পাল চলে পড়বে। গতি যাবে ঝিমিয়ে। পুবের আকাশ অনেকখানি কালো। এদিকে বড় গাছ, শত শত বছরের, দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে ভিতরে ভিতরে ঘোর অন্ধকার। যুগযুগান্তের জটা বেঁধে রেখেছে চারিদিক।

শুধু গাছ নয়, নজর করো, অনেক চোখ আছে। বাঁয়ে চেপে, পশ্চিমে, তেলাটার গা ঘেঁষে যেতে হবে। অনেক চোখের নজর আছে ওই জটজটলার আড়ালে—ওখানে রাজা-উজিরের বাড়ি, এদিকে লাটসাহেব, ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট। একশো চুয়াল্লিশ ধারার বাঁধ দেওয়া আছে জলে। বাঁধ তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আছে। একশো হাত দূর দিয়ে চল। তোমার আমার বাড়ি নয়, ধর্মপতির বাড়ি। শূলে দিলে দিতে পারে। শনির কোপ পড়লে আর রক্ষে নেই। মাছমারাদের অনেকের উপর পড়েছে। হাজত হয়েছে, জরিমানা হয়েছে। সে মরশুমে আর তাদের মাছ মারা হয় নি।

চোখের জলের প্রয়োজন কী? গঙ্গায় এত জল, তা-ই ঠেলে ফিরে গেছে। এক মরশুম হাতছাড়া, এক বছর কাটা গেল তোমার পরমায়ু থেকে।

মাছমারাদের কথায়, বাবু যতটুকুন তোমার প্রত্যয় যায়, ততটুকু যাওয়াও। তল্লাটের মাছমারারা বলে, মর্জিমত মাছ দিলে আইন ঢিল হয়, নইলে বড় দড়ো। আইনের রক্ষাকর্তা না প্রহরী দাড়া, সেটা ঠাহর পাই নে বিপদে পড়ে।

তার চেয়ে মাছমারা, ওই শনির কূল ছেড়ে দূরে চলো। চাপো, চাপো, পশ্চিমে চাপো। তেলায় পড়লে তোমার জোরে চলার মুণ্ডুটাকে খসিয়ে দেবে, দিক।

তবু দূর দিয়ে যাও। সুজনের বেশে তারা কোনোদিন আসে না। আর দুর্জনের নেই ছলের অভাব। ওই যে বলে, হেই ভেড়া, কী করছিস রে?

জিজ্ঞেস করছেন বাঘমশায়। বেচারী ভেড়ার প্রাণ দুরুদুরু। এজ্ঞে, জল খাচ্ছি।

জল খাচ্ছিস? আমার খাওয়ার জল ঘোলা করলি যে। দোষ করলি, এবার তোকে খাব।

এ হল সেই রকম। সুতরাং অনেক দূর দিয়ে যাও। ওদের খপ্পরে পোড়ো না।

ধরলে পরে কী রকম সব কথা। এই, এই হারামজাদা, জলের মধ্যে লৌকো ঢুকিয়েছিস যে!

—এঁজ্ঞে, জলের ব্যাপার, বুঝতে পারি নি।

—বুঝতে পার নি? সব একেবারে যুধিষ্ঠির। অন্ধকার হলেই অমনি সিঁধকাটিটি নিয়ে উঠে আসবে। চেহারা দেখো, ব্যাটা ষণ্ডা।

বোঝো, এর পরে আর কী আছে।

ধ্বক করে উঠল পাঁচখানি নৌকার বুক। একজোড়া চোখের নজর বিদ্যুতের মতো এসে পড়ল নৌকার গায়ে। ব্যাটারির চোখ-ধাঁধানো আলো। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মিনিটখানেক আলোক-বলয় নৌকা-কটির এপাশ ওপাশ করে বেড়াল। তারপরে আবার ঘোর অন্ধকার।

বিলাস প্রায় চীৎকার করে উঠল, হয়ে গেল গো দেখা।

ওই শোনো কথা। ধরলে মুণ্ডিটা গুঁড়োবে যে। চুপো হারামজাদা।

না হলে অত দূরে থেকে, দেখলেটা কী? যদি এটা ডাকাতের লৌকো হত?

পাঁচুরও মেজাজ বিগড়োয়, বলে, হবে কেন?

—আহা, বলে, যদি হত।

—তবে হাতকড়া দিত।

বিলাস হেসে বলল, ঠাওর করতেই পারলে না, কিসের লৌকো। দু বার বাত্তি ফেলে চুপ করে রইল। যেন একেবারে কী রাজকাজ্জিটা করে ফেলে দিলে। রাত জেগে খালি গপ্পো করা সার।

পাঁচু বলে উঠল, থামবি ?

থামল বিলাস। বড় বাঁক ছেড়ে এবার ছোট বাঁক। এক-একজন, এক-এক জায়গায় নোঙর করছে নৌকো। বরাবর যে যে-তল্লাটে মাছ ধরে, সেইখানে ভিড়ছে। সবাই এক জায়গায় থাকে না। দলে দলে থাকে ভিন্ন জায়গায়। সবার কথাও প্রায় সবাই জানে। সারাপুলের অর্জুন কোথায়, জিজ্ঞেস করলে আর একজন বলে দিতে পারবে। ইছাপুরের তল্লাটে আছে।

এই দেখা যায় ইছাপুর। খুব বড় বন্দুকের কারখানা নাকি। জেটি আর জেটির চারদিকে কেমন আলো ফুটফুট করছে।

আর দেখো, হুই ওপরে দেখা যায় টুপি-মাথায় একটি মানুষ। হাতে তার বন্দুক। পাহারা দিচ্ছে।

হুই কারখানা, মাঝখান দিয়ে খাল চলে গেছে পুবে, এঁকেবেঁকে সেই বরুতীর বিলে। সেখান থেকে মালতীর বিল। আগেকার দিনে খালে খালে চলে যাওয়া যেত বারাসত বসিরহাট। আজকাল মজে গেছে।

কলকারখানা কিছু কমে এসেছে এদিকে। গারুলিয়ার মাটি গঙ্গার বুকে একেবারে দৌড়ে ছুটে এসেছে। মনে হয় বাঁক ঘুরে আর জল পাওয়া যাবে না। বড় বড় গাছ আর বন-বাদাড় ঠেলে এসেছে গঙ্গার মধ্যে।

টান রয়েছে, খুব টান জলে। বড় সহজ পাত্রী ভেব না এই ভগবতীকে। একটু পুব ঠেসেই যাও। জল-পানের শব্দে টের পাবে, পশ্চিমে মাটি খাচ্ছেন। একটু একটু করে, ধীরে ধীরে। বছরে বছরে দেখছ, পশ্চিমের কোল বিস্তার করছে। এদিকে কম। বেশী খাচ্ছে চন্দননগরের উত্তরে চুঁচড়োয়, হুগলীতে।

শেষ পর্যন্ত দু নৌকা দাঁড়াল। পাঁচু আর কেদমে। বাঁক

ফিরতেই আবার বড় মুখ। বাঁয়ে চরা আছে। এখন ডুবে রয়েছে। জোয়ারের বেলা তো।

ওই দেখো, সোজা রুপোর পাতের সরু দাগ চলে গেছে উত্তরে। ওটা তোলা নয়। চরের দাগ পড়ে জলে। জল-খুঁটে-খাওয়া মানুষ হলে, তোমাকে আগে নিশানা দেবে, চর আছে সামনে।

ভরা জোয়ার। এখন বড় টলটল করছে! কূলে কূলে ভরে উঠেছে গঙ্গার শরীর। প্রাণ মন তোমার বেশী ভরে উঠলে কী হয়। ভার হয়। অঙ্গ বিবশ হয়। ভেতরে ভেতরে ফুলছ কাঁপছ, ধরে রাখতে পারছ না নিজেকে। এ কি সুখ না দুঃখ, কে জানে। কিন্তু বিবশ শরীর আর চলে না, থির হয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে যাচ্ছে এক-এক জায়গায়। কান পাতলে শোনা যায়, কী এক বিচিত্র সুর এই ভরা জোয়ারের বুকে। কিসের সুধায় ভরে গেল প্রাণ। ব্যথার না সুখের! কী চাও, কী চাও তুমি? তোমার সেই কচি মেয়ের ঝাপাইঝোড়া কোথায়। কী বলছ তুমি চুপি চুপি, তটে তটে, বিষকাটারি ঝাড়ে, জলে-ডোবা বন-হেনার ঝোপে।

জোয়ারের ভরা-ভরতি হল। নিজের বশ নেই আর স্রোতের টানে। বাতাস আছে। পাল খাটিয়ে যেতে হলে, এখন আবার কোনাকুনি রাখতে হবে। তার দরকার নেই। ওই দেখা যায় ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি। কাঁসর-ঘণ্টা বাজল বলে কালীবাড়িতে। রাত আর কতটুকুনি বা আছে। কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, ঠাকুরমশাই মাকে জাগাবেন এখুনি। গড় করি গো মা! এক বছর বাদে আবার এসেছি তোমার পায়ে। জানি নে কী আছে কপালে। মুখ রেখো আমাদের। কালীবাড়ি পার হলেই, কারখানার জেটি। ওখানটিতে একটু আলোর ছড়াছড়ি।

তারপরে আবার অন্ধকার। পার ঘেঁষে ঘেঁষে চলো। আর বেশী

দূর নেই। বলবার আগে বাদাম তুলল। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
নৌকা।

চাঁদ ঢলে গেছে পশ্চিমে। মেঘে মেঘেই গেছে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোছনা রাত। অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে। রাত কাবারের আর দেরি নেই। ভোর হল বলে। তবে, মেঘে-ঢাকা আকাশ! মানুষের চোখে পোহাবে একটু দেরিতে। বিদ্যুতের চিকচিক নেই এখন আর। শেষরাত্রে আকাশ-মাটি লেপালেপি হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। মেঘ নামছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

দু-একটা নৌকা দেখা যাচ্ছে পারে নোঙর করা। দু-একখানি বাছড়াও নজরে পড়ে। এসে গেছে কয়েক ঘরের লোক। বাকি রয়েছে বেশী। এপারে ওপারে, জেলে-মালো-নিকিরি-চুনুরি-পাড়ারও নৌকা আছে দু-একটি।

খানিকটা বিরতি দিয়ে, দূরে আবার একসারি কারখানা-বাড়ি। একটু পুবে ঠেলে আছে। গঙ্গার ধারটি ভরে আছে জঙ্গলে। ও সারিটা ছাড়িয়ে, তারপরে দাঁড়াবে নৌকা।

নাওয়া-খাওয়ার জন্যে নৌকা ভিড়বে ওপারে, অর্থাৎ পশ্চিমে। ওপারের জেলেপাড়াটা ছাড়িয়ে, উত্তর গায়ে, দুলেপাড়াটার কোলে। পাঁচু বলল, আর দু দণ্ড আছে আলো ফুটতে। ততক্ষণে এ পারেই নোঙর কর বিলেস। এ পারটা দেখে তাপরে ওপারে যাব।

—কেন বলো তো?

—জলটা এট্টু দেখে যাব।

—রাত পোহালেই গড়ক মারবে নাকি?

দেখি, কী হয়।

কেদনে পাচু প্রায় পাড় দিয়েছিল আর কি। বলল, কা হল পাঁচদা, এপারে দাঁইড়ে গেলে যে?

পাঁচু বলল, এট্টু দেখে যাব হে।

সেও রয়ে গেল।

অন্ধকার ঘন ঘোর। মস্ত একটি গাছের তলায় নোঙর করেছে ছুটি নৌকা। দক্ষিণে কারখানার পাঁচিলের আলোর একটু ক্ষীণ রেশ এসে পড়েছে কাছাকাছি। গাছটি কৃষ্ণচূড়া গাছ।

গঙ্গা নিঃশব্দ। ঝিঁ ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক কোন্ মূল গায়েনের টানা দোহারকি ধরেছে ভালো।

বিলাস তামাক সেজে আগে দিল খুড়োকে।

পাঁচু একটু হাত-পা ছাড়িয়ে হুঁকোয় টান দিল। যাক, এসে পৌঁছুনো গেল। তিন রাত আগে বেরিয়েছে। মঙ্গলে উষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা। বুধবারে বেরিয়েছে। রাত পোহালে, শনিবারের দিন পড়বে।

দক্ষিণের বাতাস এসেছে পিছু পিছু একজনের নিশ্বাস নিয়ে। এখানে এসে সেও বলত, এপারেই নোঙর কর রে পাঁচু, জলটা একবার দেখে যাই।

গুরুর কাছে শেখা পদ্ধতি। সেটা ঠাহর করে যাও এপার থেকে। দরকার হলে, কাজ শুরু করে দাও। আগুন জ্বালিয়ে ছুটি সিদ্ধ করে খেতে অনেক সময় পাবে। চোখ বুজে পড়ে থাকবার বিস্তর সময় তোমার আপনি আসবে। যদি না আসে, বেঁচে গেলে। তবে জানবে তোমার সুদিন তোমার সঙ্গেই রয়েছে। তবু ঠিক জায়গায় এসে, একবার কাছে হাত দাও। কিছু পাও না পাও, জলটা দেখে, তারপর ছুদণ্ড বিশ্রাম করো।

...চুর নড়া দাতে, বালরেখায় ভারী ফূর্তি। বলল, নে, টানা-ছাঁদিটা বার কর, একবার দেখে যাই।

কেদ্মে পাঁচুও বার করল টানাছাঁদি জাল।

ভাটা পড়েছে। চলন্তা জল হে। মুকড়া জল। ভাটার টান খুব। জোয়ারের পর যে ভাটার টান লাগে, তাকে বলে চলন্তা। মুকড়া বলে কেউ কেউ। জলে টান দেখলে, টান লাগে প্রাণে। তখন আর স্থির থাকা যায় না। জল যত চলন্তা, তোমার প্রাণ তত চলন্তা। তবে কোটালের টান-ভাটা পড়ে নি এখনো। সেই টানে শুধু নৌকো নয়, মনে হয়, গোটা ডাঙাটুকু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রে। সেও আসবে। সবুর করতে হবে একটু।

মেঘ ঘোঁট পাকাচ্ছে শুধু। আশেপাশে এদিককার নৌকা দেখা যাচ্ছে কয়েকটি। এ নৌকা দেখলেই বোঝা যায়, বাছাড়ির সঙ্গে তার তফাত অনেকখানি। একে বলে বলাগড়ের নৌকো। অর্থাৎ বলাগড় কারখানায় তৈরি হয়েছে। গলুই একটু নীচে, কাঁড়ারের দিক উঁচু। কাঁড়ারের দিকে একটু ভার না পড়লে, এ নৌকো ভালো চলে না।

বাছাড়ির যেমন সরু খোল, দেখলেই মনে হয়, সরু লম্বা একখানি চোখা বল্লমের ফালের মতো, এ তা নয়। এর পেট মোটা, মাঝখানটি চওড়া। জায়গা বেশী, মাছ ধরবে বেশী খোলে। যদি তুমি মাছ পাও। দেখলে তোমার মনে হবে, এর চাল-চলন যেন একটু কেমন। আড়তদার কিংবা মহাজনের বউয়ের মতো, ভালো মন্দ খেয়ে, গায়ে গতরে ফেঁপে ফুলে, হেলে দুলে চলা।

অত গা-ছড়ানো গতর নয় বাছাড়ির। মাছমারার হুকুমের নৌকো সে। হালে টান পড়লে ভেসে যাবে সাঁ সাঁ করে। আনাড়ি হলে অবিশ্যি, এ নৌকোও তোমার ভার লাগবে। মনে হবে, নৌকো চলে না যেন।

সে যাক। মাছমারার বাহন হল নৌকো। যেমনই হোক, জলে ভাসবার মতো একটা হলেই হল। না থাকলেই হল কোনোরকম ফুটো, ফাটল। থাকলে চলে না। কেননা, জলেই তোমার অষ্টপ্রহর বাস। অগতির গতি বলে, এখানে গঙ্গার খাতির নেই। ফুটো পেলে, ওখান দিয়ে ঢুকে উনি তোমাকে তলায় টানবেন।

মনের ফাটলের মতো। অটুট মনের যে ফাটল দিয়ে পাপ ঢোকে, নিপাত দেয়, সেইরকম। মানুষ হলে তাকে সেই ফুটোটা চিনতে হয়।

এ অঞ্চলে বলাগড়ের নৌকোই বেশী দেখা যায়। এখনও দু-তিনটির বেশী ভাসে নি। তারা সব তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে পুবের মাছমারাদের। একটি নৌকোর গলুই থেকে একজন ডেকে জিজ্ঞেস করল, ধলতিতের পাঁচু মালো নাকি হে?

কথায় একটু অশ্রদ্ধার ভাব আর গলার স্বর শুনে চিনতে পারল পাঁচু। বলল, হ্যাঁ। কে, রসিক ভাই? খবর কী ওপারের? সকলে ভালো তো?

রসিক এ তল্লাটের, পশ্চিমপারের জেলেপাড়ার মাঝি, মাছমারা। পুবের মানুষদের খুব ভালো চোখে দেখে না। যেন গঙ্গার এই হুগলীর সীমানাখানি শুধু তাদের। এখানে আর কেউ এলে, জাল ফেললে তাদের বড় বুক টাটায়। মনে করে, তাদের বেঁধে-রাখা জলের সীমানায় বে-আইনি ঢুকেছে পুবের মাছমারারা।

তবে রসিকদের তল্লাটের একটু বাড়াবাড়ি আছে। আশেপাশের সব তল্লাটের সঙ্গেই তাদের গণ্ডগোল লেগেই আছে।

শহর-ঘেঁষা মানুষ। তা ছাড়া ওপারের মাছমারাদের গোটা জীবনের মধ্যেই যেন কী একটা লুকিয়ে আছে। বাইরের মাঝিরা দেখে ভয় পায়। গালমন্দ, মারধোর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাদ যায় না

কোনো বছরই। আর হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ, সে তো এখন জলভাত হয়ে গেছে। নিজেরা মাছ না পেলেই বলবে, শালার মত আপদ এসে জুটেছে।

রসিক বাছাড়ি জাল ফেলে এসেছিল ওপারে। বোধহয়, চক্কর দিয়ে দেখতেই এসেছিল এপারের নৌকা আর মাছমারাদের। বলল, ওপারে কাদের খবর চাও, সেটা না বললে, বুঝব কেমন করে?

পাঁচু হেসে বলল, তোমাদের দশজনের খবর চাই ভাই।

রসিকের কোলে বৈঠা। অর্থাৎ পায়ে বৈঠা। হাতে বিড়ি দেশলাই। একটা বড় খারাপ কথা বলল রসিক। কথার চল্ ওটা এখানে। বলল, পালে পালে তো সব আসছে এদিকে গুছিয়ে নিতে। আমাদের দশজনের খবরে তোমার আবার কী দরকার হল?

বিলাস টানাছাঁদি জালের ভাঁজ খুলছিল। মেঘের কোলে যেন কালো চকচকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে চওড়া শরীরে। ফিরে বলল, বলে, তোমরা কটা মলে বাঁচলে, সেই খবর নিচ্ছে। সবগুলান বেঁচে আছে তো?

ওই শোনো, পুবের গরম রক্তের কথা। তোকে কে কথা বলতে বলেছে। আকচা-আকচি বাড়িয়ে লাভ কী? ধমকে উঠল, তুই কাজ কর, গুয়োটা কমনেকার।

রসিকের দিকে ফিরল পাঁচু। মুখে তার গোটা জীবনের দাগগুলি কুটো কাঠির মতো দলা পাকিয়ে আছে। উঁচু চোয়ালের কোলে, চোখ দুটি কতদূর চলে, ঠাহর করা যায় না। বলল, রসিক, চিরকালের যাওয়া-আসা, জিজ্ঞেসাবাদ করতে হয়। জবাব কাড়া না কাড়া তোমার মনের ইচ্ছে। তুমি নিজে ভালো আছ তো?

চিরকালের যাওয়া-আসা, জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

জবাব কাড়া না কাড়া তোমার মনের সই।

দুজনেরই হাত শক্ত হয়ে রয়েছে। নৌকা ঠেলে রাখতে হচ্ছে। ঠেলে কি আর রাখা যাচ্ছে। ভাটার টানে সে দক্ষিণেই ভাসছে। একটু কম ভাসছে।

রসিক কালো লম্বা মানুষ। চোখ দুটি হলদে। বয়স বোধহয় চল্লিশের কাছাকাছি। তাকিয়ে ছিল বিলাসের দিকে, ঘাড় কাত করে। বলল, হ্যাঁ, ভালো আছি। তোমার ভাইপো বেশ তালেবর হয়েছে দেখছি।

—দেখার কী দরকার। একবার আন্দাজ নিলে হত ?

মুখ থেকে যেন ক্যাঁচা মারছে। শোনো কথা। তুই শুধু শুধু কেন লাগছিস। পায়ে পা দিচ্ছে একজন। তুই সরে যা, তা না, মুখে মুখে কথা। পাঁচু কাঁড়ারের দু-ফেলে চালায় পা দিয়ে লাথি মেরে বলল, থামবি রে গাড়লের নাতি।

বিলাসকে গালাগাল দেওয়ার এইটি পাঁচুর ধরন। কোনোকিছুর 'পো' বলে গাল দেয় না কখনো। শোরের পো কিংবা গাড়লের বাচ্চা, ও-সব বলবে না। তাতে যে নিবারণকে গালাগালি দেওয়া হয়। গুণীন, সাইদার, গুরু নিবারণ! তাকে গালাগাল দিতে পারবে না প্রাণ গেলেও। গাড়লের নাতি না হয় শোরের ভাইপো বলবে।

রসিকের নৌকো বোঁ করে পাক খেয়ে, পশ্চিম মুখে চলে গেল। কেবল তার হলদে চোখ দুটি দুই টুকরো আগুনের মতো জ্বলে উঠল ধ্বকধ্বক করে। বলে গেল পাঁচুকে, দামিনী বুড়ি হাঁপিয়ে মরছে তোমার জন্যে।

পাঁচু হাসল। বলল, এই এলুম বলে।

টানাছাঁদি একরকম তৈরি করেই বেরিয়েছিল পাঁচু। বিলাস

চাপন বাঁধলে জালে। জাল ফেলল জলে। পুব-পশ্চিমে দীঘল নৌকা। যা ভাটার টান, রাখা যায় না। জালের ভাসন্ত ছোল ডুবিয়ে, নৌকা আগ বেড়ে ভেসে যেতে চায়। জাল ছাড়িয়ে চলল বিলাস। চল্লিশ হাত টানাছাঁদি। পুবে-পশ্চিমে লম্বা করে দিয়ে, জাল ছেড়ে দিল জলে। ওপরে নিশানা রইল, ভাসমান ছোলের। জাল চলল ভেসে, পিছে পিছে নৌকা। পেছনে জাল ফেলে আসছে কেদমে পাঁচু, একটু পুব ঘেঁষে।

টানাছাঁদি সকলের নেই। কেউ কেউ সাংলো ফেলে গড়ান দিচ্ছে এর মধ্যেই। চেয়ে চেয়ে দেখছে তারা, টানাছাঁদির টান।

পাঁচু আর-একবার হুঁকো নিয়ে বসেছে।

ওই দূরে দক্ষিণে দেখা যায়, খেয়া পারাপার হচ্ছে। তারপরে জেটি। জেটি পার হয়ে জলে জাল তুলতে হবে। তারপর দহ, বড় ঘূর্ণী। বাঁয়ের ওই কোলটিতে মাছমারারা ঘেঁষবে না।

পুবে বাঁধাঘাট নেই। পশ্চিমে আছে। তবে, পশ্চিমের যাবৎ বাঁধাঘাটে ভাঙন ধরেছে। শানসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে, মুখ থুবড়ে ফেলেছে পারে। কয়েক বছর ধরে এই থাঁই দেখা যাচ্ছে। তলে তলে খাচ্ছে অনেকদিন থেকেই। পুবের এদিকটায় নৌকা রাখবারও ঠাঁই নেই বিশেষ। যদি বা কারখানা আছে, সে অনেক ওপরে, সরে গেছে। বাদবাকি সবই জঙ্গল। নেলো, বিষকাটারি, কালকাসুন্দে। বাতাসে কেঁপে ঝেঁপে মরছে।

জল নামছে খলখল করে। একে দক্ষিণে বাতাস। তায়, ভাটার টান জলে। যেমন টান, তেমনি ঢেউ। এক-এক জায়গায় পাক খেয়ে যাচ্ছে জল। ওটি ঘূর্ণী-ঘূর্ণী খেলা। মানুষ খাবে না ওতে। লতাপাতা পেলে এক গরাসেই সাবাড় করবে। ছোটোখাটো তক্তা গেলে, ধরে রাখবে খানিকক্ষণ।

তুমি গঙ্গায় এসেছ। সামনে তোমার জলেঙ্গা জল। তোমার প্রাণ-রসানো জল। জলেঙ্গা জল তোমার গঙ্গায় আসার প্রস্তাবনা।

তার আগে তোমাকে জানান দিয়েছে অম্বুবাচী। জানান দিয়েছে, টানের দিনের কচি মেয়েটি, মা হবেন এবার। নারীত্ব দর্শন করছেন সসাগরা ধরিত্রী। মানুষের পাপ সব। তাই মন বলে, তোমার আমার ঘরনী আর আর কন্যার মতন। সেদিনের ঝিটকি-চুলো মেয়ে, দেখো, ফেঁপে ফুলে, ছড়িয়ে ভরিয়ে, দিগদিগন্তে ঢলোঢলো। কেন? না, মা হলেন এবার সেদিনের মেয়ে। কোল ভরে এবার জন্ম হবে সোনা-মানিকের। চেয়ে দেখো জলের দিকে। রক্তের ঢল নেমেছে সেই অম্বুবাচীর দিন। তোমার ঘরে যেমন নামে। তাই তোমার ঘরের কুলায় যিনি ঘরনী, তিনি ক্ষুদ্র বেশে পৃথিবীর লক্ষণ নিয়ে আছেন। ইছামতীর কালো জলেও তুমি লাল ঢল দেখে এসেছ। তারপর আসবে ঘোলা জল। সেটা আরো ভালো। জলের তলে যত অন্ধকার আসবে ঘনিয়ে, ঘুটঘুটি, রাতের মতো জমাট বাঁধবে, ততই সুদিন।

আস্তে, আস্তে হে, পা দুখানি একটু নরম করে ফেলো মাটিতে। তারপরে তো তুমি আর বাগ মানবে না, লাঙল কোদাল চালাবে। সংসারের নিয়ম। তুমি দাপাদাপি করবে, জন্মাবে, মরবে, খুঁটে খাবে এই ধরিত্রীর 'পরে। এখন রাখো, ধরিত্রীকে আঘাত কোরো না। মাতৃরূপ লাভ করেছেন তিনি। তিন দিন বিশ দণ্ড, মাটিতে আঘাত কোরো না। তোমার ঘরের কথা স্মরণ রাখো। আগুন জ্বেলো না। বামুন, বিধবারা রান্না পোড়া কিছুই খাবে না। সেটা আবার ধর্মের কথা। বড় জাতে পালেন। যাদের খাওয়া জোটে না, তাদের আহার পেলে সরাতে নেই। ওটাও ধরিত্রীর বিধান।

মাটিতে আঘাত কোরো না। জলে জাল ডোবানো বন্ধ রাখো।

বাড়িতে গোরু নেই, বিলাসের মা কোত্থেকে দুধ এনেছিল পো-খানেক, অম্বুবাচীর দিন। বাড়ির সকলের মুখে ফোঁটা-ফোঁটা দিয়েছে। দুধ খাও, শাস্ত্রে নাকি বলেছে সাপে কামড়াবে না আর।

দেখছ না, চারদিকে বড় ভার হয়েছে ধরিত্রীর শরীর। যৌবন এল। পুজো হবে এবার, ঢ্যালাপ্যালা পুজো। মাঠের মাঝখানে গিয়ে, ঢ্যালা মাঠে সাজিয়ে দিয়ে আসবে নৈবেদ্য। বাজিয়ে ফিরবে শাঁখ, কাঁসি।

যুবতী হয়েছে, এবার বীজ দাও। ফল হবে। মাঠে ফসল হবে, মাছ আসবে এবার জলে।

পাঁচু দেখছে চেয়ে চেয়ে। লাল জল এসেছে গঙ্গায়। মা গঙ্গার এই আসল রূপ। প্রথম লাল ঢলটা গেছে। রঙ আবার একটু মাটো হয়েছে। এর নাম জলেঙ্গা জল।

জলের এমনি যাওয়া-আসা। জীবনের মতো। সুখ-দুঃখের মতো। মনে কোরো না, পাহাড়ী ঢল এসেছে এর মধ্যেই। এখন যে লাল দেখছ, এ উত্তরের গাঙের জল। এর মধ্যে এখনো প্রাণের উত্তাপ আছে খানিক। এখানে দেখছ জলেঙ্গা জল, কোন্ না কালনার কাছাকাছি এতক্ষণে এসেছে পাহাড়ী ঠাণ্ডা জল। ঠেলে নিয়ে আসছে জলেঙ্গা জলকে।

আগে আগে এমনি করে মুখে মুখে, হাতে পায়ে কাজ শিখিয়েছে পাঁচু বিলাসকে, হ্যাঁ রে, জলেঙ্গা জলে মাছ কেন? না, সমুদ্রের জোয়ারের সীমানা পার হয়ে, যে-মাছ আছে বারোমেসে ভাটার তল্লাটে, পাহাড়ী জল তাকেই নিয়ে আসছে তাড়িয়ে। তাই, জলেঙ্গা জল তোমাকে কিছু দেবেই।

এর পরে ঠাণ্ডা জল পিছু পিছু আসবে তোমার দুঃখের প্রস্তাবনা নিয়ে। তোমাকে দশ দিন ভোগাতে পারে, ছ দিন পারে, সারা

মরশুমটাও পারে। যদি সে বেশী আসে, তবে তোমার কাল হয়েছে জানবে। কেন না, তোমার যেমন শীত-গ্রীষ্ম আছে, তেমনি আছে মাছেরও। জাড় লাগলে তুমি যেমন ওম খোঁজ, মাছও তেমনি তাপ খোঁজে। তাই বরফ-ভাঙা পাহাড়ী জল সে এড়িয়ে যেতে চায়।

এখন এই জলেঙ্গা জল দু দিন থেকে তিন দিন থাকবে। তোমার সুদিনের প্রস্তাবনা নিয়ে এসেছে। এ জলে মাছ পড়বেই। যখন এসেছে, তখন ধরিত্রী তোমাকে ফাঁকি দেবে না। তুমি ধরতে জানলেই হল। পাবেই পাবে, কম আর বেশী। যে মাছমারা জানে, সে কখনো এ তিন দিন ছাড়বে না।

তারপরেই প্রথম বরফগলা জল আসবে। কিন্তু তার কারসাজি সমুদ্রে চলে না। আর মাছ সাগরের, বরফের সঙ্গে তার কারবার নেই। গায়ে ছোঁয়া লাগলেই সে পালাবে সাগরে। তারপর সইয়ে সইয়ে আসবে। সাগরের জল পাহাড়ের জলে মিশে যে তাপটুকুনি পাবে, তাই সয়ে যাবে। জল আরো ঘোলা হবে। গঙ্গা আরো বড়ো হবে। আরো ফুলবে, ফাঁপবে। তোমার নৌকা যত সাবধান করতে হবে, জানবে, গঙ্গার কাল ততই তোমার সহায় হবে। কেন? না, উজানী মাছ আসবে।

কেউ বারোমাস দেয় না। গঙ্গাও নয়: কিন্তু এই মরশুমে যা দেবে গঙ্গা। যদি দেয়, তবে তোমার মার নেই। নইলে মার কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাই গঙ্গায় তোমাকে আসতে হবে। এইখানে তোমার জীবন-মরণ অপেক্ষা করছে।

বৃষ্টি আসবে নাকি! না। মেঘ জমজমাট চারদিকে। দলা পাকানো।

যেখানে দেখবে, মেঘ চির খেয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, ক্ষয় ধরে রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, জানবে ওইখানে ঢালছে। দেখতে পাবে,

যেন গলে গলে কালো মেঘ সাদাটে হয়ে পড়েছে, নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে। মাথার উপর হলে জ্বামবে, জল ঢালবে মাথায়। যেন চিতনো মেঘখানি সহসা টল খেয়ে ঢলে পড়েছে নিচের দিকে, উবজে পড়ছে। আর দেখবে, ধোঁয়ার আস্তরণ পড়েছে যেন। ওটা জলের কণা।

সামনে জেটি। জলের টান ঠেলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যেন বড় আয়াসে, নির্বিকার, নির্লিপ্ত, মাপজোক-কষা লোহার জটা নিয়ে। আষাঢ়ের ভাটা চলেছে তার পায়ে মাথা খুঁড়ে। কখনো কলকল করে পাক দিয়ে, কখনো শাসিয়ে, উপড়ে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। আর যেন বৃথা আক্রোশে গৈরিক চুল এলিয়ে ছুটে চলেছে দক্ষিণে।

জেটি পার হল। সামনে দেখা যায় দহ। ভাবখানা, দেখো আমি টেনে চলি নি, থেমে আছি। তোমাকে আমি দূরে নিয়ে যাব না।

সে নিয়ে যাবে না। এক জায়গাতেই ফুলে ফুলে পাক খায়। রাখলে ওইখানেই রাখবে।

সাবধান, মাঝি সাবধান।

পাঁচু বলল, পারবি ?

বিলাস তার আগেই জালে হাত দিয়েছে। এই প্রথম জাল ফেলা আর তোলা এই মরশুমে। মহাজনের মুখের কথা ভেবো না এখন। সে তোমার বারোমাস, এও তোমার বারোমাস। মন শান্ত করো।

বিলাস জবাব দিল, না পারার তো কোনো কারণ দেখি নে।

বলে জালে টান দিল। বিলাসের কথা কানে গেল না পাঁচুর। গন্ধ বল, শ্রবণ বল, দর্শন বল, সব জালের উপরে। যতই বোঝাও মনকে। জলেঙ্গা জল কী দিল, শুধু সেই ভাবনা।

—হ্যাঁ রে, জালটা ঠিক চেলে পড়েছিল তো ?

—চকের সামনেই তো ফেনন্থ।

গায়ের মাংস কিলবিল করে ওঠা-নামা করতে লাগল বিলাসের। ঘাড়ের উপর খাড়া হয়ে উঠেছে ছুটি মাংসপিণ্ড। কাজে না নেই ছোঁড়ার। তবে জিভে যেন বিছুটির পাতা আছে, কথা বললেই জ্বালা দেয়। মালো যে!

জাল তুলতে তুলতে নৌকা ভেসে চলেছে। আর বেশী দূরে যাওয়া যাবে না। সামনে, বাঁয়ের বাঁকে আওড় পাক খাচ্ছে। কোলের ঘূর্ণী। দেখে কিছু ঠাহর করা যায় না। পড়লে ছাড়ানো দুষ্কর।

পাঁচুর সারা মুখখানি যেন একটি জাল। সুতোর জটা মুখখান যেন জলের ঢেউয়ে চলকে চলকে উঠছে। প্রায় অর্ধেকখানি জাল উঠল। বিলাসের ঝাপটায়, শূন্য জাল থেকে, রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে জলেঙ্গা জলের কণা।

তারপর, একটি লালচে ভোলামাছ। গোটাকয়েক রুপালী খয়রা। বড় খয়রা। থাকলে হয়। টানাছাঁদির ঘের। না থাকবারই কথা। তারপর, জলেঙ্গা জলের আশীর্বাদ।

ছুটি ইলিশ। কী তার ঝকমকানি! যেন চোখ ছুটি ধাঁধিয়ে যায়!

পাঁচু উঠে বিলাসের কাছে গেল গলুয়ে। বিলাস ততক্ষণে জালের ভিতর থেকে মাছ বার করছে। পুষ্ট, নিটোল, সুন্দর গড়নের একটি। আর-একটি ছোটো, একটু লম্বা। হাত দিতে না দিতে রক্ত গড়িয়ে এল কানকোর তলা দিয়ে।

মাছে হাত দিল পাঁচু। বুড়ো প্রাণখানি ভরে উঠল আনন্দে। চোখে জল আসতে চায়। নিবারণ যাওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই প্রথম দিনের মাছ পেয়ে বড় টনটনিয়ে ওঠে বুকটা। সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায় মাছের। তুই সব দেখিস, তোর চোখে ফাঁকি

পড়ে না কিছু। আমার দাদাকে দেখে এসেছিস, আমাকে ছাখ। আমি তোর জন্যে এসেছি।

বিলাস বাকি জালে টান দিল। জাল প্রায় শেষ। আরো খানকয়েক খয়রা।

জালের গায়ে মেলাই মেকো। মেকো হল কাঁকড়ার বাচ্চা। সে কি একটা ছুটো। নৌকা ভরে গেল জালে-ওঠা মেকোয়। আর তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে রসনা চিংড়ি। এখনো অতি ছোটো, প্রায় বিন্দু-বিন্দু।

মেকো তোমার মাছের বাহন। থাকলে বুঝবে, অল্প হলেও মাছ আছে গঙ্গায়। তবে বড়ো. আঁশটে গন্ধ হয় মেকোর জলে। আসে লাখে লাখ, মরে লাখে লাখ। মরলেই গন্ধ হয় জলে। বিস্তর জন্ম, বিস্তর মড়ক। এর মধ্যেই বাতাসে একটু একটু আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

পাঁচু দেখছে মাছ। হ্যাঁ, সুন্দর। বড়ো মাছটির কোমরের ওপরে একটু টিপন দিয়ে দেখল। হুঁ, ডিম আছে একটু। তা হলেও বেশ। সুন্দর গড়নটি। আঁটোসাটো যুবতী মেয়েমানুষটির মতো। লম্বাটি পুরুষ, বেটাছেলে মাছ।

ওদিকে কেদমেও পেয়েছে মন্দ নয়। খয়রা আছেই। একটি ছোটো ইলিশ, একটি মাঝারি রিঠে।

—কেমন হে কদম পাঁচু?

—ভালো।

—হ্যাঁ, ভালো।

দক্ষিণা বাতাস রয়েছে। একজন তো থাকে ওই বাতাসে। বুকের মধ্যে বড়ো টনটন করে। এই বুঝি আট বছর হল. পাঁচু একলা। আর-একজনের নিশ্বাস ঘুরে মরে এইখানে। টের পায় পাঁচু।

মাছমারারা জানে, গুণীন মরলে দানো হয়। হতে পারে। তবু সে দাদা। অকল্যেণ তো করবে না। তার আশীর্বাদ রয়েছে।

বাড়ির মানুষগুলোর বড় দুর্দশা যাবে এখন ক মাস। কোনো-রকমে বেঁচে থাকবে। মাছমারার ঘর তো। তারা ফিরে না এলে, ঘরে কিছু থাকে না। তা দিয়েছে মন্দ না জলেঙ্গা জল। নিশানা দিয়েছে ভালোই।

নে নে, নৌকা পুবে ঠ্যাল। এই উজান ঠেলে যেতে হবে আবার উত্তরে। তারপরে, পাড়ি ওপারে।

জাল রেখে লগি ধরল বিলাস। কাঁড়ার থেকে হাল চাপল পাঁচু। বিলাস গান ধরে দিল,

তোমারে না পেয়ে হিদে বড়ই অ-সুখ—হে
বড় উথালি-পাথালি আমার বুক।

বড় উথালি-পাথালি ছোঁড়ার বুক। ওর লগি ঠেলার চোটে আমার ঠেলা হয় না, এত জোর। দাঁড়া রে, দাঁড়া, তোর বুক শান্ত হবে। এই মরশুমটা যাক। অগ্রহায়ণে নয় মাঘে, এবারে কাজ সারতে হবে। নৌকাটাও যদি কোনোরকমে মহাজনের কবল থেকে একেবারে নিতে পারি, তবেই হয়ে যাবে। তারপর একটু বাঁধা সুখের ঠিকানা খুঁজতে হবে আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে। এই না জন্ম-জন্মান্তরের সাধ। জলেঙ্গা জলের এই নিশানাটুকু, এই যেন অক্ষয় হয় এই মরশুমে।

ভাবে পাঁচু, হালে চাপ দিতে দিতে। তা আবার গাম্‌লি পাঁচীকে নাকি পছন্দ নয়, বড়ো যে ছেলেমানুষ! তবে কি তোমার জন্যে এখন একটা ধাড়ী বেটী ধরে নিয়ে আসতে হবে? এমনিতেই গাঁয়ে কথা হয় গাম্‌লি পাঁচীকে নিয়ে। মেয়ে একটু বড়ো হয়ে পড়েছে। কথাটি মিছে নয়। মেয়েমানুষের বাড়, সে যে আগুন। যতই চাপ,

চোখে পড়বে ঠিক। বলছে যখন দশজনে, তখন বড়ো হয়ে পড়েছে নিশ্চয়। আর সয়ারামের মুখে শুনেছে পাঁচু, ওদিকে একটু টানও ছিল ভাইপোর। কী একটা অঘটন ঘটে গেল অমর্তর বউয়ের সঙ্গে। এখন বলছে, বড় ছেলেমানুষ!

তবে বলতে হয় তোমাকেই মুখ ফুটে, কাকে তোমার পছন্দ। দিবানিশি তোমার মন ফসফস করে। উথালি-পাথালি করে। বিষ রয়েছে তোমার প্রাণে। সে পাক দিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। তোমার জ্বালা বুঝি। মন-প্রাণটি একজনের কাছে দিয়ে তোমাকে বলতে হবে, একটু জুড়িয়ে দাও গো। আমার এত পাপ, এত পুণ্যি, এত সুখ, এত দুঃখ, সব নিয়ে জ্বলে মরছি অনেকদিন থেকে। তুমি জুড়িয়ে দাও।

তবে হ্যাঁ, সে-মানুষ মনের মানুষ হওয়া চাই। অবশ্য হওয়া চাই। পছন্দসই হতে হবে।

তুই আমার ভাইপো। তোকে বাবা বলি, সোনা-মানিক বলি মনে মনে। তুই কাজের ছেলে। কিন্তু তুই বাদা-ঘাঁটা, সমুদ্র-ঘাঁটা ছেলে। গঙ্গায় আসিস এই শহরের পারে। কেমন তোর পছন্দ, সেই আমার ভাবনা।

হঠাৎ সম্বিৎ হল পাঁচুর। বিলাসের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বিলাস বলল, কী দেখছ তখন থেকে তাক্‌কো, বলো দিনি? যেন একেবারে চোখ-খাবলার মতো অপলক দেখছ।

শোনো, আমি নাকি চোখ-খাবলার মতো দেখছি। রেগে বলেনি, আসলে এতক্ষণ ধরে খুড়োকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেয়েছে বিলাস।

পাঁচু বলল, তোকে কি আর দেখছি আমি। আমি ভাবছি দশটা কথা। ঠ্যাল্ ঠ্যাল্, লগি ঠ্যাল্।

খেয়া-ঘাট পার হয়ে গেল। পার বেঁধে নৌকা উজানে চলেছে। কলকল করে ডাক ছেড়ে চলেছে ভাটার জল। সামনে ইট-পোড়াবার কল। কল এখন বন্ধ। বর্ষাকালে পাততাড়ি গুটিয়েছে সব। পলি পড়বে সারা বর্ষা, সেই মাটি দিয়ে পরে ইট তৈরি হবে। যেন পোড়ো কারখানা। পুরনো আর ভাঙা ইটের পাঁজায় ভুতুড়েবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে। লোকজন নেই। ইটকলের পর মরুই-পোড়া ঘাট। তাকে ঠিক শ্মশান বলা চলে না। তারপর দুটি কারখানার পাঁচিল। কারখানা পার হয়ে পাড়ি দিতে হবে পশ্চিমে।

গঙ্গার ধারে পলি পড়েছে। দক্ষিণের মাটি নিয়ে এসেছিল জোয়ারের নেশায়। তখন খেয়াল ছিল না। এখন মাখনের মতো ছড়িয়ে রেখে যাচ্ছে নরম মাটি। পলিতে কিলবিল করছে মেকো। জল না পেলে শুকিয়ে মরে বাছাধনেরা! ওর মধ্যেই আছে রসনা চিংড়ির মেলা। কাকের দল এসেছে উড়ে। বক ঘুরছে ইতস্তত। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলছে, যেন পাড়ার বামুনঠাকুরুনটি। বড় ছুঁচিবাই, যেন দেখেশুনে পা ফেলছে। আসলে নজর আছে ঠিক মেকো আর চিংড়ির ওপর। ভোজ লেগেছে কাক-বকের।

মেঘ পাতলা হচ্ছে। এত সময় করলে কী তা হলে আকাশ জুড়ে। রাতভোর এত গুমসোনি, এত বিজলী চমকের ঠাট। এখন আবার রোদ দেখা দিচ্ছে থেকে থেকে।

—একবার দাঁড়িয়ে যাবে নাকি হে?

ফড়ে ডাকছে, শ্মশানের উত্তর কোণে দাঁড়িয়ে। বিলাস তাকাল খুড়োর দিকে, পাঁচু দেখল ফড়েকে। চেনা-চেনা মুখ! এখানকার যাবৎ ফড়ে-পাইকেরই চেনা-মুখ। লক্ষ্য রেখেছে ঠিক, মাছ পেয়েছে এরা।

পাঁচু বলল, দাঁড়াবার উপায় নেই গো।

—কেন, পেয়েছ তো?

কী পেয়েছে, সেটি বলবে না। 'মাছ' বলতে নেই। হয়তো মনের ধোঁকা। তবু নাম কোরো না। যাকে মেরেছ, তার আত্মা আছে এখানেই, এই বাতাসে, জলে। সে সদয় হয়ে এসে মরেছে তোমার হাতে। নাম করলে সে বিমুখ হতে পারে। জিজ্ঞেস করো, আছে নাকি? দেবে নাকি? পেলে নাকি?

পাঁচু জবাব দিল, তা পেয়েছি। কিন্তু দেওয়ার উপায় নেই। নেবার লোক আছে।

পাইকের বলল, কেন, আমরা কি লোক নই?

এই রকম কথা ফড়ে-পাইকেরদের। এই তো সবে শুরু। আরো কত কথা হবে। মাছ কি আমি আমার নৌকার খোলে পচিয়ে রাখবার জন্যে ধরেছি। ধরেছি আর-একজনের হাতে দেওয়ার জন্যেই। সেই তো আমার বড় পুণ্যি! থাকতেও যদি না দিতে পারি, তা হলে বুঝবে, আমার কোনো প্রতিবন্ধক আছে।

কিন্তু এরা তা বুঝবে না। খালি এড়ো এড়ো কথা বলবে। জবাব না দিলে দেবে গালাগাল। পাঁচু বলল, লোক বৈ কি। কিন্তন্ আমার দেবার উপায় নেই।

বলতে বলতে নৌকা এগিয়ে গেছে অনেকখানি। পিছন থেকে বলে উঠল কেদমে পাঁচু, আমি দিয়ে যাই পাঁচদা।

পাঁচু বলল, দিয়ে এসো।

বিলাস বলল, মাছ কি তুমি দামিনী বুড়ীর জন্যে রাখলে?

—হ্যাঁ।

—পেত্থম মাছ বুড়ীকে দেবে?

—হ্যাঁ। নগদে দেব। ধার-দেনা আছে বুড়ীর কাছে। সেটার শোধ এখন দেব না। দিন তো পড়ে আছে। কিন্তু পেত্থম মাছ

আমাকে বুড়ীকেই দিতে হবে। রসিক বলে গেল যে, বুড়ী বসে আছে আমাদের পথ চেয়ে। ও বাবা, না দিলে আমার পাপ হবে না?

—যদি নগদ না দেয়?

—দেবে। তুই কি নতুন এলি নাকি? পেথম মাছ কেউ ধারে কাটিয়ে নেয় নাকি? না, কেউ ধার চায়? তার ঘটে বুদ্ধি নেই? নে নে, পাড়ি দে। পাল খাটা। খাট্টো কানদড়িটে দে আমার কাছে।

মাস্তুলে জড়ানো ছিল পাল। বাতাস রয়েছে ভালোই। পাল খুলে দিয়ে, বিলাস কানদড়ি দিল খুড়োকে। পাঁচু পায়ের আঙুলে বাঁধলে কানদড়ি। নৌকা দিল ঘুরিয়ে পশ্চিম কোণে। বাছাড়ি ছুটল গোঁ ধরে, বাঁয়ে চেপে।

জলেঙ্গা জল নামছে কলকল করে। প্রাণে বল দিয়েছে এই জল। জলের দিকে তাকিয়ে বলে পাঁচু মনে মনে, মা গো, এই জলটুকু রাখিস সারা মরশুমটা। আশ্বিন মাসের গঙ্গাপুজোয় পেট ভরে খাওয়াব তোকে মা।

নৌকা এসেছে মন্দ না। ওই দেখা যায়, গলুয়ের চেয়ে কাঁড়ার অনেক উঁচু নৌকা কয়েকটা, ওগুলি দূরে পুবের নৌকা। এখন সেখানে পাকিস্তান হয়েছে। নৌকার কাঁড়ার বেশী উঁচু। পাথাল্গিতে একটু বড়ো। খোল গভীর। প্রায় বলাগড়ের নৌকার মতোই। তবে ভাবখানি যেন আর-একটু চোখা চোখা।

পুব দেশের মাছমারাদের নৌকার গড়ন ওই রকম। সমুদ্রে দেখেছে পাঁচু অনেক। আজ দেশ ভাগাভাগি হয়েছে। পুবের লোকেরা আসত সমুদ্রে। বড় বড় সাই আসত পদ্মা-মেঘনা-পারের। খুব ভালো মাছমারা ওরা। সাহসও দুর্জয়।

তবে নৌকাগুলি দেখলে পাঁচু থতিয়ে যায় একটু। এত উঁচুতে

বসে কাজ করে কেমন করে এরা। তবে হ্যা, যার যেমন তার তেমন। পেট থেকে পড়ে ওই নৌকায় মাছ মেরেছে তারা। তারা আবার বাছাড়ি নৌকা দেখে ভাবে, এ তো বাচ-খেলার নৌকা, এতে কাজ হয়. কেমন করে।

পশ্চিমের সীমানায় আসা গেল। খরস্রোত এপারে। খেলার বহরটাও বেশী। পায়ে পায়ে দহ। চোখে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু পশ্চিমপার খাচ্ছেন একজন দিবানিশি। খানে খানে জল ফুলছে। ছুটতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে নাচছে ঘুরে ঘুরে, এক-এক জায়গায়।

সামলে। পাল গুটো বিলেস। উলটা স্রোত দেখা যায়। এপারে উঁচু পাড়। ভাটায় জল নেমেছে। কোলের জমি দেখে বোঝা যায়, কে যেন এতক্ষণ বড়ো বড়ো থাবায় আঁচড়েছে।

পুব পারের যেখান থেকে পাড়ি দিয়েছিল, পশ্চিম পারে আসতে আসতে ভাটার টানে পেছিয়ে এসেছে প্রায় আধমাইল। আবার লগি ঠেলতে হবে। কিন্তু লগি ঠাঁই পায় না এপারে।

দাঁড় ধর বিলেস সমানে, চন্দননগরের মীয়াজীপীরের দহ। ডাঙার উপরে পীরের থান। এখন পীর আছেন ওই দহে। তাঁর মাথার উপর দিয়ে যেতে পারবে না। গেলে নৌকার তলা ফেঁসে যাবে। পীর টেনে নিয়ে যাবেন তলায়। তারপরে ঘোড়া-পীর। উনি এখনো জলে নামেন নি। নামলে আওড় হবে। পাক খাবে জল। এখন অনেক মাছমারা ঘোড়াপীরের তলায়ও থাকে। অর্থাৎ ঘোড়া-পীরের থানে।

কিন্তু পাঁচুকে যেতে হবে আরো আধমাইলটাক। তার মধ্যে আছে কয়েকটি কাঠ, চুন, শুরকির গোলা। কাজের ফাঁকে ওখানকার কুলি-কামিনরা পা ছড়িয়ে গালে হাত দিয়ে একটু বসে গঙ্গার পাড়ে

এসে। তাকিয়ে দেখে ভিন্‌দেশের মাঝিদের। তখন বোধহয় ঘরের কথা মনে পড়ে ওদের। গান গায় তখন। পাঁচুরা তার ভাষা বোঝে না। সেও দূরের মাছমারা। সুরের মধ্য দিয়ে আসল কথাটি মর্মে মর্মে বোঝে, কাকে ডাকছে তারা। কেন ডাকছে। বিদেশে এসে মাছমারারা যাদের কথা ভাবে, তারাও ভাবে সেই ঘরের মানুষের কথা।

পার হয়ে এল আধমাইল। শ্মশানঘাট। ঘাটের পাষাণ গেছে উলটে। মুখ থুবড়ে উলটো হয়ে পড়ে আছে চিতিয়ে। ভাটা তার উপরে পলি ফেলে গেছে। মেকো গিজগিজ করছে ভাঙা, বিকটমূর্তি পাষাণে।

একটি পুরনো অশ্বত্থগাছ বাঁকানো পাকানো অগুনতি হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাড়ে। গোড়া থেকে মাটি ধ্বসে গেছে। মনে হয়, শিকড়ের জটা নিয়ে প্রায় ঝুলে আছে বুড়ো অশ্বত্থ। কপালে-সিঁদুর একটি সাধু ঝিমুচ্ছে বসে ভাঙা মুমূর্ষু ঘরের দরজায়। আর জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে বসে আছে দুটি পাঁশুটে কুকুর।

দাঁড় বাইতে বাইতে হেসে বলল বিলাস, আহা রে, বাছাদের আমার শোক ছ্যাকো দিনি একবার।

অবাক হয়ে পাঁচু বলল, কার কথা বলছিস রে!

—ওই সাধুবাবাজী আর কুকুরের কথা বলছি। মড়া আসে নি, বেচারিদের ঝিমুনি কাটছে না।

—হেই হেই রে শোর, কাকে কী বলছিস তুই? তোর পাপে ডর নেই?

—কেন?

—কেন? আরে গাড়ল, ওঁয়ারা যে অন্তাযামী।

বিলাস হেসে উঠে বলল, কারা? ওই মড়া-খেগোগুলান?

পাঁচুর হাতে হাল থেমে গেল। চীৎকার করে উঠল, চুপ করাব রে গাড়লের জাত, অ্যাঁ?

চুপ করল বিলাস। দাঁড় টানতে লাগল দ্বিগুণ বেগে। মাছ পেয়েছে, তাই প্রাণে আর কোনো কথা বাগ মানছে না। কিন্তু মানাতে হবে। তুমি সব শেষ করে এখানে আস। এরা তোমার শেষ পথের দ্বারী। এদের নিয়ে মশকরা চলে না।

শ্মশান গেল।

তারপরে ঘন জঙ্গল। নেলো, বিষকাটারি, কালকাসুন্দে আর আসসেওড়ার ঝোপ। এদিকটা বড়ো নির্জন, কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। বাড়ি-ঘর-দোরও বুড়ো একটা দেখা যায় না।

আর ওই দেখো, জল ওখানে দাঁড়িয়ে কেমন ফুলছে, যেন ভিতরে ডুব দিয়ে কে মোচড় দিচ্ছে স্রোতের বুকে। স্রোত পাক খেয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। উপরের ডাঙায় জানোয়ারের হাড়-পাঁজরা দেখা যায় ছড়িয়ে আছে। এদিকটা ভাগাড়।

তারপরে পাড়া। দেখেই বোঝা যায় ডোমপাড়া, ইতস্তত এলোমেলো ঘরের সারি। শুয়োর ঘুরছে কয়েকটা। আবার একটু বুনো জমি ছাড়িয়ে নতুন পাড়া দেখা যায়। পাড়াটা পুবে-পশ্চিমে লম্বা। গঙ্গার ধার থেকে ঢুকে গেছে পশ্চিমে, গঞ্জের ঘিঞ্জিতে গেছে হারিয়ে। একরাশ ঘর দেখা যায়। ছিটে বেড়া, গোলপাতার ছাউনি-দেওয়া ঘর। মাঝে মাঝে কোঠাবাড়িও দেখা যায় দু-একখানি। গঞ্জের উপরে সবই অবশ্য কোঠাবাড়ি।

লোকে বলে, এটা মেয়েপাড়া। বলতে পার, বাজার। মেয়েদের বাজার। খারাপ কথায় যদি বল, তবে বেবুশ্যেপাড়া। খারাপ, কেন না ওটা গালাগাল হয়ে গেল।

বাজার বলা ভালো। আমার জিনিস, এই নাও, সাজিয়ে গুছিয়ে

বসেছি, এখন তোমার পছন্দ। মাছের বাজারে এসেও তুমি তাই কর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখ। দরদস্তুর কর। আমার কলজের কথা তুমি বুঝবে না। তুমি কিনিয়ে, আমি বিকিয়ে। তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার ওপরে আমার কথা চলে না।

তবে সেটা মাছ, এটা মানুষ। তোমার প্রবৃত্তি নিয়ে কথা। মাছ বিক্রি করি, মানুষ বিক্রি করতে পারি নে আমি। কিন্তু মেয়েমানুষ নিজের অঙ্গ বিকোচ্ছে ওখানে। মানুষের অঙ্গ। তোমারো মানুষের অঙ্গ। একজন বিকোয় পেটের দায়ে। তুমি কেনো মাছের মতো।

আমি মাছ মারি, আমি জানি আমাকে সে মারছে দিবানিশি। তুমি ভাব তোমাকে কে মারবে।

কাছের পুব থেকে যারা আসে, দক্ষিণ দেশের পুব থেকে, তাদের সঙ্গে এদের ও-সব সম্পর্ক নেই। তবে হাঁ, ধারেকাছের ঘরে যারা আছে তারা আসে মাছ নিতে। তাদের রঙ-ঢঙ একটু আলাদা। সকলেরই থাকে। তুমি যদি দিগগজ হও, সেটা বোঝা যাবে তোমাকে দেখে। আমাকে দেখে বলতে পারবে আমি মাছমারা। তেমনি তাদেরো বোঝা যায়। মাছ চাইবার রীতিটা তার একটু আলাদা।

ক্যাঁচা দেখেছ মাছমারার? লোহার ধারালো ক্যাঁচা, শোল বানমাছ গিঁথে মারে তাতে। তারা চোখে মুখে ওই রকম ক্যাঁচা মারে। মেরে মাছ চায়। ওটা তাদের অভ্যাস। ওতে মাছমারা মরে না। ঘায়েল হয় একটু। ঘরের মেয়েমানুষের কথা মনে পড়ে যায় তার। তখন বুকে একটা ঝড় ওঠে। উঠে, বুকের মধ্যেই দাপিয়ে মরে। বড়ো কষ্ট হয় তাতে। মাছমারার আসল মরণ অন্যখানে। ও-ক্যাঁচা তাকে বেঁধে না। দুটো-চারটে পয়সা তোমাকে কমাতে হবে এখানে। বলবে দু আনা পয়সা কম দেব, মাঝি ভাই, খাইয়ে যাও একটি মাছ।

তা সব মানুষের সমান নয়। সুখ-দুঃখ দেখতে হয়। পারলে তুমি না বলতে পার না। মাছমারাদের আর-কোনো সম্পর্ক নেই। নেই, তবে হাতের পাঁচটা আঙুল তোমার সমান নয়। যে মাছমারার প্রাণ পড়ে গেছে এখানে, সে রকম দু-এক জনকে দিয়ে বিচার হয় না। এটা একটা মজলিশের মতো। রক্তে একবার ধরে গেলে ছাড়ানো যায় না। ঘরে যার বউ নেই, তার রক্তে ধরে বেশী। টাকার চেয়ে মাছের লেনদেনেই কাজ চলে। মাছমারাকে তার ঘরেও যেতে হয় না। গঙ্গার পাড়েই, একটু ফাঁকা নিরালায় নগদ বিদায় হয়।

তোমার দুটি মানুষের চোখ আছে। তোমার চোখ নেমে যাবে লজ্জায়। যে বিকোয় তার জায়গা অজায়গা, ঘাট অঘাট নেই। যে কেনে তারও। যে কেনে তার এটা স্বপ্নের তৃষ্ণা। স্বপ্নে যখন তোমার তৃষ্ণা পায়, তখন তুমি কত জল খাও। তবু তোমার তৃষ্ণা মেটে না। তোমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, বেরিয়ে যেতে চায় প্রাণটা। কত জল খাও, কত জল। তবু তৃষ্ণা মেটে না। তারপর স্বপ্ন ভাঙলে, কলসী থেকে জল গড়িয়ে ঘটি ভরে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাও।

এটা তার স্বপ্নের কাল। তাই সে অন্ধ।

সমুদ্রে, গঙ্গায়, হাটে বাজারে, সবখানে ছড়ানো আছে তোমার জন্যে এ-সব। সমুদ্রের মাছ মেরে তোমাকে যখন হাসানাবাদ কিংবা ক্যানিং-এর আড়তে যেতে হয় তখন দেখা যাবে। হাড়োয়ার মাঘ মাসের মেলায়, কত মেয়েমানুষ আসত। নিজেদের বিকিয়ে কূল পেত না তারা।

কিন্তু এখানে ওখানে তফাত আছে। মাছমারা তো শহরের কলকারখানার গঞ্জের নাগর নয়। ভিনগাঁয়ের কুকুরের মতো ল্যাজ গুটনো থাকে তার। শহরের রঙ্গিণীরা সেই চোখে দেখে তাকে।

এ পাড়ার পরে একটি কাঁচা ঘাট। এইবার নতুন পাড়া পড়ল গঙ্গার ধারে। কয়েক ঘর জেলে আছে, তারপরে আবার জঙ্গল। ওপরের দিকে কয়েকটি ছোটখাটো চাল-তামাক-কাঠের আড়ত, আবার পাড়া। এবার নৌকা নোঙর করতে হবে।

সারি সারি গাছ নেমে এসেছে কয়েকটা। আমগাছের পাশে তেঁতুল, তার পাশেই মস্তবড়ো বটগাছ। বুড়ো গাছ, জটা ছড়িয়েছে আশেপাশে। শিকড় বিস্তৃত হয়েছে গুঁড়ি মেরে মেরে। গঙ্গায় ছুঁয়েছে গিয়ে প্রায়।

নোঙর করবার আগে, বটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দামিনী। ফোগলা দাঁতে হেসে, রোদ আটকে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, ধলতিতের লোক এলে নাকি?

পাঁচু হাসল। পাড়ে গলুই তুলে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি পাঁচু এনু। চিনতে পারছ না?

দামিনীর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল পাঁচু। বলল, কী হল গো দিদি। চুল কেটে ফেলেছ, চেহারাখানিও কেমন রোগা রোগা লাগছে।

বলতে বলতে দেখতে লাগল পাঁচু। চুল পেকেছিল বটে বুড়ীর। কিন্তু তেল দিয়ে তাকে পেটো পেড়ে আঁচড়ানো থাকত আগে। অবশ্য, দামিনীর চুলও ছিল অনেক। বুড়ো বয়সেও ছিল চোখে মুখে কথা। গত বছরে একটু ভাঙন দেখে গিয়েছিল দামিনীর। কিন্তু ভাঙনটা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে।

বড়ো ডাকসাঁইটে ফড়েনী ছিল এপারের। ওপারেরও বটে। দুপারেই তার যাতায়াত ছিল। মাছের বাজারে যখন প্রকাণ্ড আঁশবঁটিখানি নিয়ে বসত দামিনী, তখন বাজার আলো করে বসত। রাত পোহালেই চান করে, একপিঠ চুল ছড়িয়ে দিয়ে বসত।

নাকখানি বেশ উঁচু ছিল। চোখ দুটি তেমন বড়ো নয়। কিন্তু ধার ছিল খুব। মস্ত আঁশবঁটিখানির সামনে মানাত তাকে। আঁশ-বঁটির ধার যত দেখতে ইচ্ছে করে তত ভয় হয়। দামিনী ছিল বাজারের তেমনি মেয়েমানুষ। সেও একখানি আঁশবঁটি। তাতে খান খান হয়ে কাটা পড়বার সাধ হত কত ভদ্র অভদ্র মাছের, কত না-জানি কেটেছে। অবশ্য সেটা বয়সকালে। তবে, বয়সে যার আলো থাকে, শেষদিকে সে অন্ধকার করে যায় না। দামিনীর বড়ো রকমের আসর ছিল বরাবর। গত বছরও দেখে গেছে পাঁচু।

দাদা নিবারণের সঙ্গে বড়ো হাসি-মশকরা ছিল দামিনীর। বিস্তর টাকা ফড়েনীর, বড়ো মহাজনের মতো। টাকা-ধারের কথা নিবারণকে বলতে হত না। দামিনী সেধে দিয়ে যেত। দিয়ে বলত ভ্রূ তুলে, হিসেবটা তুমি রেখো বাপু, ও আমার মনে থাকে না।

সাইদার নিবারণ। দামিনীর চোখের দিকে না তাকিয়ে বলত, তোমার বড়ো দয়ার শরীর। আমি মাছ মেরে খাই দামিনীদিদি। আমার কাছে এত বেহিসেবী হয়ো না তুমি।

সে দামিনী কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের দামিনী। নিজের প্রাণে ভয় ছিল না পাঁচুর, দাদার জন্যেই তার বুকের মধ্যে বড়ো ধ্বকধ্বক করত। আমরা মাছ মারি, সে বিক্রি করে খায়। শুধু খায় না, পুঁজিও অনেক। দাদার কখন কী মতিগতি হয়ে যায়, কে জানে।

তখন অবশ্য দামিনী আশ্বিনের গঙ্গা। দেহের স্রোতে নাবালেরই ঢল। শুকোবে শীগগিরই। কিন্তু সেই তো শেষ টান। ওই টানে পড়লে, পুরুষের উঠে আসা বড়ো দুষ্কর। কেন? না, ওটা ছেউটি মেয়ের শুধু পিরিতের ঝাঁজ নয়। সংসারের সব ঘাট-অঘাট-দেখা হৃদয় বড়ো গহন। তাতে জল বেশী। ঘূর্ণীও আছে।

দামিনী বলত, মাছের একটি আঁশও বঁটিতে বেসামাল হয়ে কাটি

নে। পাল্লার ওজনে আমার নিক্তির ওজন। বেহিসেবী বলে আমাকে কেউ দুর্নাম দিতে পারবে না নিবারণদাদা।

নিবারণকেও সে দাদা বলত। কথায় পারা নিবারণের কর্ম ছিল না। বলত তোমার হিসেবে ভুল না হয়, আমার যদি হয়।

দামিনী বলত, হয় তো হবে। তার জন্যে তো তোমায় কেউ মারতে আসছে না গো। তুমি সেয়ানা মানুষ। সোমসারে সেয়ানা মানুষের বেবভুল হওয়া দেখলে ভালো লাগে।

নিবারণ হাসত। প্রাণে কী হত, কে জানে। পাঁচুর বুকে লাগত সমুদ্রের হাঁকা। ঘরে রয়েছে বৌঠান, ছেলেমেয়ে। তার বুকের মধ্যে উঠত দখনে বাওড়ের ডাক।

কিন্তু সুখে দুঃখে কাটিয়ে গেছে নিবারণ। মাছমারারা নানান কথা বলেছে। তবে মনে-প্রাণে জানত সবাই, মাছ মারতে এসে নিবারণ মালো ছিল খাঁটি মানুষ।

সেই দামিমী। গত বছরও একেবারে সোজা না হলেও অনেকখানি খাড়া দেখে গেছে। এখন, বুড়ী ঝুঁকে পড়েছে একেবারে। রোগা ডানায় আছে অবশ্য সেই সোনার অনন্ত। হাতে বালা, গলায় হার। তবে, সবই যেন কেমন বেমানান, নড়বড়ে, ঢলঢলে দেখাচ্ছে। নাকে এখনো আছে পাথর-বসানো সেই নাকছাবিখানি! কিন্তু নাকটি এবার ঝুলে পড়েছে। তেমন তোলো নেই আর।

বিলাস নোঙর করল নৌকা। পাঁচু নেমে এল নৌকা থেকে।

দামিনী কাছে এসে বলল, চিনতে পারছি বৈ কি। চিনব না! তোমরা কি আমার আজকের মানুষ। চুল আর রেখে কী হবে বল। অনেক বয়স হল। কে আর চুলের সেবা করবে। তাই কেটে ফেলে দিয়েছি। তোমাদের সম্বাদ ভালো তো?

পাচু বলল, ওই একরকম। ভালোর কাল অনেকদিন চলে গেছে দামিনীদিদি।

বলে একটি নিশ্বাস ফেলল পাঁচু। দামিনীও নিশ্বাস ফেলল। ফেলে, দুজনেই যেন একবার ভালোর কালটিকে পিছন ফিরে দেখে নিল।

একজনের সঙ্গে সবই চলে গেছে যেন। সেই একজন নিবারণ। আসলে বোধহয় তাদের যৌবন।

কিন্তু দামিনী বলল, তা কেন যাবে। যাওয়া-আসা আছেই সংসারে। আবার আসবে! ভাইপো তো মরদ হয়ে উঠেছে। আর কী!

তা ঠিক। মানুষের কথার মধ্যে তুমি সত্য খুঁজে পাবে। যাওয়া-আসা আছেই সংসারে। আবার আসবে! দামিনীর সঙ্গে পাঁচুও তাকাল বিলাসের দিকে। হ্যাঁ, মরদ হয়ে উঠেছে। অনেক দিনই উঠেছে।

বিলাস বলে উঠল, আন্ কথা রাখো এখন। আমাকে আবার তিবড়ি জ্বালাতে হবে। যা করবার, তা করে নাও।

কী মাকড়া ছেলে। বছর ঘুরে দেখা। মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলতে দে। তা নয়, ওই যে দুজনে তাকিয়ে রয়েছি ওর দিকে, তাইতে ওঁয়ার শরম লেগে গেছে। তা ছাড়া মন-মেজাজও সেই রকমই হয়েছে আজকাল। নিজের ভাবই খুঁজে পায় না ছোঁড়া। তা আবার পরের ভাব।

দামিনী বলে উঠল, কেন গো, খিদে আর মানছে না বুঝি?

বিলাস পষ্টই জবাব দিল, না।

পাঁচু বলে উঠল, তুই থাম। তিবড়ি জ্বালাতে হয় জ্বালা গে।

দামিনী বলল, আমাকে রসিক বলে গেল, তোমরা এসেছ। শুনলুম, এসেই জাল ফেলেছ ওপারে। সেই থেকে বসেই আছি।

মন থেকে তোমাদের কোনোদিন অবিশ্বাস করি নি। তা এখন আবার কী হয়, তাই দেখো।

পাঁচু বলল, কেন গো, আবার হবে কী?

দামিনী একটু এদিক ওদিক তাকাল সন্ত্রস্তভাবে। পাঁচুর মনটিও হাঁসফাঁস করে উঠল। দামিনী কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, আমার মেয়েটা মারা গেছে, বুইলে ভাই।

বলতে বলতে দামিনীর গলার স্বর ভেঙে গেল। কয়েক মুহূর্ত কান্না রোধ করে বলল আবার ফিসফিস করে, এখন সবকিছুর মালিক আমার নাতীন। ব্যবসা সবই তার হাতে। বড়ো মেজাজী মেয়ে, বুইলে দাদা, বড়ো রাশভারী। বয়স কাঁচা। বাজারে বড়ো একটা যায়-টায় না। যদ্দিন আমি ছিলুম, আমি গেছি। তা তোমাদের কাছে তো কিছু লুকোছাপা নেই। ওর মা, আমার মেয়ে, বুইলে, কাঁচা বয়সে বেধবা হয়ে রাঁড় হয়েছিল। সে অবিশ্যি বেঁচে থাকলে, এ বছর থেকে বাজারে যেত মাছ বেচতে। নাতীনেরও আমার সুরাহা হত একটা। তা ভগবান দিলে না। পেছনে ঘুরছে এখন ছুঁড়ীর দশগণ্ডা পুরুষ। ঘুরুক, মেয়ে চট করে টোল খাবে না। পাড়ারই একজনকে দিয়ে বাজারের কাজ চালায়। আমিও যাই। বুইলে দাদা, নাতীন আমার হাতে নয়। তোমাদের কথা আমি তাকে বলেছি। বলেছে, চিনি নে শুনি নে, ধার-দেনা দিতে পারব কিনা বলতে পারি নে। দেখি আগে, আসুক। আমাকে মাল দিক।

বলে আবার এদিক ওদিক তাকাল। মনটা বড় দমে গেল পাঁচুর। দামিনীর নাতনীর কাছে তার জীবন বাঁধা নেই। জীবন তার এ জলে বাঁধা। তবু, দামিনী সহায় ছিল। বুকে বল ছিল অনেকখানি। গঙ্গা নির্দয় হলে মুখ তুলে চাইবার ছিল একজন। বিশ্বাস করত মনে-প্রাণে।

বিলাস বলে উঠল, অত কথায় আমাদের কী দরকার! তোমার নাতীনের কাছে তো আর আমরা খত লিখে দিই নি।

পাঁচু ধমকে উঠল, তুই থাম দিকি গুয়োটা।

দামিনী বলল, এখন দিচ্ছ না বটে, কিন্তু দিয়েছেলে তো। আমি যে পঞ্চাশ ট্যাকা পাই, তাতে আর আমার হাত নেই। আমার মেয়ের টাকা ছেল সে-সব। শোধ নেবে আমার নাতীন।

বলে আবার ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল দামিনী, তবে একটা কথা বলে দিই আগে। আবার নাতীন জানে, তুমি পঁচিশ ট্যাকা ধার। বাকি পঁচিশ ট্যাকা তুমি আমাকে লুকিয়ে শোধ দিও দাদা। খবোদ্দার, নাতীনকে বোলো নি যে, তা হলে নিয়ে নেবে।

ইতিমধ্যে এসে ভিড়ল কেদমে পাঁচুর নৌকা। দামিনী চোখ তুলে দেখে বলল, তোমাদের গাঁয়েরই তো?

—হ্যাঁ।

দামিনী হঠাৎ বিলাসের দিকে ফিরে বলল, তোমার ভাইপো দেখছি ওর বাপের মতোই হয়েছে। চেহারায় তো বটেই—কথায়, চালচলনে, ব্যবহারেও। একটু দুঃখে হেসে বলল আবার, মনটা খারাপ ছিল একদিন, কী একটু বলেছিলুম নিবারণদাদাকে। তা বললে আমাকে, দামিনীদিদি, নৌকাখানি রেখে গেলুম, ওতে তোমার দেনা শোধ হয়ে যাবে। এত কথার ধার ধারি নে। শোনো কথা। আমিও রেগে বললুম, হ্যাঁ, আমার ঘরে দশটা মাঝি পোষা আছে কিনা। তুমি নৌকো রেখে গেলেই হল। নৌকো নিয়ে আমি করব কী?

তা কি শোনে! তোমার হাত ধরে উঠে এল ডাঙায়। বলল, চল রে পেঁচো। নিকুচি করেছে তোর আন্ কথার। তুমি ভালো-মানুষ।

দাদার সঙ্গে সুড়সুড় করে উঠে এলে। শেষ আমাকেই মুখ ছোটাতে হল। যত রগচটাই হোক, আমার মুখের সঙ্গে পারবে কেন। তা ছাড়া, দামিনীর মনখানি তো জানত। নৌকো ভাসিয়ে চলে গেল মাছ ধরতে।

বলে, দামিনী চুপ করে তাকিয়ে রইল জলের দিকে।

পাঁচু বলল, তোমার সব কথা মনে আছে দামিনীদিদি।

—থাকবে না! সে-সব কি ভোলবার।

বলে একটি নিশ্বাস ফেলে হেসে বলল, তোমার ভাইপোটি দেখছি সেই রকম হয়েছে।

হ্যাঁ, বাপের ব্যাটা হয়েছে। মালোর ছেলে তো। মেজাজে না মানলে মাথা ঝাঁকিয়েই আছে।

দামিনী আবার বলল, হ্যাঁ, আর-এক কথা পাঁচুদাদা। আমাদের রসিক বড়ো খুশে গেল তোমার ভাইপোকে। বললে, 'তোমার পাঁচুকে একটু বলে দিও মাসী, এখানে মাছ ধরতে এসে আমাদের চোখ রাঙিয়ে যাবে, তা হবে না।' বললুম, কেন রে, কী হয়েছে। বললে, 'পাঁচুর ভাইপোটিকে বড়ো তেরিয়ান দেখলুম। ছোঁড়ার যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা। বলে দিও, জিভখানি টেনে বার করে লোব।'

বিলাস ফোঁস করে উঠল কাঁড়ার থেকে, কোথায় গেলেন সেই বাপের ছাওয়াল, জিবখান টেনে স্থে যাক।

—চুপো!

ধমকে উঠল পাঁচু। দামিনীকে বলল, হ্যাঁ, ভাইপোর আমার মুখ ভালো না ঠিক দামিনীদিদি। কিন্তুন্, রসিককে তো তুমি জান।

দামিনী বলল, ছাড়ান দাও ও-সব। ও হারামজাদাকে জানি নে আবার? বড়ো তেল হয়েছে ওর আজকাল। আমার নাতীনের জন্যে

বাবু ধরে নিয়ে আসে, বুইলে? বড় বাপের ব্যাটা কিনা! নাতোন একবার চোখ তুলে তাকালে তো কেঁচো।

এইবার গলা চড়াল দামিনী। বলল, না, আর দেরি করব না। জাল ফেলে কিছু পেলে?

পাঁচু বলল, পেয়েছি। জলেঙ্গা জলের কিরপা হয়েছে দামিনীদিদি। নিশানা পেয়েছি ভালোই। তবে, তোমার কথা শুনে মনটা এট্টুস কেঁপে উঠল। অবিশ্যি, গঙ্গার কিরপা থাকলে সব ভালো। জল দিলে, ডাঙাও দেবে। সে তোমার লাতীন না হোক, আর-কেউ দেবে।

বিলাস বাঁশের ত্বফালি পাটাতন সরিয়ে মাছ বের করে দিল। রেখে দিল ত্বটি খয়রা।

মাছ দেখে দামিনীর খুশি 'আর ধরে না। ও মা! এ যে ডিমেল ইলিশ গো। সেরটাকের বেশী হবে বোধ হয়। আহা, জামাইষষ্ঠীর সময় পেলে, চার টাকা সের বিকোত। তা এখনো তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা সের তো যাবেই।

মাপা হল। দাঁড়িপাল্লা রয়েছে নৌকাতেই। মাছ শুধু মারলে হবে না, ত্নন দিয়ে ভাত খাওয়ার মতো পাল্লাটি তোমাকে রাখতে হবে সঙ্গে। কষ্ট করে পাওয়া কেষ্টকে ওজন করে ছাড়ো।

বড়ো ইলিশটি এক সের তিন ছটাক হল। ছোটোটি আড়াইপো।

দামিনী বলল, দাঁড়াও। নাতীনকে ডেকে নিয়ে আসি। পেথম দিনকার মাছ তোমাদের। সে কিনে নিক, আমি বেচে আসব।

দামিনী ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল ওপরে। তেঁতুলগাছের গোড়ায় গিয়ে চীৎকার করে ডাক দিল, হিমি, অ'লো অ' হিমি—।

বিলাস বলে উঠল, হাতের লোক ছেড়ে এসে এখন শোনো দিদিমা-লাতীনের বিত্তান্ত।

পাঁচুর মনটাও খারাপ হয়ে পড়েছিল। তবে, মহাজন নিয়ে কথা। এরাও তোমার মহাজন। দুর্দিনে তোমাকে দিয়েছে, দেবেও দরকার হলে!

মহাজনের জাল, মাছমারার প্রাণে জড়িয়ে আছে সব সময়।

একটি বছর ছয়েকের মেয়ে এসে দাঁড়াল উপরের আমগাছের কাছে। বলল, কাকে ডাকছ গো?

—আমাদের হিমিকে।

একটি চিল-গলা চেঁচিয়ে উঠল পাড়ার মধ্যে, ও হিমি মাসী, তোমার দি-মা ডাকছে।

একটু পরে এসে দাঁড়াল একটি মেয়েমানুষ। সেই উঁচুপাড়ের আমগাছের গোড়ায়। যেন চড়া-সুরে-বাঁধা তারে টঙ্কার পড়ল আলতো করে। শোনা গেল, কী বলছিস দি-মা।

দামিনী বলল, মাছ নিবি আয়।

—আ মরণ! রান্না চাপিয়েছি যে ওদিকে।

বলতে বলতেও নেমে এল হিমি।

গায়ে জামা নেই। একখানি শাড়ি পরে এসেছে। গাঢ় নীল দক্ষিণের সমুদ্রের মতো। তার ওপরে ছড়ানো সাদা রঙের ফুল। যেন সোনার মতো সোনা খড়কে মাছ ছিটিয়ে দিয়েছে। গায়ের রঙটি কটা কটা। খোলা চুল বাঁধা আছে আলগা করে। চোখ-মুখ একরকম। দেখে মনে হয় বটে, একটু যেন ভাব-গম্ভীর মেয়ে। গড়নটি একটু ছিপছিপে। হাতে গলায় নাকে কানে সোনাও আছে। সাতরকম মিলিয়ে দেখতে ভালোই। বয়স কত আর। দেখে মনে হচ্ছে, ছেলেপুলে হয় নি আজো। গড়ন-পিটনে একটু ছেউটি ছেউটি। অর্থাৎ শরীরখানি অকূল হয় নি, কূলের মুখে এসে থমকে আছে। বর্ষা এলে ভাসবে অকূল পাথারে। আন্দাজে বলা যায় বাইশ-চব্বিশ হবে। কিন্তু

সিঁদুরের দাগ নেই কপালে সিঁথেয়। এ কি বেওয়া না আইবুড়ো বোঝবার যো নেই।

কোমরে হাত দিয়ে এসে দাঁড়াল নাতনী দিদিমার সঙ্গে। পাঁচুর মনে হল বয়সকালের দামিনীকে দেখছে সে। অবশ্য, ওই বয়সের সময় সে দামিনীকে দেখে নি কোনোদিন, তবে ছায়াখানি রয়েছে।

হিমি ভ্রূ কুঁচকে তাকাল খুড়ো-ভাইপোর দিকে।

দামিনী বলল পাঁচুকে, আমার নাতীন, বুইলে দাদা। অ্যাদ্দিন আমাকে দিয়েছ, এবার আমার নাতনীকে দিও। দুদিন কাজকারবার করলেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। একে অপরের সুখ-সুবিধে দেখবে। তোমরা ছাড়া আমরা নই, আমরা ছাড়া তোমরা নও।

পাঁচু হাসল। সারা মুখে ঢেউভাঙা উপকূলের সর্পিল দাগ। পুরু ঠোঁট দুটি ফাটা-ফাটা। জল বাদা সমুদ্র বোঝে। শহর-ঘেঁষা ডাঙার মানুষের সবটুকু ঠাহর করতে পারে না। একদিন দামিনীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তবে, সে দামিনী ছিল ফড়েনী। দামিনীর নাতনীকে ঠিক তেমনটি লাগছে না। তা হবে হয় তো। দামিনীর নাতনী একটু অন্যরকম। মানুষ তো সবাই সমান হয় না।

হিমি ভ্রূ কুঁচকে বলল, দি-মা, এ বুঝি তোর সেই বসিরহাটের লোক?

দামিনী বলল, হ্যাঁ।

পাঁচু বলে উঠল, হ্যাঁ, তা সে বসিরহাটেরও বলতে পার। ওই তল্লাটেরই লোক আমরা। আমরা ধলতিতের লোক।

হিমি তাকাল বিলাসের দিকে। তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আবার তাকাল। নাকের নাকছাবিটি বোধহয় কেঁপেও উঠল বার দুয়েক।

বিলাস দাঁড়িয়ে ছিল গলুয়ের সামনে, পায়ের কাছে মাছ নিয়ে। তাকিয়ে ছিল হিমির দিকে। কালো কুচকুচে পুরুষ, গায়ে তখন ঘাম দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু। তাকিয়ে ছিল খানিকটা হাবাগোবা ছেলের মতো। আগ্রহ কিছু থাকার কথা নয় বিলাসের। পুবের মাছমারার মতোই অবাক হয়ে দেখছিল দামিনীর নাতনীকে।

ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে একটু ছোঁড়ার। অমন করে তাকিয়ে দেখছিস কী তুই! সামনে তোর অচেনা মেয়েমানুষ। গেঁয়ো গাড়লের মতো তাকালে চলে না। সহবত জানা দরকার। হিমির ভ্রূ দুটি তার গম্ভীর মুখে বিদ্যুতের মতো চিকচিক করে উঠল একবার। অপাঙ্গে দেখল বিলাসকে। বলল, এটি কে?

পাঁচু বলল, আমার ভাইপো বিলাস।

বিলাস যে এতক্ষণে আবার মনে মনে খেপেছে, টের পায় নি পাঁচু। বলে উঠল, মাছ বিকোতে এয়েছ, না, কুটুম্বিতে করতে এয়েছ, বুঝলুম না। ওই করো এখন বসে বসে। আজ আর তিবড়ি জ্বালিয়ে দরকার নেই।

পাঁচুর সহ্য হল না। বলে উঠল, হারামজাদা, পেটে কি তোর দানো ঢুকেছে রে, অ্যাঁ? মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শিখিস নি গাড়ল কমনেকার। যা, কাঁড়ারে গে বসে থাক গে চুপ মেরে।

বিলাস আর-একবার হিমির দিকে তাকিয়ে, মাছ আর পাল্লা নামিয়ে দিয়ে গেল পাঁচুর কাছে। গলা একটু খাটো করে বলে গেল, এত যখন মাখামাখি, ত্যাখন আর শুধু বিলেস কেন, তৈতলে বিলেস, সেটাও কানে ঢুক্‌কো দেও।

পাঁচুর বুড়ো পেশীতে ঢেউ খেলছিল। রাগে জ্বলছে বুকের ভেতরটা। যত অসহায় রাগ পাঁচুর, তত ব্যথা। এ সর্বনেশেকে দিয়ে জীবনের কোনো সাধ মিটবে না। হিমির দিকে ফিরে বলল,

কিছু মনে কোরো না গো ভালো মানুষের মেয়ে, ছোঁড়া যে শোরের লাতি!

শোরের লাতি। বিলাসের ব্যবহারে মনের মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠেছিল হিমির। মন তো দেখা যায় না। মেয়ের চোখের কোণে ধিকি ধিকি আগুন দেখা গেছে। কিন্তু পাঁচুর গালাগালি শুনে হিমির মনের আগুনে জল পড়ল। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নিঃশব্দ হাসির ঢেউয়ে কেঁপে উঠল শরীরের কূল। চোখের কোণ দিয়ে আর-একবার দেখল বিলাসকে। বিলাস তখন সত্যি গিয়ে বসেছে কাঁড়ারে, একেবারে গঙ্গার পুবমুখো হয়ে। গাব-আঠা-মাখানো কালো কাঁড়ারের উপরে যেন রঙ-করা দারুমূর্তি। কী কালো! যেন কেউটে বসে আছে ফণা তুলে।

কী দেখে দামিনীর নাতনী অমন করে! দশ রকম কথা মনের মধ্যে আনচান করে উঠল পাঁচুর। বলল, মাছ ওজন করে দিয়েছি। আবার করতে হবে নাকি গো?

এতক্ষণে নজর পড়ল হিমির মাছের দিকে। দেখে আর খুশি ধরে না। বড়ো মাছখানি হাতে তুলে নিয়ে বলল, আহা, বেশ মাছটি, ছাখ দি-মা। আষাঢ়ে এত বড়ো ইলিশ বড়ো-একটা দেখা যায় না।

হ্যাঁ, ওই কথাটি শুনতে চায় পাঁচু। বলে উঠল, দেখা যায় গো মেয়ে, দেখা যায়। মাছের মন, সে এসে ধরা দিলে, এর চ্যে অনেক বড় পাওয়া যায়। তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করো, তাও দিয়েছি।

হিমি বলল, তা এই যথেষ্ট হয়েছে আমার।

দামিনী বলল, নে, আর দেরি করিস নে। রান্না বসিয়ে এসেছিস বললি। এদেরও তুটো ফুটোতে হবে এবার। সারারাত তো বাইতে হয়েছে নৌকো!

বলে দামিনী চুপড়িতে মাছ তুলে নিয়ে আবার বলল পাঁচুকে, আড়াই ট্যাকা হিসেবে দেব ভাই। পেত্থমকার দিন, তোমার একটু কম হল। আমি তিন ট্যাকায় বিকোব বাজারে। রাগ করলে না তো?

দামিনী পাইকের মেয়েমানুষ। কাকে কী বলতে হয় জানে! পাঁচু বলল, তোমার সঙ্গে তো কোনোদিনও দরাদরি করি নি দামিনী-দিদি। যা তোমার মন চেয়েছে, দাও।

হিমি বলল, পেত্থমকার দিনে কম দিবি কেন দি-মা। এগারো সিকে করে দে। টাকা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

জলেঙ্গা জলের নিশানা ভালো। দামিনীর নাতনীর মনটিও যেন ভালো ভালো লাগে। যে মাছ মারে, মেরেই তার মনের সবটুকু ভরে যায়। হিসেবে যদি একটু বেশী হয় তবে ষোলো আনার উপরে মন উপচে পড়ে। সেটা তোমার সুকৃতির ফল। ভালো, দামিনীর নাতনী ভালো। বয়সকালে মানুষের মন একটু দরাজ থাকে। দামিনীরও ছিল এককালে। নিজের লাভে দু আনা কম রেখে, দিয়েছে মাছমারাকে। আজ তার নাতনীও দিতে চায়।

ভালো। মেয়ে একটু বেপরোয়া। সেটা হতে পারে। যেমন গাছের যেমন ফল। সিঁথেয় কপালে সিঁদুর আছে কি নেই, সেটা দেখে লাভ নেই। মায়ের বৃত্তান্ত শুনেছ। হতে পারে, মেয়ে কড়ে রাঁড়ি। নয় তো, মন চায় নি, তাই বিয়ে করে নি। হাতে পয়সা আছে, গায়ে গহনা আছে। বাজারে মাছের ব্যবসাও আছে। সে কথা বলতে পারে দশটা লোকের উপর। নিজের ভালোমন্দ সে নিজে বোঝে। চালচলন একটু অন্যরকম হবেই। তা দিয়ে তোমার কোনো দরকার নেই। তুমি মাছ মার। মহাজনের ভিতরে কী আছে, তা তুমি দেখতে যেও না।

হিমি বলল, হ্যাঁ দি-মা, তুই কি এখুনি বাজারে যাবি মাছ নিয়ে ?

দামিনী বলল, এখন কি আর বাজারে লোক আছে ? বাজারে যাব না, মাস্টারবাবুর বাড়ি যাব। ওঁর ছেলের বউয়ের আজকে সাধ খাওয়া। গঙ্গার মাছ দেখে বুড়ো মাস্টার খুব খুশী হবে।

হিমি বলল, বাবা গো বাবা, সে-কথাটি ভুলিস নি দেখছি। দামিনী বলল, নিজের সাধ-আহ্লাদ না মিটুক, পরেরটা যতটুকুনি পারি, ততটুকু না মেটাব কেন ?

হিমি চুপ করে গেল ঠোঁট টিপে। বোঝা গেল, দামিনী নাতনীর কথা বলছে ঠারে ঠোরে। নাতনী বিয়ে-থা করে না, ঘর বাঁধে না, সাধ মেটে না বুড়ীর।

দিদি-নাতনী উঠে গেল উপরে। নাতনী দুবার পিছন ফিরে তাকিয়ে গেল আবার বিলাসের দিকে। চোখে ঠোঁটে চমকে চমকে উঠল হাসি। ভালো বলতে হবে। রাগ করতে পারে নি। বরং একটু মজা পেয়ে গেছে।

তবে হ্যাঁ, ছেলেটার উপর রাগ করে লাভ নেই। দেখো, কেমন ফড়কে গিয়ে বসে আছে কাঁড়ারে। সেই কোন্ রাতে কাল খেয়েছে। তারপরে খাটুনিটা কিছু কম যায় নি।

বলল সে, এখন কাঁড়ার থেকে এদিকে আয়। এসে কী কম্‌নে করবি, করে নে। ঘরের বাইরে এয়েছিস, দশটা বাইরের লোকের সঙ্গে তোকে ভালো করে কথাবার্তা কইতে হবে। একটু খিদে-তেষ্টা সহ্য করতে হবে। না কী বল হে কদম পাঁচু ?

পাশেই রয়েছে কদম পাঁচুর নৌকা। সে এসেছে তার দুই ছেলে পরান আর সুবীনকে নিয়ে। তাদের তিবড়িতে এতক্ষণ ভাত চেপে গেছে। কেদমে পাঁচু বলল, হ্যাঁ, তা বটে। বাইরে বিদেশ-বিভুঁয়ে আসা। বলা তো যায় না কে কেমন লোক।

বলে একমুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল, আমার ভাবেও বেশী দরকার নেই, রাগেও বেশী দরকার নেই। ও দুটোই খারাপ।

কথাটা যেন কেমন বলল কেদমে পাঁচু। কেদমেকে ভালোবাসে পাচু। পাশের গাঁয়ের মানুষ, পেট থেকে পড়ে চেনাশোনা। মনটা একটু-আধটু বোঝা তো যায়। কথার মধ্যে যেন কেমন একটা সুর রয়েছে।

রয়েছে। কেন রয়েছে, তাও জানে পাচু। দামিনী আর তার নাতনীর সঙ্গে একটু বেশী ভাবের লক্ষণ দেখেছে কেদমে। সেইটে সাবধান করে দিল। ভালো, তার দরকার আছে। কিন্তু শরীরে হিংসে রেখে কিছু বোলো না। তাতে তোমার নিজের ভালো না। পরের ভালোও নয়। যখন গঞ্জের মহাজন বোজন ঠাউর (ব্রজেন ঠাকুর) আসবে, তখন কেদমে কত আত্মীস্বয়তা দেখাবে। কেমন আছেন ঠাউরমশায়, বিত্তান্ত সব ভালো তো। এজ্ঞে, আপনাদের দয়ায় বেঁচে আছি। কত কথা বলবে। পরিবর্তে কত মন্দ কথা শুনবে। কত বায়নাক্কা রাখতে হবে ঠাকুরের। কম করে পাঁচ-সাত গণ্ডা পুবের মাছমারা ঠাকুরের কাছে ধারে। মেয়েমানুষ বলেই অবশ্য কেদমের ভয় লেগেছে। কেন? না, মানুষের মন। তুমি সামলাতে না পারলে বিপদ হবে।

তবে কী, না, পাইকের-মহাজনের জাত নেই। মেয়ে-পুরুষ নেই তার। সে পারলে তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। দামিনী তো নতুন নয়। পাচু যে জীবনভর দেখে এল এদের।

বলল, নিচ্চয় খারাপ, খুবই খারাপ। যা করতে এয়েছি করে যাব। ভাবে রাগে পেয়োজন কি। না, আমি বলছি, খিদেতেষ্টা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করলে কি মাছমারার চলে?

মুখ না ফিরিয়েই কাঁড়ার থেকে ফোঁস করে উঠল বিলাস, কেন, খিদেতেষ্টা ন্যে তোমার পেছনে কি বিলেস কাটি মেরে বেড়াচ্ছে ?

শোনো হারামজাদার কথা। জবাব দেবার আগেই বিলাস আবার বলে উঠল, আমার খিদের মুখে তো খুব ছাই ঢালছ, বলি তোমার বুড়ীর লাতীনের ভাবখানা কেমন ? য্যানো একেবারে বাবুর বাড়ির কন্যে এলেন আর কি ! কেন, তোমার খাই না পরি। লবাবের বিটীর মতো হাবভাব কথা—। আর তার কাছে তোমার অত পরিচয় পাড়াই বা কেন ?

ও, মানে লেগেছে মালোর। মালোর ব্যাটা মালো, ও যে ঘাড় বেঁকিয়েই আছে ! নিবারণ সাইদারের ছেলে তো। বলল, নে নে, শহরের ফড়েনী কি ঐটুটুস ফসটি-নসটি করেছে, তাই নিয়ে আবার গোঁসা। মাছমারাদের পরে ফসটি-নসটি করবার মেলাই লোক আছে শহরে, তার জন্যে কিছু মনে করতে গেলে চলে না। তুই দিবি তিবড়িতে আগুন, না আমি দেব ?

নৌকা দুলিয়ে উঠল বিলাস কাঁড়ার থেকে। বলল, দিয়ে তো আবার দশটা কথা শোনাবে।

তিবড়ি নিয়ে বসল বিলাস। মনটা তো ভালো ছোঁড়ার। তবে এত খোলাখুলি ভালো নয়। শাস্ত্রে বলে, মাছমারাদের বাপ ঠাকুর্দাও বলে, কথা কম বলো।

একটি লোক নেমে এল উপরের পাড় থেকে। এসে ডাকল, কই গো পাঁচু।

ছইয়ের মধ্যে ঢুকেছিল পাঁচু চাল বের করবে বলে। গলা শুনেই চিনতে পারল, দুলাল এসেছে। বলল, এসো দুলাল, এই চালটা মেপে ন্যে যাচ্ছি।

দুলাল নৌকোয় উঠে এল।

দেখলে মনে হয়, কেমন একটু ভাবের ঘোরে দিশেহারা মানুষ এই দুলাল। এই উপরের পাড়াতেই থাকে। দামিনীর পড়শী, পাশে আতরবালার বাড়ির মানুষ। ফড়েনী আতরবালা, মাছ বিক্রি করে বাজারে। বাজারে নিজে বসে মাঝেসাঝে, দুলাল বসে রোজ। আতরের বাড়ি, আতরের ঘর, তারই ব্যবসা, কাজ করে দুলাল। দুলাল স্বামী নয়, আতরবালার মানুষ।

বাজারে আতরের জায়গায়, তার আঁশবঁটিতে, তার মাছ কেটে বিক্রি করে দুলাল। পয়সা বাঁধে আতর নিজের আঁচলে। দুলাল আতরের খায়, আতরের পরে, আতরের ঘরে শোয়।

কিন্তু তারা কেউ কারুর নয়। এই বড়ো বিপরীত রীতি উপরের পাড়ার। মাছমারার জীবনের সঙ্গে ওই পাড়ার আর কোনো যোগ নেই। শুধু দেয়া আর নেয়া। তবু এই পাড়ের নিচে বাস। আর দেয়া-নেয়া, সেও যে জীবনের অনেকখানি। তাই এ চেনা-অচেনার তলায় বসে বড়ো ধুকুধুকু করে বুকের মধ্যে।

কথায় বলে, সংসারে বাস করছ, দুটিতে মিলে একটি গেরো বেঁধে রাখো। ফাঁসকলের গেরো নয়, প্রাণের গেরো। জগতে ওইটি দরকার। সংসার বড়ো বিস্তৃত, মানুষের দিশা থাকে না। চলতে ফিরতে টান পড়বে ওই গেরোতে। দিশা ফিরে পাবে তুমি।

আতর সধবা নয়, বিধবা নয়, শুধু ফড়েনী। দুলাল কাজ করে, খায়, মেয়েমানুষের সঙ্গেও থাকে। কারুর স্বামী নয়, বাপ নয়, পেট-ভাতায় কিসের গেরোতে বাঁধা আছে আতরের সঙ্গে, দেখা যায় না।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফেরার ঘর নেই তার। ডেকে নেওয়ার মানুষ নেই। আতরেরও নেই কেউ সাঁঝবেলায় ঘরে ফেরার। কেউ কারুর অপেক্ষায় নেই। যেদিন খুশি দুজনে দুজনকে ছেড়ে, দুদিকে চলে যেতে পারে।

তবু আতর ফড়েনী। তার টাকা আছে, ঘর আছে। মেয়েমানুষের স্বাধীন জীবন আছে। আর আছে 'বয়সকাল। তার দাম আছে, সে বিকোয় ভালো, বিকোবেও।

পুরুষ হয়ে কী দামে বিকোচ্ছে দুলাল নিজেকে, ভেবে পায় না পাঁচু।

কিন্তু মানুষটি বড় ভালো। নেশা-ভাঙ করতে চোখে পড়ে না। তবু চোখ দুটি অষ্টপ্রহর রক্তফুলের মতো লাল। বয়স এমন কিছু নয়, দেখায় একটু বেশী। পাঁচুর চেয়ে অনেক ছোটো। কিন্তু বরাবর ডেকে এসেছে নাম ধরেই। বেমানান লাগে না। রঙটা বোধহয় ফরসা ছিল, এখন ঘোর তামাটে। আর পাঁশুটে লোমে ছাওয়া গোটা শরীর। কেমন একটু হাসি মুখে লেগেই আছে সর্বক্ষণ। অমন হাসিটি কারুর মুখে কোনোদিন দেখে নি পাঁচু। যার কেউ নেই, কোথাও যাবার নেই সে-ই বোধহয় অমনি করে হাসে। আর কথা বলে বড়ো আস্তে।

বিলাস তিবড়িতে আগুন দিচ্ছিল। দুলাল বলল, কি গো, খুড়ো, কী বলেছ তুমি? আমার ছোটো মাসী ঘরে গ্যে যে আর হেঁসে বাঁচে না।

লোকটিকে ভালো লাগে বিলাসেরও। ওই 'খুড়ো' ডাকের মধ্যে কোথায় একটি খাঁটি দরদের সুর আছে। সে ডাকে দুলাল খুড়ো বলে। বলল, তোমার ছোটো মাসী আবার কে?

—কেন, দামিনী আমার বড়ো মাসী, তার লাতীন আমার ছোটো মাসী।

ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচু। হাতের মালসায় চাল। মালসার চেয়ে গাঢ় তার রঙ। বলল, কী বলছ দুলাল?

দুলাল বলল, বলছি বলে, আমার খুড়োর কথা স্মে ছোটো মাসী

ঘরে গ্যে হাসছিল। তাই বলছি আমার খুড়োকে, কী বলেছ তুমি? ছোটো মাসীর এত হাসি কেন?

পাঁচুর কুটো-কাটি মুখখানিতে হাসি ফুটে উঠল। যাক, দামিনীর নাতনীর প্রাণে তা হলে বিষ নেই। ছোঁড়ার ভাবটা বুঝেছে। বলল, মাকড়াটার যে রকম রকোম। বুদ্ধিসুদ্ধি তো নেই! ওর কথা শুনলে লোকে হাসবে না তো কাঁদবে নাকি?—কেমন আছ দুলাল?

—ভালো। তোমাদের সব ভালো তো?

ভালো ছাড়া মন্দ নেই দুলালের। পাঁচু বলল, হরির কিরপায় বেঁচে-বর্তে আছি ভাই। এখন যা করেন, মা গঙ্গা।

—তা বটে। এনার হিদয়খানি বড়ো ছোটো হয়ে পড়েছে কি না। সরকার বাহাদুর না কাটালে আর ঠাঁই পাওয়া যাচ্ছে না।

—ঠিক, খুব ঠিক কথা বলেছে দুলাল। হৃদয় গহীন না হলে আর চলছে না। বড়ো অগভীর হয়ে পড়েছেন ভগবতী। তাই এখানে জল নেই, তো আর-একখানে মানুষ-খাওয়া ঘূর্ণি। একদিকে মাটি এগিয়ে আসে তো আর-একদিকে ঘরবাড়ি খায়।

মাছমারার প্রাণের কথা বলেছে দুলাল।

পাঁচু বলল, আতরদিদি কেমন আছে দুলাল?

তেমনি হেসেই বলল দুলাল, ভালো না। বিশ-তিরিশটা পান খায় রোজ। একুনে একবার মিলিয়ে দেখো, কত পান। ভাত খাবে কোন্ পেটে। তার সঙ্গে দোক্তা-জর্দা আছে, সাঁজবেলায় একটু ভাজা মদ না হলে থাকতে পারে না। এ মানুষের শরীর কখনো ভালো থাকে?

পাঁচু বলল, তা বটে।

এর বেশী কথা যোগায় না। কিন্তু দুলালের মুখটি দেখে বড়ো

মায়া লাগে। ভয়ও করে। দুলালকে নয়, ওই [illegible]নকে। বেশী কিছু তো সে বলতে পারে না।

দুলাল হাত বাড়িয়ে টাকা দিল পাঁচুকে, নাও, ছোটো [illegible]াসী পাঠিয়ে দিলে। পেথম বউনি তোমাদের খারাপ যায় নি তা হলে?

টাকা নিল পাঁচু। বলল, হ্যাঁ, জলেঙ্গা জল নিশেনা দিয়েছে ভালোই।

দুলাল চলে গেল। বিলাসের কাছে চালের মালসাটা দিয়ে, টাকা কটি নিয়ে ছইয়ের মধ্যে বাঁশের ফোঁকড়ে রাখল পাঁচু।

মনটি ভরে উঠেছে। দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে তাকাল জলের দিকে।

জলেঙ্গা জল। ভাটা এবার থমকাবে লাগছে। ভাটার সময় বেশী। নামে অনেকক্ষণ ধরে। এই জীবনের মতো। যদি দু দণ্ড তোমার সুখ হয়, চার দণ্ড তোমাকে দুঃখ পোহাতে হয়। চার দণ্ডের সুখে, আট দণ্ড দুঃখ। সংসারের নিয়মে এমনি বাঁধা পড়ে আছ তুমি। জলে জলে শেওলা ধরে গেল তোমার শরীরে। কত পলি পড়ল। একবার উলটে পালটে দেখো, এক মরশুম পেয়েছ, দুই মরশুম তোমাকে দেয় নি কিছু। তিন মাস যদি দুনোভাতে রইলে, ছ মাস উনো।

সেই ভোরবেলা ভাটা পড়েছিল, এখনো তার রেশ রয়েছে। প্রায় আট দণ্ড গেল। জল দেখে বোঝা যাচ্ছে নাবালের মুখছাটে জোয়ারের ধাক্কা লেগে গেছে।

তবে বর্ষার জোয়ার, তার দাপট বেশী নয়। বর্ষার মরশুমে ভাটা হল আসল সময়। আর দুদিন, তারপরে আসছে আরো লাল জল। আরো দুরন্ত স্রোত।

চোখ পড়ল বিলাসের দিকে। ভাতের ফ্যান গড়াচ্ছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে সেই উঁচু পাড়ের আমগাছের দিকে। রাগ বুঝি যায় নি। ডাকল, ভাতের মাড় গড়াচ্ছে যে। উদিকে দেখছিস কী তুই!

বিলাস হাঁড়ি নামাল। পাঁচু গঙ্গায় নামল স্নান করতে। ওদিকে কেদমে পাঁচুও ঢুকেছে গিয়ে দক্ষিণের জঙ্গলে।

কেদমের বড় ছেলে পরান ভাত বসিয়েছে। সুরীন বাটনা বাটছে ছইয়ের মুখছাটের কাছে বসে। অনেকক্ষণ থেকেই কী যেন বলবে বলবে করছিল পরান। এতক্ষণে ফাঁকা পেয়ে পরান বলল, বিলেস, বড়ো জবর ফড়েনী দেখছি!

বিলাস বলল, কে?

পরান বলল, বুড়ীর লাতীনের কথা বলছি।

বিলাসের কালো চোখ দুটি যেন এক বিস্ময়ে চকচক করছে। বলল, তা বটে। বলে, আবার তাকাল উঁচু পাড়ের দিকে।

এলোমেলো ঘর দেখা যায়। অধিকাংশই গোলপাতা আর টালিখোলার ঘর। মাঝে মাঝে নারকেল আম জাম গাছ। উঁচু থেকে মাটি এসেছে গড়িয়ে। তাকে কেটে দিয়েছে থাকে থাকে।

বিলাস দেখছে। এই বিলাসকে দেখলে সয়ারাম বলত, বিলেস, তোর ভাব বেব্‌ভোম্ হয়েছে। হল কী বল তো?

পরানের যদি-বা মনে হয়েছে, তৈত্‌লে বিলাসকে কিছু বলবার সাহস নেই। মাল টেনে, অর্থাৎ তালের গুঁড়ি টেনে পরানের বাপকে হারিয়েছে বিলাস। ও এখন গাঁয়ের বাছাড়।

পাঁচু এল জলেঙ্গা জলে ডুব দিয়ে, প্রাণ জুড়িয়ে। ভাত খেয়ে, বসল হুঁকো নিয়ে। বিলাসও নেয়ে খেয়ে, গুড়গুড় করে হুঁকো টানল। ধোঁয়ার আড়াল দিয়ে বারবার চোখ পড়ল উপরে। ইতিমধ্যে এল জোয়ার। দুনৌকোর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল অঘোরে। তিন রাত্রি ঘুম নেই। তার শোধ উঠবে এক জোয়ারেই। এখন আর দিনে জাগা রাতে ঘুম নয়। এখন জোয়ারে ঘুম, ভাটায় কাজ, এই নিয়মে চলবে। একটি ভাটাও হাতছাড়া করা চলবে না।

জোয়ার গেল। সমুদ্রের জল নিয়ে এসেছিল, আবার গেল। ঘোলা জলকে ডাক দিয়ে, আবার নেমে গেল ভাটায়। বিলাস বলল, সাংলো ফেলবে নাকি? জলেঙ্গা জলের ভাটা ছাড়বার উপায় নেই।

পাঁচু বলল, এখন না। যা করে টানাছাঁদি। সাংলোর দিন এখনো অনেক পড়ে আছে।

নৌকা পাড়ি দিল পুবে উত্তরে। জাল ফেলা হবে পুব ঘেঁষে। উত্তর কোণে পাড়ি না দিলে নৌকা টেনে নিয়ে যাবে দক্ষিণে। বাতাসের তেমন জোর নেই। আকাশ থমকে আছে। চলা-ফেরা নেই মেঘের। বিলাস দাঁড়ে টান দিল। নৌকায় বসে থাকলে বোঝা যায়, টানের জোর কত।

পুব ঘেঁষে নৌকো আড়-পাথালি করল পাঁচু। কিন্তু তরতর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণে।

বিলাস টানাছাঁদি ফেলল ছড়িয়ে। ফেলে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে, কল্কে সাজাতে বসল।

জলেঙ্গা জলের নিশানা ভালো। আবার মাছ পড়ল। টানা-ছাঁদির দুই গড়ানে, তিনটি মাঝারি আর একটি বড়ো ইলিশ। বাকি কিছু খয়রা আর ভোলা। তাও কুল্যে সের দেড়েক।

দুই গড়ান দিতে দিতেই ঘনিয়ে এল অন্ধকার। তা এই শহর বাজারে সন্ধ্যারাত্রে মাছ পড়ে থাকে না। দামিনী পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে ছিল হ্যারিকেন নিয়ে। নৌকো পাড়ে ভিড়তেই নেমে এল। একলা এসেছে। নাতনী আসে নি। মাছ দেখে দামিনীর মুখে আর হাসি ধরে না। বলল, আহা, বেশ দিয়েছে এই জল। এ জলের পেরমায়ু হোক গো।

পাঁচু মাছ মাপতে মাপতে বলল, সেটি যে হবার জো নেই।

এনার পেরমাম্নুর বাড়া-কমা নেই। ছকে বাঁধা আছে। তা মাছ কি আজ রাতেই বাজারে স্থে যাবে?

দামিনী বলল, পাঠিয়ে দিতে হবে বাজারেই। তবে রাতে আর বেচব না। বরফ দিয়ে রাখতে বলব। কাল সকালে, দামটাও ভালো পাব। রাত করে বসলে বেচুনীর গরজ ঠাওর হবে, বুইলে না?

পাঁচু মাছ নিয়ে, একটু এগিয়ে এসে বলল, এট্টা কথা বলি। লাতীনের বে দেও নি দামিনীদিদি?

দামিনী বলল, না, বে সে করে নি। কত গণ্ডা হাত বাড়িয়ে আছে। বলে, রাঁড়ের মেয়ের আবার বে! বেশ আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, কোনো ঝক্কি-ঝামেলা নেই। এখন দশজনের সামনে বাজারে গিয়ে মাছ নিয়ে বসতে একটু নজ্জা-নজ্জা করে। বছর দু-চার আরো যাক্, তা পরে বসব। একটা জীবন, কেটে যাবে।

তা যাবে, তবু, মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ বলে নয়, তুমি মানুষ। জীবনের ধর্ম মানতে হবে তোমাকে। না মানলে তোমাকে অধর্মের পথে যেতে হয়। মনুষ্যজীবন যখন কাটাচ্ছ, তখন তোমার বিপরীত রীতি উচিত নয়। রীতির পথে কাঁটা থাকলে, তাকে বুকে নিয়ে চলতে হবে তোমাকে। তবু, তোমাকে মানুষের রীতিতে মতি দিতে হবে।

দামিনী আবার বলল ফিসফিস করে, গত একবছর তো কাটিয়ে এল চুঁচড়োয়। কোথায় তা জানি নে বাপু। ভেবেছিলুন, যেখেনে থেকে সুখ পাস, সেখেনেই থাক। আমি মলে দাঁড়িয়ে শুধু কাঠের বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাস। তাহলেই হল। সে মিনসেকে কয়েকবার দেখিচি। বয়স বেশী নয়। শুনিচি মিনসের বাড়িঘরও আছে। লাতনীর নাকি সে মনের মানুষ। একে মা-মরা মেয়ে, তায় মনের মানুষের টান। আমি কিছু বলতে পারি নি। তোর সুখ, তোর

কাছে। কিন্তু কই, থাকতে পারল না, চলে এল। অমন দলমলে শরীরখানি শুকিয়ে নিয়ে ফিরল। কাউকে কিছুটি বললে না মুখ ফুটে। দেখলুম, নাতনীর বুক ফাটছে, মুখ ফোটে না। ওই বয়সটা কাটিয়ে এসেছি তো, জানি, কী জ্বালা মেয়েটার। কিন্তু আমার বেঁচে থাকা এখন শুধু ওইসব দেখবার জন্যে।

রাতের অন্ধকার নেমেছে। দামিনীর একহাতে হ্যারিকেন, অন্য হাতে মাছের চুপড়ি। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পাঁচুদাদা, সোমসারে মনের মানুষ সবাই খুঁজে মরে। তাকে কি পাওয়া যায়? যায় না। কখন বয়স ঘুচে যায়, মরণ আসে, তার কোলে গিয়ে জুড়াতে হয়। তা বলে সোমসারের 'পরে রাগ করে তো লাভ নেই। নাতীনের আমার এই সোমসারের 'পরে বড়ো বিরাগ।

অর্ধেক কথা আপন মনে বলতে বলতে বুড়ি চলে গেল। খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এল। পাঁচু যেন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মুখখানি নামিয়ে নিয়ে এসে দামিনী বলল ফিসফিস করে, পাঁচুদাদা, মনে বড়ো সাধ ছিল আমি সাগরের ফড়েনী হব। এখানে আর আমার মন মানে না। কিন্তু কই, যাওয়া হল না তো। মনের সাধ কি কোনোদিন মেটে? মেটে না।

পাঁচুর বুকের মধ্যে চমকে চমকে উঠল। মুখে তার কথা সরল না একটা। কেবল চোখের সামনে সাইদারের মূর্তিখানি ভেসে উঠল।

দামিনী চলে গেল হ্যারিকেন ঝুলিয়ে। উঁচু পাড় বেয়ে বেয়ে। একটি অদ্ভুত ছায়া যেন বুকে হেঁটে হেঁটে উঠে গেল উপরে। পাঁচু দেখল, বিলাস চেয়ে রয়েছে সেই উঁচু পাড়ের দিকে। চোখের পলক পড়ে না। জাল তুলে, উজান ঠেলে এসে গরম লেগেছে। খালি গায়ে বসে, হাবা ছেলের মতো উপরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

পাঁচু মুখ ফেরাল জলের দিকে। নৌকা দুলছে। ভাটা নামছে এখনো তরতর করে। শব্দ করে নামছে। আকাশে মেঘ জমছে, উড়ে উড়ে যাচ্ছে সারাদিন ধরে। এখন এমনি করেই যাবে। তারপর ঘোর ঘনঘটায় নামবে। আজ সপ্তমী। চাঁদ উঠতে দেরি আছে কৃষ্ণ পক্ষের, থেকে থেকে তারার মিটমিটে হাসি দেখা যাচ্ছে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু জলের বুকে অষ্টপ্রহর কী যেন চকচক করে। তরঙ্গে তরঙ্গে, স্রোতের টানে। ওই দেখা যায়, সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঁচুনীচু স্রোতে নেমে চলেছে কলকল করে। এঁকেবেঁকে পাক দিয়ে ফিরে আসবে সে সুদূর দক্ষিণকে।

উত্তরে আর-একটি কারখানার আলো। এই অসীম অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে বিন্দু বিন্দু হয়ে।

বাতাস আসছে দক্ষিণের। পাঁচু ভাবছে, দামিনীর কথাগুলি। ভাবে, মানুষের মনকে এমন বিচিত্র করেছে কে, সে বিস্ময়ের থই পাওয়া যায় না। নইলে দামিনী কেন সমুদ্রে যেতে চেয়েছিল। মনের মানুষ কাকে বলে, সে খোঁজের কথা কখনো স্মরণ হয় নি বোধ হয় এ জীবনে। মাছমারার জীবনে মনের মতো কোনোদিন কিছু পাওয়া যায় নি। মানুষ হয়ে কে বলতে পারে, মনের মতনটি সব পেয়েছে সে।

উজানে নৌকা ঠেলতে গিয়ে, রক্তের আসল তেজ ঠাহর হয়। দক্ষিণের ডাক পড়েছে সেখানে। মন অনেক কিছু চেয়েছিল এ জীবনে। তার কিছুই পাওয়া যায় নি। এখন বিলাসের আইবুড়োত্ব ঘুচিয়ে, চারদিক একটু বেঁধেছেঁদে দিয়ে, চোখ বুজতে পারলে হয়।

জলেঙ্গা জলে যেটুকু উদয় হয়েছে, ঘোলা জলের উজান ঠেলে তার সবটুকু যদি দেখাও, তবে বুঝি অনেক পেলুম এ জীবনে।

পাঁচু ডাকল, বিলেস।

জবাব এল যেন ওপার থেকে, কী বলছ?

—ছুটো ফুটোতে হয় এবারে।

ফোটাবার উদ্‌যোগ-আয়োজন করলে বিলাস। কিন্তু মনটা যেন এখানে নেই। কেমন যেন হতভম্ব ভাব। জাল ফেলেছে, তুলেছে, পুরো উজানটি এসেছে ঠেলে। কথা বলে নি একটিও। বলেও না অবশ্য! কিন্তু, কথা না-বলা আর আনমনা তো এক কথা নয়।

বুকের মধ্যে বড়ো ধুকধুক করে পাঁচুর। বিলাসের মন বোঝে না সে। ওর জীবনের ডাক বড়ো দূর দূরান্তে, সমুদ্র থেকে শহরে। বিলাসের মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে পরিষ্কার মন। যা করবে, তা তোমার সামনেই করবে।

রাত পোহাবার আগেই ভাটা পড়ল আবার। আজ আর-একটু আগে। পূর্ব পারে এসে টের পেল, অনেক নৌকা এসে পড়েছে রাত্রের জোয়ারে। চেনা মানুষের মধ্যে পাওয়া গেল সয়ারাম আর তার দাদা ঠাণ্ডারামকে। চেনা অবশ্য সবাই। তবে গাঁয়ের লোক আরো আপন।

কথাবার্তা হল কিছু সকলের সঙ্গেই। তবে, কাজ করতে করতে। দু দণ্ড হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করতে আসে নি কেউ এখানে।

আজ অষ্টমী। কিন্তু আষাঢ়ের পূর্ণিমা-কোটালের কাল কেটে গেছে আগেই। এখন মরাকোটাল যাচ্ছে বলা যায়। অমাবস্যাতে আবার ভারী কোটাল আসছে। তবে সে পূর্ণিমার কোটালের মতো তেজী নয়। অমাবস্যা তার তেজ দেখাবে টানের দিনে। এখন চাঁদের কাল। দিনে দিনে সে বাড়বে, উচাটন হবে। ষোলোকলা পূর্ণ হয়ে, চাঁদ হেসে হেসে সারা সংসারের চোখে নেশা ধরাবে। রসবতী গঙ্গা হারাবে কূল। মানুষ তার নিজের দিকে চেয়ে দেখুক, পূর্ণিমার কোটালে তার প্রাণও অকূল। তবে যে কোটালই আসুক, এখনো আসল জল বাকি।

পাঁচু জিজ্ঞেস করল সয়ারামকে, কতকগুলান লৌকো এল তোমাদের সঙ্গে।

সয়ারাম বললে, তা পেরায় খানদশেক হবে। আজ রাতের দিকে আরো অনেক আসবে।

আসবে। এই সারা তল্লাটের গঙ্গার বুক ভরে উঠবে মাছমারাদের নৌকায়। সয়ারামের দাদা ঠাণ্ডারামের মুখখানি ভার। পাঁচু শুনে

এসেছিল, পালমশাই এবার নৌকো ছাড়তে চায় নি ঠাণ্ডারামের। দেনা নাকি বড়ো বেশী করে ফেলেছে।'

না জিজ্ঞেস করে পারল না পাঁচু, মহাজনে কী বললে গো ঠাণ্ডারাম?

ঠাণ্ডারাম বলল, লৌকো ভাড়া ন্যে এলুম পাঁচুদা।

—নিজের লৌকো?

—হ্যাঁ! ওদিকে বন্দকী সুদ বাড়াবে, এদিকে ভাঁড়া।

হুঁ! তবু আসতে হবে। না এসে উপায় নেই। পাঁচু আর-কিছু বলল না। বললে শুধু ছাইচাপা দুঃখকে উসকে দেওয়া হয়।

সয়ারাম নৌকা ঘনিয়ে নিয়ে এল বিলাসের কাছে। বলল, এয়েছিস তো মাত্তর আমার এট্টা রাত আগে। সয়ারামকে যে চিনতেই পারছিস নে বিলাস।

বিলাস বলল জালের দিকে নজর রেখে, চিনতে পারব না কেন?

সয়ারাম বলল, তাক্কো তো দেখছিস নে একবার। খুড়োর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে নাকি?

—না।

হুঁ, সয়ারামের মনটা খারাপ গেয়ে উঠল। সেই হাওয়া নিয়েই এসেছে। দূরে এলে মন যে আরো আঁকুপাকু করে কিনা। বলে ঘরের বউয়ের জন্যেই, সয়ারামের এক রাতের মধ্যে মনটা ফসফস করছে। আর এ তো পরের বউয়ের টান। ওই টান আসলের চেয়ে একটু বেশী হয়। বিলাসের যেন একটু বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে। বলল, তবে? মুখখানা অমন ব্যাজার করে রয়েছিস যে? কিছু হয়েছে নাকি?

বিলাস এতক্ষণে চোখ তুলে একবার যেন ক্যাঁচার ঘা মারল সয়ারামের মুখের উপর। মুখ ফিরিয়ে বলল, হতে পারে।

সয়ারাম গলুই থেকে একবার দেখল তার দাদা ঠাণ্ডারামের দিকে। ঠাণ্ডারামের নজর এদিকে নেই, জলের দিকে। এসেই জাল ফেলেছে। মনটাও ভালো নেই।

সয়ারাম বলল, কী হয়েছে, বল তো?

বিলাস বলল, জানলে তো বলব।

—সেই কাজটার কথা মনে পড়ছে বুঝিন্?

—কোন্ কাজটা?

ওই দেখো, আবার জিজ্ঞেস করে বিপদে ফেলা কেন? ঢোক গিলে বলল, অমর্তর বউয়ের কথা বলছি।

বিলাস তাকাল একবার কটমট করে। বলল, না।

—তবে?

বিলাস ভ্রূ কুঁচকে, খেঁকিয়ে উঠল, তবে? তবে আমার ইয়ে। কাটারি থাকলে আমার বুকের মধ্যে কুপিয়ে ছাখ তবে, কী হয়েছে।

না, কথা বলা যাবে না। সয়ারাম তাড়াতাড়ি আশেপাশে দেখল। শত হলেও আশেপাশে এখন ছ-এক গণ্ডা নৌকা রয়েছে। শুনলে ভাববে কী না জানি ঘটেছে এদের মধ্যে।

সয়ারামের চোখাচোখি হল পাঁচুর সঙ্গে। ওর মধ্যেই একটু ভাব বিনিময় হল তুজনের। কী জানি, কী হয়েছে বিলাসটার।

গড়কে চলে আড় নৌকা। অর্থাৎ টানে চলে, চলে ওই আওড়ের মুখে। খেয়াল আছে তো বিলাসের। আর কতদূর যাবে? জালে টান দিল বিলাস। মাছ পড়েছে।

সয়ারাম দেখল, বিলাস হাসছে। ও! ওইজন্য মন খারাপ হয়েছে বন্ধুর। সয়ারামও জালে টান দিল। রাশি রাশি মেকো। দেখতে দেখতে জাল, নৌকা, সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে। আবার

কামড়ায় কুটকুট করে। কাঁকড়ার বাচ্চা তো, স্বভাব যাবে কোথায়। দাঁড়া না-গজাতেই দাঁড়া ফোটায়।

বিলাস দুটি ইলিশ পেয়েছে। জালের কোলে মাছের ছাপ পড়েছে। সেই আনন্দে গায়ে মেকো পড়ার কথাও মনে নেই।

সয়ারাম বলল, এ তো অস্থির করে খেল। জাল তুলতে দেবে না। জাল ঝেড়ে ঝেড়ে তুলে, একটি মাঝারি শিলং, আর-একটি ইলিশ মাছ পেল। এখন শিলং মাছ দেখে পেয়েও মন ভরে না।

সুদিনের গঙ্গা, সে দেবে আসল জিনিস। অর্থাৎ ইলিশ। বিলাস গুনগুন করে গান ধরে দিয়েছে।

আমার ভরা জোয়ার গেল,
ভাটার বেলা এল হে
আর আমি রইতে নারি বসে।

ততক্ষণে পাঁচু নৌকার মুখ উত্তরে ঘুরিয়ে দিয়েছে। সরে গেছে পাড়ের দিকে। বিলাস লগি ঠেলছে গলুই থেকে।

সয়ারাম চেঁচিয়ে উঠল, এট্টুস্ আস্তে রে বিলেস, তোর কাছে যাব।

দেখতে দেখতে, উজান ঠেলে কাছে এল সয়ারামের নৌকো।

পাঁচুর নজর জেটির দিকে। নৌকা বড়ো টালমাটাল করে। ভাটার টানের জোর বাড়ছে ক্রমাগত। জেটির লোহার জটায় বাধা পেয়ে, জল নিচের দিকে চাপ দিচ্ছে। আবার ফেঁপে ফুলে উঠছে হাত কয়েক দূরে গিয়ে।

হঠাৎ কী খেয়াল হল, বিলাস আর সয়ারাম বাচ লাগিয়ে দিলে পরস্পরে। দুজনের হাতেই লগি। লগি মেরেই কে কার আগে যাবে, সেই চেষ্টা। বিলাসের বাচ খেলার সাথী সয়ারাম। দুজনেই বেশ দড়ো। কিন্তু ভয় হল পাঁচুর। আবার ভালোও লাগল।

টনটন করে উঠল বুকের মধ্যে। বিলাস যে থেকে থেকে আচমকা গুম্ হয়ে যায়, তার কারণ ওর প্রাণে বিষ রয়েছে। ওটা আর কিছু নয়। বৃথা ভাবনা ভাবে পাঁচু। এই মরশুমটা গেলেই সব দিক ঠিক করবে সে। বিষঝাড়ানির মন্তর দেবে। একখানি জীবন্ত সোনার প্রতিমা এনে বিলাসের বিষ ঝাড়বে। সেই প্রতিমার খোঁজ করে যে ওর মনের অন্ধকার।

ধমকে বলল, করিস কি তোরা ছুটোতে। গুঁতোগুঁতি করবি নাকি?

ঠাণ্ডারামও পাঁচুর মতো কাঁড়ারে হাল ধরে বসে আছে। ভাঁটার জলে তিন হাত উলটো লগি মারছে দুজনে ঝুপঝুপ করে।

তবু পাঁচু দেখছিল বিলাসের হাতের দিকে। হাত নয়, লোহা। ভেবেও কি অস্বস্তি! আ ছি ছি! আজ কী বার? রবিবার। যাক, অ-ফলা বার। তা মিছে নয়, হাতখানি লোহারই। আর একজনের হাতের কথা মনে পড়ে যায়। লগি ফেলছে, কিন্তু জল ছিটুচ্ছে না। ব্যাটা সুন্দরবনের ডাকাত হতে পারত। কোথায় সয়ারাম। একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছে। পেছিয়ে পড়েছে অনেকখানি।

তারপর হেসে উঠে চিৎকার করে বলল সয়ারাম, দাঁড়া রে দাঁড়া, জানি তুই ধলতিতের বাছাড়ি বীর। ডাকলুম দুটো কথা বলব বলে। উনি পাল্লা দে চললেন।

কাছাকাছি হল আবার দুই নৌকা। গলুয়ে গলুয়ে সমান হল, তবে ফারাক রেখে। দুজনকেই লগি ঠেলতে হবে তো।

সয়ারাম বলল, তোর গতিক কিন্তুক সুবিধের নয় বিলেস, এই বলে দিচ্ছি।

বিলাসের সেই থমথমানি নেই মুখের। বলল, কেন বলো দিনি?

—থেকে থেকে তোর কী হয়, বল তো। এসে তোকে দুটো কথা বলনু, তুই গেলি খেপে। মন করছিল, গাঁয়ে ফিরে যাই।

জবাব না পেয়ে বিলাসের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল সয়ারাম। দেখল বিলাসের ঘামঝরা মুখখানিতে চাপা-চাপা হাসি। সয়ারাম বলল, মসকরা করছিলি আমার সঙ্গে, না?

—হ্যাঁ।

—বাবা, কী মসকরা ভাই তোর। ওতে কিন্তু তা বলে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

বিলাস বলল, তোর কষ্ট আবার বেশী।

সয়ারাম অভিমানাহত মুখখানি অন্যদিকে ফিরিয়ে চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে ফিরে আবার বলল, দুদিনই ভালো পাচ্ছিস, না?

ভালো পাওয়া অর্থে মাছ।

বিলাস বলল, ওই মোটামুটি একরকম।

—গতিক এবার ভালো মনে হচ্ছে তা হলে?

—এখন আর কি করে গতিক বোঝা যাবে। শাওন মাসটা না দেখে কিছু বলা যায় না।

ঠিক, যথার্থ বলেছে। মনে মনে বলে উঠল পাঁচু। জাত মাছমারার কথা বলেছে। গঙ্গায় এসেছ তুমি, সুদিনের আশায়। তোমার ভাগ্য নিয়ে বসে আছে শ্রাবণ মাস। জলেঙ্গা জল তোমাকে ইশারা দিয়েছে ভালো। কিন্তু জলেঙ্গা জল সব টেনে আনবে না। কূলে গিয়ে ভরাডুবি হতে পারে। শ্রাবণ না দেখে তুমি কিছুই বলতে পার না।

কৃষ্ণচূড়া গাছের পর, কারখানার পাঁচিল পার হয়ে, পাঁচু নৌকার মুখ ঘোরাল। সয়ারামেরা যাবে সোজা। এই পুব পারেই, ওই দেখা যায় পো মাইল উত্তরে জেলেপাড়া, ওইখানে নোঙর করবে। সয়ারাম জিজ্ঞেস করল, পরের ভাটিতে আসবি নাকি বিলেস?

—হ্যা, আসব।

পুবের জেলেপাড়ার দিকে দেখা গেল অনেকগুলি নৌকা। চব্বিশ পরগনার পুবের অনেকে স্থায়ী বসত করেছে ওখানে। জানাশোনা লোক অনেক আছে।

নজর পড়তে পাঁচুর মনে পড়ল সকলের কথা। যাবে একসময়, দিন তো পড়ে আছে। এক ফাঁকে গেলেই হবে। উত্তর-পশ্চিমে পাড়ি দিয়ে বলল পাঁচু, মনে হচ্ছে, পুবের ওই ওড়ের মুখে যেন শাবর রয়েছে।

অর্থাৎ জেলেপাড়াটার যেখানে ভিড়েছে কিছু নৌকো ' ওড় হল ইটখোলার গর্ত। গর্ত মানে, ছোটোখাটো কিছু নয়। ইটখোলার জমিতে জল যাওয়ার জন্যে সারা বর্ষা কেটে রাখে নয়ানজুলি। নয়ানজুলি দিয়ে জোয়ারের জল যায়, পলি পড়ে। পড়ে পড়ে উঁচু হয়। তারপর টানের দিনে নয়ানজুলিতে বাঁধ দিয়ে, পলি মাটি কেটে ইট হয়। আবার বর্ষাকালে জল আসে। ওই কাটা জায়গাটির নাম ওড়। জোয়ারের টানে গিয়ে ঢোকে মাছমারারা, বেরিয়ে আসে ভাটার টানে। জেলেপাড়াটা ইটখোলার ওপরেই।

বিলেস তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, ওই কি শাবর! হাতে গোনা যায় কখানি লৌকো রয়েছে।

—না, বলে এট্টা কথার কথা বলছি।

—কথায় শাবর হয় না। সমুদ্রের ট্যাকে থাকে দশ-বিশ গণ্ডা লৌকো, তাকে বলি শাবর।

পাঁচু ধমকে উঠে বলল, সেটা কি তোর কাছে আমাকে শিখতে হবে? বলছি বলে, মনে হচ্ছে যেন শাবর। তা নয়, এঁড়ে তক্কো।

বিলাস ছইয়ের উপরে আড়াআড়ি বাঁশের উপরে জাল চেলে দিতে লাগল।

মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে। এ রোদ দেখতে বড়ো মিষ্টি। কিন্তু কেমন যেন একটু হলুদের ছোঁয়া লেগে থাকে। সোনার মতো। বৃষ্টিভেজা গাছের পাতায়, মাটিতে, সবখানে চোখ-জুড়নো সোনার ঝিকিমিকি। দেখতে বড়ো ভালো, কিন্তু গায়ে লাগাও, জ্বলে যাবে। মনে হবে যেন, ধানি লঙ্কা ঘষে দিয়েছে তোমার সারা গায়ে। খানিকক্ষণ রোদটি লাগলেই ভিন্ন মূর্তি হবে। নেশা-ভাং না করেও চোখ দুটি কোকিলের চোখের মতো লাল হয়ে উঠবে। মাথায় চাপবে গরম। খেঁকতুড়ি হয়ে উঠবে মেজাজটি।

বিলাসের নজর উপরের পাড়ে। দামিনী আসে নি তখনো। নাবির একটা গাছের গোড়ায় বসে আছে আতরবালা। হাঁটু অবধি শাড়ি তুলেছে। চুল এলিয়ে দিয়েছে ঘাড়ে পিঠে। নজর নৌকোর দিকে। মেয়েমানুষের বয়স বোঝা দায়। দামিনীর নাতনীর চেয়ে আতর বড়ো, এইটি মনে হয়। কত বড়ো, আন্দাজ পাওয়া যায় না।

দুলাল চুপড়ি নিয়ে গাঙের পাড়ে ঘুরছে। নৌকো দেখে উঠে এল আতরবালা। মাথার সিঁথেখানি বাঁকা, গায়ে এক চিলতে জামা। কপালে আছে পেতলের টিপ। চোখে বড়ো লাগে, মনটা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে। কেন কে জানে। শরীরটি ঢলোঢলো, অঙ্গ একটু বেশী দোলে। এক-বেড়-দেওয়া শাড়ির কোমরের নিচে, রুপোর মোটা-বিছে দিয়ে বাঁধা। বাঁধন একটু আঁট। বাঁধন না থাকলে যেন অঙ্গখানি ছড়িয়ে পড়বে।

ভাটার পলি, বড়ো পিছল। দুলালের কোমর জড়িয়ে এল আতর। বিলাসের সঙ্গে চোখাচোখি হল দুলালের। দুলাল হাসল ঠোঁট টিপে। সে হাসি দেখে, বিলাসেরও হাসি পেল। কেন কে জানে।

দুলাল বলল আতরকে, এ নৌকো নয় গো। এদের মাছ আমাদের ছোটোমাসীর জন্মে।

আতর বলল, অ।

দুলাল আবার বলল, কাল আমার ছোটোমাসী আর হেসে বাঁচে না, ওই খুড়োর কথা শুনে।

আতর বিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন?

পাঁচু বলে উঠল, বড়ো গোঁয়ার যে!

আতর চেনা মানুষ। বিলাসেরও। আতর দাদন দেয় না কোনো মাছমারাকে। ঘুরে ঘুরে মাছ কেনে দশজনের কাছ থেকে। বিলাসও বলে উঠল, আর ফড়েনীরা যেন সব মহারানী। কথাবাত্তার গতিক দেখে মনে হয়, মাছমারারা তার কেনা গোলাম।

ছাখো, ছাখো, হারামজাদা কত বড়ো মুখফোড়। কিন্তু আতর আর দুলাল হেসে উঠল।

দুলাল বলল, ঠিক ধরেছে আমার খুড়ো।

আতর কপট কুটিল চোখে তাকিয়ে হেসে বলল, নেও, তুমি আর ফোড়ন কেটো না বাপু। বেলা অনেক হল। কাজ আছে আরো।

এগিয়ে গেল তারা কেদমে পাঁচুর নৌকোর দিকে। কেদমে দেওয়ার জন্যেই ব্যস্ত। যা পেয়েছিল দিল।

পাঁচু বলল আতরকে, ভালো আছ গো মা?

আতরের হাসি-হাসি ভাব, কথা যেন কেমন ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে। বলল, ওই এক রকম। নৌকো এত কম কেন?

পাঁচু বলল, এ জলটা গেল। সামনে অমাবস্যে। পুন্নিমের কোটাল ধরে আসচে সব। কত আসবে। তা আমাদের দামিনীদিদি এল না যে এখনো?

বলতে বলতেই, একটি নৌকা এসে লাগল পাঁচুর নৌকোর গায়ে। রসিক ছিল কাঁড়ারে। সঙ্গে আর-একটি লোক। চুপড়ি নিয়ে বসে আছে। বলল, পাঁচু, মাছ আছে নাকি হে?

বিলাস বলে উঠল, আছে, লাতীনের জন্যে।

—লাতীন? লাতীন কে?

পাঁচু আগে খেঁকিয়ে উঠল বিলাসকে, তুই চুপো।

রসিককে বলল, দামিনীদিদির মাছ ভাই, দেবার উপায় নাই।

রসিক বলল, দাম বেশী দেব, ছেড়ে দ্যাও।

পাঁচু বলল, একবার না জিজ্ঞেস করে দিতে পারব না।

রসিকের গলায় তেমনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। বলল, আরে লাও লাও, অত ভালোমানষিতে কাজ চলে না। মাছ থাকতে আবার গাহাকের পিত্যেশ। লাও, বার করো কী আছে।

যেন হুকুমের সুর রসিকের গলায়। পাঁচু বলল, তা হয় না গো দাদা। দামিনীদিদির কাছে আমি ধারি। তুমি না হয় একবারটি পাড়ে উঠে বলে এইসো, আমি দ্যে দি।

রসিক একটা বিশ্রী কটূক্তি করল। অষ্ট-প্রহরই করে এখানকার মাছ-বেচা, মাছমারারা। ওটা চল্ এখানে, কথার ধরতাই। বলল, আরে ধুর তোর নিকুচি করেছে দামিনীর। দ্যাও দ্যাও, টাকা দেব, মাল নেব। বলতে বলতে রসিক উঠে এল পাঁচুর নৌকোয়।

বিলাস উঠে দাঁড়াল ছইয়ের মুখছাটের কাছে। বলল, আরে বাপ্পু ইস্‌রে, অ্যাঁ, মনে নেয় কি য্যানো, হুকুমের লৌকো ডাঙায় চলে? লাতীনের মাছ জোর করে নেবে?

—এই, এই বিলেস।

পাঁচু উঠে এল সামনে। রসিকের গোল হলদে চোখে রক্ত দপদপিয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চোখাচোখি হল বিলাসের সঙ্গে।

রসিক রুক্ষ গলায় বলল, বড়ো যে লাতীনের ওপর টান দেখছি।

বিলাস বলল, দেখলে আর থামাচ্ছে কে।

রসিক লাফ দিয়ে নিজের নৌকোয় উঠে গেল। হালে একটা ক্রুদ্ধ হ্যাঁচকা দিয়ে, নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ভেসে গেল দূর জলে। চেঁচিয়ে বলল, কোন্ তল্লাটে এসেছ, সেটা একটু মনে রেখো, বুঝলে।

মিষ্টি করে জবাব দিতে যাচ্ছিল পাঁচু! বিলাস বলে উঠল, তোমার হুকুমে গো।

পাঁচুর মনটা ভরে উঠল অস্বস্তিতে। ভয়ও লাগে বড়ো। শহরের মানুষ, বলা তো যায় না, কখন কী অঘটন ঘটায়। কিন্তু রাগ হয় বিলাসের উপর। এই হারামজাদা যে আকোচ বাড়ায়। সর্বনেশে যে মাথা নোয়াতে জানে না।

দুলাল বলল, ওদের পাড়ার লোকগুলানই এমনি। তেরিয়ান হয়েই আছে।

তারপরে এল দামিনী। থপথপ করে ছুটে এল, ও মা, এসে পড়েছ?

পাঁচুর মুখে সব কথা শুনে, চেঁচিয়ে উঠল দামিনী, কোথায় সেই মুখপোড়া আসুক, মাছ নেয়াচ্ছি। খেংরে বিষ ঝাড়ব না!

মাছ নিয়ে গেল দামিনী। পাঁচুর মনটা ভার হয়ে রইল। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। কিন্তু বিলাস সেটা বোঝে না।

পরের ভাটিতেও মাছ পাওয়া গেল। সবাই পাচ্ছে কিছু কিছু। খবরও রটেছে এদিক ওদিক। পাইকারদের ভিড়ও মন্দ না। দুপুরের জোয়ারেই দেখা গেছে, আর-এক ঝাঁক নৌকা এসেছে। কিছু রয়ে গেছে। কিছু চলে গেছে আরো উত্তরে। গঙ্গার এ আর-এক শ্রী। ওইটুকুনি দেখে শান্তি মাছমারাদের। আকাশ বাতাস, সবই বদলাচ্ছে। সকলেরই কিছু তাড়া পড়েছে। জলের তাড়া লেগেছে, সে ফুলছে। বাতাসের তাড়া, ঝোড়ো ঝোড়ো ভাব তার। আকাশেরও তাড়া, তাই মেঘের বড়ো জড়াজাপটি। রোদ উঠছে,

কালো হচ্ছে, কখনো গুমসোচ্ছে। প্রস্তাবনাটি জমেছে ভালো। কথায় বলে, যার শুরু ভালো, তার শেষ ভালো।

পরের ভাটা থেকে একটু বেলাবেলি ফিরে নোঙর করল পাঁচু। দামিনী এল ছুটে। এক নৌকা নয়, তিন নৌকার মাছ সবই কিনল। বাদবাকি পাইকের যারা ছিল, তাদের বড়ো একটা মুখ চলে না দামিনীর উপর।

মাছ নিয়ে দামিনী বলল পাঁচুকে, আর তোমাকে এখন নগদ দেব না দাদা। এই ফাঁকে তোমারও ঋণ কিছু শোধ হোক। আমার নয়, আমার নাতীনের দেনা। বড়ো মেজাজী রায়বাঘিনী মেয়ে কি না। কখন কী বলে বসবে কিছু বলা তো যায় না। তোমারো আবার সুদিন দুর্দিন আছে, অ্যাঁ? কী বল?

পাঁচু বলল, তা বেশ তো গো। তোমার লাতীনের কপাল ন্যে যেন এবার জোয়ান কটালের, ভরা-ভত্তি হয়। আমি যেন সব ঋণই শোধ করতে পারি।

ফোগলা দাঁতে হাসল দামিনী বুড়ী দূর সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে। বলল, আমার লাতীনের কপাল ন্যে? ভাই পাঁচু দাদা, তবে তোমাকে এট্টা কথা বলে যাই চুপি চুপি। কাকে বা বলি, বুড়ো বয়সে যেন মানুষের ভয় দুগুণ বাড়ে। বলছিলুম, আমার লাতীনের কপালের কথা বলছ। লাখ ট্যাকার মালিক, হাত পেতে চেয়েছিল আমার লাতীনকে। গঞ্জে তার বড়ো কারবার। মোটর বাস, লরির ব্যাওসা। তা মেয়ে জবাব করেছে, ট্যাকায় বিকোতে পারব না, যা-ই বল আর তা-ই বল। মিছিমিছি কোন্ পাপের দেনা শুধব। কারুর ট্যাকায় আমার লোভ নেই। বোঝো তালে?

বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। আবার বলল, কপাল যে কাকে বলে, তা জানি নে। এতখানি জীবন কাটল আমার! কত কী এল, কত কী গেল, কিছুই তো ধরে রাখতে পারি নি দাদা! কপাল কাকে বলে, বুঝলুম না। খালি বুঝলুম, জীবনটা ফুটো কলসী, সে কখনো ভরে না। যাই ভাই, দেরি করব না আর, সাঁঝ বেলার বাজারটা হাতছাড়া করব না।

চলে গেল দামিনী। পাঁচু দেখল, বিলাস তাকিয়ে আছে সেই উঁচু পাড়ের দিকে। পাড়াটা অন্ধকার হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

হঠাৎ বিলাস উঠে দাঁড়াল। এদিক ওদিক দেখে, মেটে ঘড়াটি নিয়ে এগিয়ে গেল গলুয়ের দিকে।

ছইয়ের গা থেকে টিকটিকি উঠল টিকটিক করে। পাঁচু বলল, কমনে যাস।

বিলাস বলল, এট্টু খাবার জল ন্যে আসি।

খাবার জল পাঁচু নিজেই নিয়ে আসে। বিলাসকে ওপরের পাড়ায় পাঠাতে ভয় করে। আর-কিছুর জন্যে নয়। পথ ভুল হতে পারে। ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে বসতে পারে কারুর সঙ্গে।

পাঁচু বলল, থাক, তোকে যেতে হবে না। বাধা পড়ে গেল, আমিই যাচ্ছি।

বিলাস টিকটিকির ডাক শুনতে পায় নি। বলল, কিসের বাধা পড়ল?

—ওই যে, টিকটিকির বাধা পল। ও-সব মানতে হয়, বুইলি? ওঁয়াকে শুধু একখানি জীব ভাবলে হবে না। শাস্তরে বলেছেন, খনার জিভখানি কেটে ন্যে মিহির রেখে দিয়েছিলেন গর্তে। সেই জিভটি খেয়ে ফেলেছিল টিকটিকিতে। খনার বচন হলেন বেদবাক্য।

জিভ খেয়ে ফেলে, টিকটিকিরও গুণ হয়েছে ডাকের। সবাই মানে, তুমো মানো।

বলে পাঁচু নামছিল নৌকা থেকে। বিলাস বলে উঠল, মানুষের মরবার সময় যদি টিকটিকিতে ডেকে ওঠে, তবে বোধহয় যমও ফিরে যায়।

পাঁচু রেগে বলল, প্যাঁচা, সেটা যমকে পেলে জিজ্ঞেস করিস। কত তো মুরোদ। যাস, কাল থেকে রোজ জল আনতে যাস, দেখব, কেমন লাগে। টেপা কলে লোকের ভিড়। ঝগড়া করে আসবি তো তোর পিঠে সাংলোর সলি ভাঙব।

ঢালু জমিতে অন্ধকার নেমেছে। পাঁচু মিশে গেল সেই অন্ধকারে।

বিলাস তাকিয়ে রইল, অন্ধকারের বুকে কালো-কিম্ভূত পাড়াটার দিকে। কলসী আর হ্যারিকেনটি নিয়ে গেছে পাঁচু। নৌকার ছইয়ের অন্ধকারে দেখা যায় না বিলাসকে। অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে শুধু চোখ। অন্ধকার জলের ঝিকিমিকি স্রোতের কোটালের মতো।

সেই অন্ধকার যুগের মানুষের মতো। মনের ভাবকে ভাষা দিতে পারে না। কেবল মনটা ফসফস করে। রক্তের মধ্যে কে যেন পাক দিয়ে ওঠে।

পাঁচু ভাবে, রাগ, বড়ো রাগ ছেলেটার। নিজের মনের মতো কিছু না হল তো অমনি খেপে যাবে। জানিস, তোকে আমি পাঠাতে চাই নে কোথাও। শহরের পারে, দোকানে বাজারে কোথাও পাঠিয়ে আমার শান্তি নেই। কেন? না, তোকে নিয়ে আমার বড়ো ভয়। সব জায়গায় বাতাস তোর কানে আন্ কথার মন্ত্র নিয়ে ঘোরে। সে মন্ত্রের ঘোরে যদি তুই হারিয়ে যাস।

আমি তো জানি নে, কেন তুই এমন করে তাকিয়ে থাকিস পাড়ের দিকে। যেন সঙ্গ আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়ে-আসা ছেলে তুই। যা দেখিস, সবই অবাক হয়ে দেখিস, মোহমুগ্ধ হয়ে দেখিস। তুই যখন দক্ষিণে তাকিয়ে দেখিস স্বপ্ন, দেখিস গঙ্গার ঘোলা মিঠে জল, সবখানেই তোর একভাব। দেখে মনে হয়, কে যেন তোকে টানছে দিবানিশি।

পাড়ের দিকে কী দেখিস তুই ও চোখে। দেখে মনে হয়, যেন তোর মন আর মানছে না। না, তোকে আমি কোথাও যেতে দিতে চাই নে।

টেপা কলের পাশেই, দামিনীর ছিটে বেড়ার বাড়ি। এ পাড়াটাও একটু কেমন কেমন লাগে পাঁচুর। পাড়ায় মেয়েমানুষ বেশী। রাতের দিকে মাতাল মিন্‌সে দেখা যায় দু-একটা। দজ্জাল মেয়েদের খাণ্ডার গলায় অ-কথা কু-কথা শোনা যায়। যা শোনা যায়, তা ঘর-গেরস্থির বউ-ঝিদের বলা উচিত নয়। পাড়ার মধ্যে দু-চার ঘর আবার মাছমারাও আছে। বড়ো গরিব, পরের নৌকায় কাজ করে। সব ঘরেই ছেলে-মেয়ে আছে, সংসার আছে। মিল-কলে কাজ করে অনেক মেয়েমানুষ। কিন্তু কেমন যেন। মনটা কু গায়। দামিনীদের মতো মেয়ে-মানুষেরই পাড়া বলা যায়।

টেপা কলের হাতল চালাতে চালাতে শুনতে পেল পাঁচু মেয়েমানুষের গলা। বাড়ির ভিতরে কাকে বলছে, ব্যাটাছেলে বলে তো ছেড়ে কথা কইব না। তোমাকে খেতে দি আমার কাজকর্ম করার জন্যে, বসে বসে আমার মুখ দেখার জন্যে নয়। বুড়ী একলা গেল বাজারে, ভালো চোখে দেখতে পায় না। রাতের বেলা মাছ কাটতে কুটতে হতে পারে। তুমি গাঁজায় দম দে বসে রইলে এখানে। বেরও বেরও, দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও এখান থেকে।

বুঝল পাঁচু। দামিনীর নাতীন কথা বলছে। হ্যাঁ, খারাপ জায়গার মেয়ে, তবে বড়ো ডাকসাইটে। শাসন করে পুরুষকে।

জল নিয়ে নেমে এল পাঁচু। দেখল, বিলাস বসে আছে।

—বসে আছিস যে? তিবড়ি জ্বালিস নি?

—এই জ্বালি।

ছইয়ের ভিতর থেকে শুকনো কাঠ এনে তিবড়ি জ্বালল বিলাস। আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে বিলাস গান গেয়ে উঠল,

আমার পরান বড়ো উদাস হে
আমি যাব সাগরে।
ঘরে নাই ভাত-পানি
পরনে নাই কানি
পানসা সাই ন্যে আমি যাব সাগরে।

পাঁচুর মুখে থমকে যায় হরির নাম। ভয়ে বুক কাঁপে থরথরিয়ে। বিলাসকে দেখে, আগুনের শিখা সাপের মতো খেলা করে ওর গায়ে। ভাটার জল বড়ো হাসে খিলখিল করে।

পরদিন, জলেঙ্গা জলের স্রোতের বাঁকে, ঘোলা জলের আগমন দেখা গেল। কিন্তু নবমী পড়ে গেছে। সাঁঝের ভাটার জোর তেমন নেই।

তবু মাছ পাওয়া গেল। বাচা শিলং খানকয়েক। জালের প্রথম মুখ দেখে পাঁচুর মনটা সাঁঝবেলার মতো অন্ধকার হতে লাগল। পুরো টানাছাঁদি জাল তুলে দেখা গেল, ছোটো একটি ইলিশ, আধসের আড়াইপো।

হে খোকাঠাকুর। যা দিয়েছ, আজ এই ভালো। জলেঙ্গা জল শেষ হচ্ছে। এও আমার ভালো নিশানা।

মাছমারা মালো, সে জানে মাছের দেবতা খোকাঠাকুর। কেমন তোমার মূর্তি, তা জানি নে। নিজের হাতে মাছ মেরে, সেই মাছের গোল অপলক চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তুমি তাকিয়ে আছ আমার দিকে। দেবতা, তুমি আমার শিকার। তোমার আমার জীবনের এই বিধান।

কেদমে পাঁচু একটি বড়ো ইলিশ পেয়েছে।

দুপুরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়েছিল। আবার জমছে মেঘ। নৌকা নোঙর করল বটতলায়। বটের মাথায় মেঘ নামছে গড়িয়ে গড়িয়ে। বাতাসের জোর কম। কোন্‌খানে যেন বিদ্যুৎ চিকচিক করে।

চুপড়ি কাঁখে নিয়ে, নেমে এল হিমি। সাদা শাড়ি গায়ে, লাল রঙের গোল ছাপ। যেন মাছের চোখ ছড়ানো সারা গায়ে। পান খেয়েছিল কখন। তার লাল দাগ এখনো দুই ঠোঁটে। জামা বোধ হয় কখনোই গায়ে দেয় না। চাল নেই। বিকালে বাঁধা আঁট খোঁপায়, সেদিনের চওড়া, বড়ো মুখখানি আজ একটু লম্বা লাগছে।

এখন নৌকা বেড়ে হয়েছে ছখানি এই বটের তলায়। আরো দুজন ফড়ে ছিল দাঁড়িয়ে।

হিমি আসছিল পাঁচুর নৌকার কাছেই। হঠাৎ নজরে পড়ল কেদ্‌মে পাঁচুর বড়ো মাছটির দিকে। জিজ্ঞেস করল, দেবে নাকি দাদা?

কেদ্‌মে একবার উপরের পাড়ার দিকে তাকিয়ে বলল, নেও। ঠাকুরের লোক এল না। সাঁজবেলায় আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়?

মাছ নিয়ে আঁচল খুলে পয়সা দিতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়ে গেল বিলাসের দিকে। পাশের নৌকাই বিলাসদের। ছইয়ের মুখছাটের কাছে দাঁড়িয়েছিল সে।

চোখে চোখ পড়তে ভ্রূদুটি কুঁচকে উঠল একবার হিমির। পাঁচু দেখল ভাইপোর দিকে। দেখো ছোঁড়ার কাণ্ড। তোর রাগ যায় নি

নাকি এখনো। অমন করে তাকিয়ে রয়েছিস। শত হলেও মেয়েমানুষ। ভালো হোক, মন্দ হোক, অল্প বয়সের জোয়ান মেয়েছেলে। মাকড়া, সহবত শিখিস নি।

পান-খাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতের সারি দেখা গেল হিমির। পাঁচুর দিকে ফিরে, হেসে বলল, খুড়ো, যাচ্ছি তোমার কাছে। দেখি, এদের কাছে আর কিছু পাই কিনা।

—আচ্ছা গো মেয়ে, আচ্ছা, ঘুরে এস। তোমার দিদিমার কী হল?

—শরীরটা খারাপ। আজ আর বেরুতে দিই নি।

বলতে গিয়ে আবার নজর পড়ল বিলাসের দিকে। ভাবলেশহীন কালো কুচকুচে নাগের চোখ বিলাসের। হঠাৎ একবার বুঝি-বা হিমির চোখ জ্বলে উঠল দপ করে। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র।

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে গেল অন্য নৌকার কাছে। কাপড় একটু তুলতে হচ্ছে উপরে। জল নামছে এখনো ভাটার। কাদা হয়েছে। বড়ো পিছল আর আঁটালো। এদিকে হড়কে দেয়, আবার টেনে রাখে। মাঝে মাঝে পা ঝাড়া দিতে হচ্ছে। রাশি রাশি মেকো উঠছে গা বেয়ে বেয়ে। সুড়সুড়ি লাগে, কুটকুটও করে। বলে উঠল হিমি, আ, কী মরণ গো মেকোর।

পাঁচুর মুখ দলা পাকিয়ে উঠল। রাগে বিলাসের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল চাপা গলায়, এই, আরে এই শোরের লাতি, কী দেখছিস তুই তাকে তাকে, অ্যা? গাড়লের লাতি, ক্যাচা গিঁথে চোখ ওড়াব তোর। মালো গোঁয়ার, তোর ঘাড়ের ওই বাঁকা রগটা আমি আজ কাটব কাটারি দে।

বিলাস তাকাল খুড়োর দিকে। আমার আঁতুড়ের ঘুমভাঙা ছেলে তাকাল অবাক চোখে। ভাটার ঢেউয়ে নৌকা দুলছে, দুলছে বিলাসও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, চোখ ওড়াবে? কেন?

কেন? কেন দেখবি তুই অমন করে? রাগ থাক বা যাক, মাছমারা তুই, মাথা নাম্‌মে রাখ।

বিলাস একমুহূর্ত খুড়োর দিকে চেয়ে থেকে, চোখ নামিয়ে নিল।

ওদিকে চারটি নৌকোর মাছ, সব খরিদ করেছে হিমি। কুল্যে হবে প্রায় সের সাতেক। বাকি তুই ফড়ের চেয়ে তু আনা দর বেশী দিয়ে নিয়েছে।

একজন ফড়ে বলে উঠল, বাজার চড়াচ্ছ কেন? আমরা কি নিতুম না?

হিমি বলল নির্বিকার গলায়, নিলে না তো। দর চড়িয়ে থাকি, চড়িয়েছি। সাঁজের মাছ, তু আনা পয়সার জন্য দশ ঘণ্টা দরাদরি করার সময় নেই আমার।

—আমাদের সে সময় ছেল।

—তার আমার কী? সময় ছেল, দাঁড়িয়ে থাকো, বারণ করছে কে। শুধু শুধু ঝগড়া পাকাচ্ছ দাদা।

—ঝগড়া কেন। বলে, ঘাটের ইজারাখানি তো তোমার লয়।

—তোমারো নয়।

ফিরে তাকাল হিমি ফড়েদের দিকে। বলল, এখানে পয়সা বেশী দি আর যা-ই করি, বাজারে গিয়ে তো তোমার চেয়ে বেশী লাভ খাব না।

ফড়ে তুটি চুপ হয়ে গেল।

পাঁচুর নৌকার কাছে এল হিমি। বলল, দেখো দিকিনি, পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া। দেও খুড়ো, মাছ দেও।

আবার চোখাচোখি হল বিলাসের সঙ্গে। ভুলে গেলি হারামজাদা, খুড়োর কথা ভুলে গেলি।

ভুরু কুঁচকে চোখ ফেরাতে গিয়ে হিমি আবার তাকাল। হঠাৎ

কুঁচকে উঠল তার ঠোঁটের কোণ দুটি! চোখে ফুটল একটু হাসির ধার। কাঁধ থেকে চুপড়ি নামাল নৌকার গলুয়ে।

পাঁচু বলল, ওজন করি মেয়ে?

—হ্যাঁ করো। ওকি, সব একসঙ্গে কেন? ইলিশটা আলাদা কর।

পাঁচুর ফোগলা মুখে হাসি আর ধরে না। বলল, থাক না। এট্টা তো মাছ। ছোটোগুলানের সঙ্গে এক দর-ই দিওখনি।

—সে তোমার যা প্রাণ চায়।

মুখখানা যেন লাল দেখা যায় দামিনীর নাতীনের। আবার চোখাচোখি হল। কী দেখছে বিলাস এমন অবাক হয়ে। সমুদ্র নাকি! নজর যে ক্রমে মোহমুগ্ধ হচ্ছে। সর্বনাশ! দামিনীর নাতীনের দিকে হারামজাদার মন টেনেছে নাকি? দুশ্চরিত্র! গাড়ল! অপঘাতে মারে যে মাছমারাকে, সেই ডাকিনী চেপেছে শোরের ঘাড়ে। রাগে ও ভয়ে হাতের দাঁড়িপাল্লা কাঁপে পাঁচুর।

দামিনীর নাতীনের চোখে যেন বিদ্যুৎ চিকচিক করে। কেন? ভাইপো আমার মাছমারার ছেলে। ও তো লাখপতি নয়।

হিমি বিলাসের দিকে আবার তাকিয়ে পাঁচুকে বলল, আমার মাছের জন্যে নাকি রসিকের সঙ্গে তোমাদের ঝগড়া হয়েছে?

পাঁচু বলল, ঝগড়া করি নি গো মেয়ে, দিতে চাই নি। ভয় আমার ভাইপোকে ন্যে। এর যে জায়গা-অজায়গার খেয়ান নেই।

হিমির চোখে আবার বিদ্যুৎ চিকচিক করল। আড় চোখে দেখল বিলাসকে।

—এই নেও মেয়ে, মাছ নেও।

—দেও। হিসেব রাখছ তো, কত শোধ দিলে।

রাখছি। দামিনীদিদিও রাখছে।

কী হল বিলাসের। শরীরের পেশী শক্ত করে কাট মেরে তাকিয়ে

দেখছে পাথরের মূর্তির মতো। শহরের ফড়েনীর চোখমুখের ভাবেও যেন সাপ-খেলানো মন্ত্রের উত্তেজনা। নাকের নাকছাবি কাঁপছে থেকে থেকে।

হিমি বলল, দি-মা আর কদ্দিন রাখবে। আমাকেই রাখতে হবে খুড়ো। যাই, বাজারের সময় যায়।

—নিজে যাবে?

—না, বাজারে গিয়ে বসতে এখনো বড়ো লজ্জা করে খুড়ো। একটা বুড়ো মিনসে রেখেছি, তা সেও গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে। কী যে জ্বালা!

তা বটে। কিন্তু আড় চোখে চেয়ে অত হেসে যায় কেন দামিনীর নাতনী।

মেঘ নামছে বাসুকির মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে। ভাটার ছলছলানি যেন কমছে একটু। জোয়ার এসেছে তলে তলে।

যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল হিমি। ঠোঁট টিপে হেসে বিলাসকে চকিতে দেখল আর-একবার। বলল, খুড়ো, তোমার ভাইপো যেন এক ঢপ বাপু।

—তা বটে, ঢপ-ই।

বিলাস বলে উঠল, কেন, ঢপ হতে গেলুম কেন?

হিমি বলল ঠোঁট উলটে, আমার তো সে রকমই মনে হয়। আ মা গো, কী কাদা! জল দেখছি অনেক দূরে উঠেছিল।

চলতে গিয়ে হিমির পা পিছলে পড়ছে। পা হড়কায় তবু হাসে। লজ্জায় আর সঙ্কোচে হাসে। পশ্চিম আকাশের কালো মেঘের তলা দিয়ে একটু সিঁদুরে মেঘের আলো এসে পড়েছে হিমির এক ভাঁজ শাড়িতে। খোঁপাটি চকচক করছে।

বিলাস আবার বলে উঠল, কাদায় বোধকরি ঢপ আছে।

শোনো, শোনো হারামজাদার কথা। ওর অতবড়ো বাপ যা কোনোদিন বলে নি দামিনীকে, ও তাই বলছে। ও যে মাছমারা সে কথা ভুলে যাচ্ছে। ডাকিনীর মায়া লেগেছে ওর।

হিমি তাকাল ভ্রূ কুঁচকে। বলল, তাই নাকি?

—মনে তো নেয় তাই।

হঠাৎ দাঁড়াল আবার হিমি। বিলাসকে বলল, কাঁখালে ভার, উঠতে পারছি নে। চুপড়িটা একটু দিয়ে আসবে ওপরে?

বুকের মধ্যে তুরতুর করে উঠল পাঁচুর। বিলাস বললে, তা দিতে পারি!

দেখো, দেখো, হারামজাদা সত্যি নেমে গেল নৌকা থেকে। ডাকতে পারল না পাঁচু। সে যে জানে, এ যাওয়ায় ওর মরণ থাকলেও ডাকলে পিছু ফিরবে না। থ্যাবড়া পা ফেলে ফেলে গিয়ে বলল, দেও।

হিমি চুপড়ি দিল। বিলাস আগে আগে উঠে গেল সেই আমগাছের গোড়ায়। হিমি উঠল ঠেলতে ঠেলতে। দেখো, হারামজাদা চোখ ফেরায় না শহরের পাইকেরনীর ওপর থেকে।

কাছে গিয়ে, বিলাসের পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখল হিমি। বলল, দেও, চুপড়ি দেও।

চুপড়ি নিয়েও আবার দাঁড়াল হিমি। কালো পাথরের মূর্তি বিলাস। প্রস্থে বুক যেন একহাত উঁচু! সলুই কোঁকড়ানো চুল। বনমানুষের মতো। কাপড় পরেছে নেংটির মতো, উরুতের ওপর তুলে।

হঠাৎ যেন একটু লজ্জা করে উঠল হিমির। বেশ গম্ভীরও দেখাল। বলল, যাও এবারে।

বিলাস বলল, তুমি যাও আগে, তা পরে যাই।

হেসে ফেলল আবার হিমি। চুপড়ি ঝাঁকানি দিতে, সোনার চুড়ি বেজে উঠল। বিলাসের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু চাপা গলায় আবার বলল হিমি, চপো!

বলে চলে গেল চুপড়ি কাঁখালে।

কী কথা বলিস তুই এতক্ষণ ধরে। কী কথা! ভাব-বিভ্রম মন নিয়ে, উথালি-পাথালি বুক নিয়ে, এইখানে এসে তোর মরণ ধরেছে হারামজাদা। অ-জাতের মেয়ে, কুহকীর হাতে তুই প্রাণ সঁপে দিতে চাস। তুই তাকিয়ে দেখিস না, ও মেয়ের সারা গায়ে অপলক মীনচক্ষু, তাকিয়ে আছে তোর দিকে। ও মেয়ে মাছ বিক্রি করে আর পুবের মাছমারার ব্যাটা তুই, পিঁপড়ের মতো মরতে চাস এখানে। তার আগে তোকে জলে ডুবিয়ে মারব আমি জালে জড়িয়ে।

বিলাস নৌকায় আসতেই বুড়ো শরীর শক্ত করে দাঁড়াল পাঁচু সামনে! হাত-পা নিশপিশ করছে। কিন্তু গায়ে হাত তুলতে সাহস হয় না। ও যে ড্যাকরা হয়েছে। তবু সামলাতে পারছে না পাঁচু। বললে, কী হয়েছে তোর?

—কেন? কী, দেখলে কী?

—বড়ো যে চাড় দেখছি। আবার দেখলুম কী?

বিলাসের গায়ে গা ঠেকে পাঁচুর। কাঁপছে রাগে।—শহরের ফড়েনীর সঙ্গে তুই পীরিত করতে এসেছিস, শোরের লাতি। শুনি, মনে তোমার সুখ নেই, বড়ো জ্বালা। আমি তোমার জ্বালা জুড়োবার কাল শুনছি, আর তুমি গাড়লের ভাইপো এখানে মন বসাচ্ছ, জুড়াবে বলে? মেয়ে মাগছিস রাঁড়ের?

বিলাস তো পিছুল না খুড়োর গায়ের কাছ থেকে। মাথা নিচু করে চলে যা সামনে থেকে। তা নয়, বলল, হয়েছে, সরো দিনি এখন, তিবড়িটা জ্বালি।

কেদমে পাঁচু বলে উঠল, হুঁ, রোগ হয়েছে।

বিলাস ফিরে তাকাল। কেদমে পাঁচু কোনোদিন দেখতে পারে না তাকে। চোখ দুটি জ্বলে উঠল। বলল, হতে পারে। কারুর বাপের কাছে তো ওষুধ মাগতে যায় নি।

শোনো, কতবড়ো কথা। কেদমেও বড়ো শক্তিশালী মানুষ। বয়সকালে একদিন তো বাছাড় হয়েছিল। তার উপরে সঙ্গে দুই দুই জোয়ান ছেলে। দাঁড়িয়ে উঠল কেদমে—কী বললি ?

অন্ধকার নামছে। আর একপোঁছ কালো অন্ধকারের মতো বিলাস এক জায়গাতে দাঁড়িয়েই বলল, যেমন বললে, তেমনি বনু। বড়ো যে তড়পাচ্ছ ?

আগে বাড়তে পারল না কেদমে পাঁচু। ছেলে দুটোও বসে রইল হাঁ করে। কেদমে বলল চিবিয়ে চিবিয়ে, বিদেশ বিভুঁয়ে না হলে একবার দেখতুম।

বিলাস বলল, ফিরে গ্যে দেখোখনি।

হুঙ্কার দিল পাঁচু, চুপ, চুপ দে রাঁড়-মেগো।

বিলাস চুপ করল।

জোয়ার এসেছে পুরোপুরি। মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। গাঢ় অন্ধকার নেমেছে ত্রিসংসার জুড়ে। শেয়াল ডাকছে কাছাকাছি। তার ফাঁকে ফাঁকে একটু দক্ষিণে গঙ্গার পাড় থেকে শোনা যাচ্ছে ডাকিনীর খিলখিল হাসি। ভাগাড়ের পরে, পুবে পশ্চিমে লম্বা পাড়াটার মেয়েরা, রাতের অন্ধকারে পুরুষদের সঙ্গে এসে ওখানে হাসি-মসকরা করে মাঝে মাঝে।

জোয়ারের মতো ফুলতে লাগল পাঁচু গলুয়ে বসে। দেখছে বিলাসকে, কালো মূর্তি দপদপ করছে তিবড়ির আগুনে। কোথায় গেল এত কথার পোড়ানি। দেখো, গুনগুন করছে বসে।

আমার ডাক পড়েছে সাগরে,

ঠাকুর, আমার যেতে মন করে।

পাঁচুর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। তুমি ফিরলে না আর সমুদ্র থেকে। আজ, বিলাস বারবার সমুদ্রে যেতে চায়। তোমার প্রাণে ছিল আগুন, তার চেয়ে আমি বেশী দেখি বিলাসের। বংশে যাদের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ, সেই কাজে বিলাসের জেদ। মাছমারা থাকে বউ নিয়ে ঘরের কোণে। ও ছোটে ফড়েনীর পিছনে। মরণ ওর চারপাশে ফিরছে রঙমশালের ঝাড় নিয়ে। শক্তি দাও, ওকে আমি সামলাই।

সু আর কু আছে সব জায়গায়। মাছমারাদের মধ্যে আছে। যার কু আছে, তার সেটুকু সমুদ্রেও যায় সঙ্গে সঙ্গে। মাছ নিয়ে গোটা সাইয়ের শাবর হল হয়তো ক্যানিংএ। বড়ো বড়ো আড়ত। দোকান পশার। চারিদিকে মেলাই আলো। একটু দেখেশুনে বেড়াতে ভালো লাগে মাছমারার। নোনা জলের অকূল থেকে মাছ মেরে এক-আধ রাত কাটাতে হয় এখানে। জলে জলে ঘুরে, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। আড়ত এখানে, মাছ মেরে এখানে আসতেই হবে। রক্তে যার বড়ো বেশী জ্বালা সে যায় শহরের খারাপ জায়গায়। তারাও ডাকে, ফোঁসলায়, টানাটানি করে হাত ধরে।

বড়ো ভীষণ পাপ, যে যায়, সে তো বলে যায় না। ঘর ছেড়ে এসেছে সে। তার সোহাগের মানুষ ফেলে এসেছে ঘরে। নকল সোহাগের কোলে এক দণ্ড প্রাণ শান্ত করতে চায়। যেখানে দাড়ি-গোঁফ কামানো নিষেধ, সেখানে অপবিত্র হয়ে ফিরছ তুমি। তার জন্যে কত গুনোগাথ দিতে হয়, তোমার তখন মনে থাকে না। পাপ ঢোকাচ্ছ সাইয়ে। রক্তের মধ্যে বিষ নিয়ে আসছ। সারা গায়ে নিয়ে ফিরছ ছাপকা ছাপকা ঘা।

তারপরে সুঁদুরি বনের অন্ধকারে, হেতালের ঝোপে, মেতে ওঠে একজন মদমত্ত হয়ে। তোমার পাপ। ভুগবে সবাই। পাপ এমনি করেই আসে।

কেমন করে আসে? না, দেখছিলে বসে, শীতের কুয়াশা-ঢাকা আকাশ, মিটমিট করছে তারা। হঠাৎ সুঁদুরিবন উঠল মেতে প্রচণ্ড বাতাসে। গোলপাতা আর হোগলা মাথা কুটতে লাগল। সারা বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে কে যেন আসছে হা হা করে। কিন্তু শাবর স্থির। তোমার প্রাণও স্থির। ওই শোনো, মটাস মটাস করে কে বড়ো বড়ো সুঁদুরির ডাল ভেঙে আসছে। কী খরা! কান ফাটছে দানোর খরায়। অর্থাৎ দানোর চীৎকারে।

টনক নড়ল গুণীনের। যে আসছে সেও গুণীনেরই আত্মা যে! দানো আসছে। পোঁতো, পোঁতো শীগগির মন্ত্রখুঁটি। গোটা শাবর ঘিরে পাড়াবন্দ করল গুণীন। মন্ত্র দিয়ে দানোর সামনে সীমাবদ্ধ করল পাড়াবন্দ করে। এর মধ্যে আর পারবে না সে ঝাঁপিয়ে পড়তে। একটি বেগুন ফেলে দেখো পাঁড়াবন্দের জলে। গোটা বেগুন সেদ্ধ হয়ে যাবে। এত তেজ গুণের। দানো আসে খরা মেরে মেরে, শাবরে ঝাঁপ দেয় দেয়, পারে না। রাত পোহালে দেখো, আক্রোশে শুধু গাছ ভেঙে গেছে কয়েক গণ্ডা।

সকালবেলা এলেন সরকারী বন-বাবু। এত গাছ ভাঙলে কে? অমনি শাবরে এসে নৌকা তল্লাশি শুরু করলেন। দানোর কথা শুনবেন না। উনি দানো দেখেন নি, ও-সব চেনেনও না। কিন্তু মাছমারা কাঠ চুরি করতে আসে নি। সে টিকিট কেটে সমুদ্রে ঢোকে। হপ্তায় হপ্তায় টিকিটের পয়সা তাকে জমা দিতে হয়। তার জন্যেই অনুমতি আছে, প্রয়োজনমত মাছমারা কাঠ কাটতে পারে। কাঠ চুরির আলাদা লোক আছে। মাছমারাদের চোখের

সামনে দিয়েই তারা নৌকোবোঝাই কাঠ নিয়ে পাড়ি দেয় দূরদূরান্তে। বন-বাবুরা তাদের ধরতে পারেন না। নৌকো তল্লাশি করেন নিরীহ মাছমারার, প্রাণ যার পড়ে আছে অগাধ জলের তলায়।

তারপরে বন-বাবুর চমক ভাঙে। ভাঙা গাছগাছালি দেখেন। বলেন, হুঁ, সমুদ্রের সেই ঝড় এসেছিল। কেননা, গাছ ভেঙে পড়েছে, কাঠ যায় নি কোথাও এক টুকরো। সে ঝড় কিসের, মাছমারা জানে না। সে দেখে, শান্ত সমুদ্র। হঠাৎ কোত্থেকে আধমাইল জুড়ে একটি ভীষণ ঝড় ওলট-পালট করে, দলে মুচড়ে দিয়ে গেল বনের মধ্যে। আর কী তার হাঁক! কাঁপ ধরে যায় বুকের মধ্যে!

এখানে, সমুদ্রের এই জলে স্থলে, পায়ে পায়ে নানান বেশে আছে সে। বাবু বলেন ঝড়, তুমি বল দানো। কাজ তার দানোর মতোই।

তবে সব সময় দানো বাগ মানে না। দু-একটি প্রাণ নিয়ে ফেরে সুযোগ পেলে। কেমন করে? না, শাবরসুদ্ধ দুমড়ে দিতে চায় সে ঝাঁপ দিয়ে। ওই সময়ে দুইয়ের বাইরে থাকলে, তাকে লোপাট করে নিয়ে যায়। নৌকোসুদ্ধ নোঙর ছিঁড়ে, টেনে নিয়ে যায় অকূলে।

গুণ জানে না পাঁচু, জানলে আজ গুণ নিয়ে বশীভূত করত বিলাসকে। কিন্তু যদি পাপ করে ঘরে ফেরে ছোঁড়া। সে পাপের চেয়েও বড়ো ভয়, দামিনীর নাতনী ভেড়া করে রাখবে বিলাসকে। বড়ো যে দাপট মেয়ের। পুরুষ পোষে সে। বৌঠান, ঘরে বসে তুমি খোকাঠাকুরের স্মরণ নাও।

মরা কোটাল পড়ে গেল। নবমী গেল, দশমী গেল। মরা কোটালের সময় এখন। সামনে অমাবস্যা। জোয়ান কোটাল আসছে আবার সামনে।

—অমাবস্যা কবে গো পাঁচুদা ?

—এক গণ্ডা দিন বাদে।

চারদিন বাকি এখনো। থাকলেও বা কী। সে যে অমাবস্যার কোটাল। বর্ষায় তার তেমন জোর নেই। তবু একটু আশা।

কেদমে নোঙর করেছে দু নৌকো বাদ দিয়ে। বিলাসের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পরদিন থেকেই, সরে গিয়ে নোঙর করেছে। পাশে চণ্ডীপুরের নৌকা। সে নৌকায় আছে শ্রীদাম। শ্রীদাম বলল, জলে তো বেশ গোলানি ছেড়েছে।

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, পাহাড়ে জল ভেঙেছে।

হ্যাঁ, রক্তের ঢল নেমেছে। এই প্রকৃত গঙ্গা। সন্ন্যাসীর গেরুয়া রঙের জটার মতো। জটা খুলে দিয়েছে। জল আরো ঘোলা হচ্ছে। দিনে দিনে গঙ্গা বাড়ছে। জোয়ারের জল ক্রমেই উঠছে তার সাবেক সীমানা ছাড়িয়ে। কূলে কূলে ধরছে না আর। রক্তাম্বরী হা হা করে ছুটছে দিগদিগন্তে। যেদিকে তাকাও, গঙ্গা তার গোটা বাড়ন্ত সীমাকে লাল করে তুলছে। যতদূর সে যাবে দাগ রেখে আসবে নিজের রঙ দিয়ে।

এই গঙ্গা। দেখতে বড়ো শান্ত। কোলে তার সবাই মরতে চায়। মরণের সময়ে মরতে চায়। যখন নিদেন আসে। কিন্তু বর্ষার মরশুমে, গঙ্গার সব ক্ষুধার এক ভোগ্য হল মানুষ। মাছমারা সাবধান। সমুদ্র ঘুরে এসেছ বলে জাঁক কোরো না। নানান বেশে সে ঘোরে তোমার সামনে।

বড়ো শান্ত। কিন্তু খবরদার, ভুলেও আর মীয়াজীপীরের দহের সীমানায় যেও না। ভাগাড়ের দক্ষিণে, শ্মশানের ভাঙা ঘাটের আওড় তোমাকে পেলে এ জন্মে আর ছাড়বে না। জোয়ারের ধাক্কা এখন কম। কিন্তু প্রথম বানের মুখে হাত বাড়িয়ে আছে শমন।

আর সাবধান, টানের মুখে কোম্পানির গাধা-বোট, লঞ্চ, স্টিমার সামনে পড়লে আর সামলাতে পারবে না। চূর্ণবিচূর্ণ হবে। তার জন্যে কেউ গুনোগাথ দেবে না।

অনেক রকমের বিপদ আছে। সবখানেই থাকে, সবখানেই সামলে চলতে হয়। নিকনো ঝকঝকে দাওয়ায় অসাবধানে চলতে নেই মানুষকে। বেঘোরে আছড়ে পড়ে, মানুষ সেখানেও মরে।

গোটা বর্ষায় কিছু খাবে গঙ্গা। কিছু মানুষ, আরো উত্তরে কিছু মাটি। বন্যা হলে তো কথাই নেই। যত উঁচু দিকেই বন্যা হোক, তা হলেই মাছমারার কাল। গঙ্গা ধুয়ে বেরিয়ে যাবে মাছ নিয়ে।

বিস্তর নৌকা এসেছে। পাকিস্তানের বাস্তুহারা মাঝিরা কিছু বাড়িয়েছে তার সংখ্যা।

সবাই দেখছে জলের দিকে। জলে ঘোলানি ভেঙেছে।

তবে মরা কোটাল পড়ে গেছে।

—ও খুড়ো, জোয়ান কোটাল আর মরা কোটাল কাকে বলে?

পাঁচ-ছ বছর আগে, জিজ্ঞেস করত বিলাস। জানতে চাইত মাছমারার ছেলে।

বলতুম, কোটাল জানিস নে? শোন, এই যে দেখছিস বর্ষায় জল বাড়ছে, একেই বলে জোয়ান কোটাল। তার রকম আছে। পারাপারের মাঝির কাছে, এই জোয়ান কোটাল। জল আরও বাড়ে, ধরিত্রী রসস্থ হন অমাবস্যায় পুন্নিমাতে।

তখন শুধু জল বাড়ে না। যত জল বাড়বে, তত টান লাগবে। টের পাওয়া যাবে নৌকায় বসে। নৌকার তলা কাঁপছে থরথর করে। এত টান! ওর টান-কাঁপানিকে বলে জোয়ান কোটাল, বুইলি? সবচেয়ে বাড়াবাড়ির দিন কবে? না, বর্ষার পুন্নিমাতে যখন আকাশে সোনার চাঁদ থাকে। কখন? রাতে। পূর্ণিমার নিশির ভাটিতে হবে ভরা কোটাল। তার ওপরে ষোলো আনার মধ্যে চোদ্দ আনা ভরসা রাখ। মেঘ থাকবে সারা আকাশ জুড়ে, কখনো মুষলধারে, কখনো গুড়িগুড়ি জল ঢালবে, আর পুবে সাওটা ডাক ছাড়বে গোঁ গোঁ করে। এই হল জোয়ান কোটাল। জোয়ান কোটালে সে আসছে, যার পিছনে তুমি ঘোর। আর একজন আসবে ঘোর নিশিতে, অসাবধান হলে সে তোমাকে ছাড়বে না। টেনে নিয়ে যাবে তলায়। সব কিছু তাকিয়ে দেখো। মেঘচাপা জ্যোছনায়, সব যেন কেমন অস্পষ্ট, ছায়া-ছায়া, মায়া-মায়া। মনে

হবে, ডাঙার ওপরে কে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে, কে যেন সেখানে বসে আছে ঘাপটি মেরে। খুব সাবধান!

অমাবস্যায়ও জোয়ান কোটাল। তবে বর্ষাকালে পূর্ণিমার কোটালের জোর বেশী।

কদিন থাকবে? দ্বিতীয়া পর্যন্ত টান-কাঁপানি থাকবে। একেবারে চরমে উঠে, চতুর্থীতে ঢিল দেবে। দিতে দিতে অষ্টমীতে গিয়ে বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। দশমীতে একেবারে শেষ। জোয়ান কোটালের একটা আসে, আর-একটা যায়। মাঝে মরা কোটাল।

ভারী গোন কাকে বলে?

সমুদ্রের বান যখন চেতে ওঠে। ফুলে ফেঁপে হাঁক পেড়ে যখন আসে। সে গঙ্গার চোরাবান নয়। মাথা-উঁচু ঢেউ নিয়ে আসে। সমুদ্রের বান যত বেশী উঠবে, তাকে বলে ভরাগন। কিন্তু মাছ বানে নয়। জলটা যখন নামবে, তখন। এইটা নিয়ম, যত বেগে উঠবে, নামবে তার চেয়ে অনেক বেশী আগে। তাকে বলে, চলন্তা, মুকড়া জল, বলে একড়ি টান, বুইলি?

মরা কোটালে ইলিশ মাছ নেই কেন?

অষ্টমী, নবমী, দশমীতে কিছু মাছ পাওয়া যায়।

তারপরে ধরিত্রী শান্ত হল। চোখে দেখতে পাচ্ছ না, পৃথিবী দিবানিশি তাপ বদলাচ্ছেন। রসস্থ শরীরে ভার নেমেছে, জলও শান্ত হয়েছে। তার টান কমে গেছে। যার পিছে পিছে তুমি এসেছ, সেই মাছও তোমার মতোই এসেছে ঘোলা মিঠেন জলের সুদিনের আশায়। কিন্তুন সে গা ভাসিয়ে আসতে পারে না। উজানী মাছ সে। ওইটাই তার জীবন। সর্বক্ষণ সে বিপরীত পথে চলেছে ভেসে, তার আহার-মৈথুনে। সেইজন্যে ভাটা ঠেলে সে আসে সমুদ্র থেকে, জোয়ার ঠেলে যায় সমুদ্রে। উজান তার

বাচা। সে তখন একটানা ভাসবে, যখন মরবে। এই মাছমারার মতন।

কেন আসে এই ঘোলা মিঠে জলে? না, সন্তানের আয়ু নিয়ে আসে। তুমি তোমার ছা-পোনাকে আগলে রাখ শত্রুর হাত থেকে। এও তেমনি তার রুপালী পেট জুড়ে আছে সোনা-মানিকেরা। লাখ লাখ সোনা-মানিক।

গঙ্গাকে মা বলেছি তার এক কারণ এখানে দন্তাঘাত হয় না। এই প্রবাদ আছে। কামট-কুমিরের দাঁত পড়বে না এখানে। সেই কারণে ইনি ভগবতী। তবু অন্য মাছ খেতে পারে। সেজন্যে সে আসে গঙ্গার ঘোলা জলের অতল আঁধারে, শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। এসে পেট থেকে ছেড়ে দিয়ে যায় তার সোনা-মানিকদের। আর নোনা জলের চেয়ে মিঠে জলে ফোটে ভালো।

সে উজানে আসে পেটে বাচ্ছা নিয়ে। তাকে মারতে এসেছ তুমি।

গোটা সংসারের বুকে এই ব্যথা। দুঃখ পেও না। তা হলে মাটিতে পা দিয়ে তুমি চলতে পারবে না। ইনি ধরিত্রী। এইখানে তোমার জন্ম কর্ম।

এইটি মানুষের ধর্ম। জীব-ধর্ম পালন করছ তুমি। মরবার সময় সে তোমাকে দেখে যায়।

তুমি দেখতে পাও না, কিন্তু একটা দাগ রেখে যায়! আয়ু-শেষের দাগ। নিদেনে দেখতে পাবে তাকে। কেন? না, মরণের সময় তোমার গোটা জীবনকে সে দেখাবে।

মরা কোটাল পড়ে গেছে। পাহাড়ে জল ভেঙেছে বটে। মাছমারারা কাল গুনছে অমাবস্যা কোটালের।

তবু কেউ বসে নেই। সবাই জাল ফেলছে ভাটার টানে।

তল্লাটের পশ্চিমপারের মাছমারারা জোয়ার-ভাটা, কোনোটাই ছাড়ছে না। ঘেয়েকোনা থেকে খুঁটেজাল পর্যন্ত, সবই ফেলছে। পুবের মাছমারা এত জাল নিয়ে আসতে পারে না। নৌকায় ঠাঁই নেই। নিজেদের হাতে রাঁধাবাড়া। লোকাভাবও বটে। তল্লাটের লোকদের সে ভাবনা নেই। নৌকায় বাস নয় তো। ছেলে-বউ সবাই হাত লাগাচ্ছে।

লাগালে কী হবে। মরা কোটাল যাচ্ছে। মেহনত সার! তবু, বসে নেই কেউ। ওর মধ্যেই, দু-চারটে ছোটোখাটো যা উঠছে।

হিমি আসছে রোজ।—ওমা। খুড়ো, আজো নেই! এ যে শুধু কটা শিলিঙ্গে, খয়রা দেখছি।

—হ্যাঁ গো মেয়ে। মরা কোটাল যাচ্ছে তো।

বসে নেই কেউ। বসে বসে নিদেন জাল সেলাই করছে। বিলাস জাল-সেলাইয়ের ফাঁকে, দেখে চেয়ে হিমিকে। হিমি দেখে কালো হাতে জালের ঘর পরানো। বলে, চপের দেখছি সবদিকেই হাত চলে ভালো।

দেখো, দেখো, ছোঁড়ার চোখে যেন চড়া পিদ্দিমের শিষ দপদপাচ্ছে। অমর্তর বউয়ের বিষ নিয়ে তোর এত পরান-দগদগানি। বুকে তোর বিঁধে রইল কী? না, ধিক্কার। বুক ভরে চাইলি তুই অমৃত। সেই অমৃতের ধারা হল তোর দামিনী ফড়েনীর নাতনী। যেন তোর বুকের মধ্যে সত্যি উথালি-পাথালি হচ্ছে সোহাগের। পেলে যেন বুকে করিস এখুনি। আমি দেখছি, তোর জোয়ান কোটাল লেগেছে রক্তে। পুবে সাওটা ডাক ছেড়েছে মনের মধ্যে।

আর দেখো বুড়ীর নাতীনকে। কালো পায়রার পেখমের মতো খোঁপাটি বেঁধে, কেমন বিজলী হানছে চোখে। যত দূর কোণের মেঘ

শরীরের কূলে যেন বাতাসের শিউরোনি লেগেছে। মাছমারার ব্যাটাকে দেখে মনের মরা গাঙে বান ডাকল নাকি। সমুদ্রের হ্যাঁকা যে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ছে সর্বনাশীর বুকে।

বিলাস বলে, তা, মাছ মেরে খাই। হাত না চললে চলবে কেমন করে বলো? তোমার মতো সুখে তো নেই।

পাঁচু গুড়ুক গুড়ুক হুঁকো টানে, কাশে খকর খকর। কিন্তু কার কী।

হিমি বলে, সুখ দেখলে কোথায় গো?

—দেখে তো মনে হয়।

—বটে?

হিমি তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। অসীম আকাশের তলায় গঙ্গার বুকে, আদিম মানুষের মতো মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে বিলাস।

হিমির শাড়ির পাড়ে, জলের ঢেউ কেটে চলে ময়ূরপঙ্খী। পুবের বাতাস টানে আঁচল ধরে। কিন্তু অমন চোখে চোখে তাকিয়ে কী দেখে দুজনে দুজনের। যেন দুটিতে কতকালের চেনা, হারিয়ে গিয়েছিল, ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। আজ বহুদিন পরে, ভাটার জলে মাঝি ভাসে। আর পলিমাটির পিছনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে। চোখে চোখে বলে, যেন চেনা-চেনা লাগে, তুমি কি সেই মাঝি?

হঠাৎ হেসে উঠে হিমি বুকের কাপড় টেনে দেয়। হুঁ। নাগিনের জোয়ান বুক আর মানছে না।

—কাজ কর, কাজ কর।

মনের ভাব চেপে শান্ত গলায় বলে পাঁচু, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন কাঁকড়ার দাঁড়া আঁচড়ায়। চুপ করে থাকতে পারে না। অমনি একবার হিমি দেখে খুড়োকে আড়চোখে। দেখলে কী হবে।

ছুঁড়ির ভারীগন ডেকেছে বুকে। দুজনের একজনও মানতে চায় না আর।

হিমি বলে, সব মান্ষের সুখ তালে তুমি বোঝ?

বিলাস বলে, দেখে যা মনে নেয়, তাই বলি, বুঝব কেমন করে, বলো?

বিলাসকে ছাড়িয়ে হিমির দৃষ্টি পড়ে দূর জলে, তার ওপারে মেঘ-ঘন আকাশে। যেন নাতনীর মন আর এখানে নেই। চোখ দুটি যেন সন্ধ্যাতারার মতো বড়ো বিবাগী আর বোবা হয়ে যায়। তারপরে আবার বিলাসের দিকে ফিরে হেসে বলে, দেখে কি সব বোঝা যায়? ভেবে দেখো একবার, কেমন করে বোঝা যায়?

তারপর চলে যায় পিছল ঠেলে ঠেলে, খোঁপার পেখম দেখিয়ে। উঠতে উঠতে আবার তাকায় পিছন ফিরে।

শুধু বিলাসের জোয়ান কোটালের টানে আওড় দেখা যায়। সেখানে পাক দেয় ঘূর্ণি, ফুলে ফেঁপে ওঠে। জালের সুতো জট পাকায় হাতে। মন তার দামিনীর নাতনীর সুখের ঠিকানা খুঁজতে চায়।

পাঁচু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলাসের উপর সেই মুহূর্তে। হাতের কাছে যা পায়, ছুঁড়ে মারে।—মরবি, মরবি শোরের লাতি।

কিন্তু জোয়ান কোটালের টান তো ফেরাতে পারে না পাঁচু। শুধু বুকের মধ্যে বড়ো আছাড়ি-পিছাড়ি ভয় ও রাগের।

মরা কোটাল যাচ্ছে।

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমছে। হিলিবিলি বিজলী হানছে আকাশ। সারা আকাশে যেন সাপ ছুটছে কিলবিলিয়ে।

এর মধ্যেই হাতের পায়ের চামড়ায়, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা

[illegible] মত বসছে। কুকড়ে উঠছে চামড়া। ফাটাফুট বারোমাসই, এবার চামড়ার তলে মাংস উঁকি দিচ্ছে একটু একটু করে। চামড়ায় ফাটল ধরছে। হাজা পচা শুরু হয়েছে।

বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি। অমাবস্যার কোটাল পড়ল।

অমাবস্যার ভোরবেলা, মেঘে গঙ্গায় মাখামাখি হল। বাতাসেও জোর বেশ। দক্ষিণা বাতাস মাঝে মাঝে মুখ থুবড়ে পড়ছে পশ্চিমে, পুবের দমকা বাতাসে। মোচড় দিচ্ছে। আস্তে আস্তে, পুবে বাতাস দখল করবে সারা আকাশ।

ভোরবেলা ডাকল বিলাস, খুড়ো, ওঠো। জল চলন্তা।

জল চলন্তা। ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পাঁচু। কাজের ছেলে। কী দোষ দেবে তুমি বিলাসের। মাছমারার ব্যাটা। জোয়ান কোটালের একড়ি জলের আশায় ওত পেতে বসে আছে। বিজলী-হানা কালিন্দী আকাশ। তার তলে, কালো কুচকুচে বিলাস। জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে সারা গায়ে।

হঠাৎ বড়ো টনটনিয়ে উঠল পাঁচুর বুকের মধ্যে। বলল, ঘুমোস নি সারা রাত?

জবাব দিল, তুমি হালে যাও। তোমার সাংলো রেখেছি ওপাশে। আমি নোঙর তুলছি।

ইস্! তর সইছে না। মাছমারার ব্যাটা তো। যা কর, তাই কর, বাপের ব্যাটা। ওর বাপ ছিল কাজের বেলায় এমনি দড়ো। এখন কাজের কথা বলো। সারা রাত ঘুমিয়েছি কি না সে হিসাব নিকাশ হবে গড়ান মেরে এসে।

এমন বাপের ব্যাটাকে কী দিয়ে গুণ করলে শহরের ফড়েনী।

নৌকা ভাসল। অনেক নৌকা ভেসেছে। বিলাস বলল, টানাছাঁদি ওপারে ফেলব তো?

—হ্যাঁ।

নৌকা পাড়ি দিল। পাঁচু ডাকল, কই হে, ছিদেম ?

জবাব এল, এই যে, যাচ্ছি, চলো।

—কদম পাঁচু ?

—চলে গেছে।

হ্যাঁ। নৌকার টান দেখে বোঝা যাচ্ছে, জোয়ান কোটাল পড়েছে। ঘোর বৃষ্টি। সামনে নৌকা দেখা যায় না।

—বিলেস।

—বলো।

—দাঁড় ধর, দাঁড় ধর। শ্মশানঘাটের আওড় সামনে।

দাঁড় ধরল বিলাস। ভাঙা ঘাটের পাষাণে বড়ো খলখল হাসি। শ্মশান ধুয়ে যাচ্ছে। মুমূর্ষু ঘরের মধ্যে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে সাধু আর কুকুরেরা। শ্মশান জাগবার কেউ নেই। বৃষ্টিতে ভিজে যেন নেতিয়ে পড়েছে। ওই দূরে দেখা যায়, কলকারখানার লোক নিয়ে পাড়ি দিয়েছে বড়ো নৌকা।

নৌকার মুখ পুব-উত্তরে। দাঁড় ঠেলছে বিলাস উত্তরে। কিন্তু ভাটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। বড়ো টান জলের।

পুব কিনারে এসে টানাছাঁদি জাল ফেলল বিলাস।

তারপর খুড়ো-ভাইপো প্রথম সাংলো জাল ফেলল জলে। একজন কাঁড়ারে, একজন গলুয়ে।

—তুই কোন্ সাংলোটা নিয়েছিস, বিলেস ? তোর মা যেটা বুনে দিয়েছিল ?

—বোধহয়।

—হ্যাঁ, ওটা আটাশ কাটিমের কোহিনুর সুতোর জাল। দেড়শো সুতো লেগেছিল।

সাংলো জাল থাকে তোমার হাতে। জালের দুই লম্বা মুখ, দুই সলি পরানো আছে তাতে। সলি হল কঞ্চি। জালের মুখে সলি, জালের মুখ। ওপরের সলিতে বাঁধা কাছি। সেই কাছি ভাটার ভিতর দিয়ে বাঁধা আছে নিচের সলির সঙ্গে। জাল তোমার হাঁ করে থাকবে মাটিতে। নিচের সলিতে আছে শিল, অর্থাৎ ভার। ওই ভারে জাল নেমে যাবে জলের নিচে। আন্দাজ চাই। ঠেকিয়ে নাও জালটি মাটিতে। যখন ঠেকবে, তখন এক হাত তুলে রাখবে। সব সময়, পাতালের মাটি থেকে সাংলো একহাত উঁচুতে থাকবে।

নৌকা করো পুব-পশ্চিমে আড় পাথালি। ভেসে যাও পাথালি নৌকা নিয়ে ভাটার টানে। যে আসার, সে আসবে উজান ঠেলে তোমার জালে। পড়বে এসে হাঁ-মুখে। খবর পাবে কেমন করে? জালের ঠিক মাঝখানে বাঁধা আছে সরু সুতো। তাকে বলে খুঁটনি। সেই খুঁটনি জড়ানো তোমার আঙুলে, যে আঙুলে তোমার সমস্ত মন বসে আছে। জালে তোমার ছোটো চাকুন্দে মাকুন্দে পড়লেও, খবর আসবে তোমার খুঁটনিতে। যেমনি খবর পেলে, অমনি ওকোড় মারো কাছি ধরে। যত জোরে পারো। সাংলোর হাঁ বুজে যাবে কাপটি খেয়ে। দেরি নয়, টেনে তোলো। ঢিল দিলে হাঁ খুলে যেতে পারে। ওকোড় মারা হল কাছির টান। আর এই সাংলো ফেলে পাথালি নৌকা ভেসে যাওয়াকে বলে গড়ান মারা।

কতদূর যাবে? জেটি ছাড়িয়ে বেশী দূরে নয়। এই মাইল খানেক। তারপরে আছে দহ। জালসুদ্ধ হঠাৎ তোমাকেই হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে নামাতে পারে।

নৌকা যায় তাড়াতাড়ি ভাটার টানে। টানাছাঁদি জাল আপনি ভেসে যায় আরো ধীরে। এদিকে সাংলো নিয়ে তিন গড়ান দিলে,

টানাছাঁদি জেটির কাছে যাবে। গড়ান দিয়ে চলেছে সব নৌকা। নদী যায় উত্তর-দক্ষিণে। কালো নৌকাগুলি, একে একে পাশাপাশি ভাসে পুবে-পশ্চিমে।

—কী রকম বোঝ ছিদেম?

—হবে, হবে মনে হচ্ছে পাঁচদা।

টিকটিকি টিকটিক করে উঠল। নৌকার ছয়েতেই, আছে খনার জিভ-খেগো জীবটি।

প্রথম গড়ান দিচ্ছে খুড়ো-ভাইপো। কলকল করে বৃষ্টি ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। কিন্তু খবরদার! নড়ো না। কথায় বলে, ইলিশ বড়ো কান-খড়খড়ি মাছ। তলার জালে তোমার একটু শব্দ হবে, ল্যাজ ঝাপটা দিয়ে সে অন্য দিকে যাবে।

কাছি কেবলি নামাতে হচ্ছে। জল বড়ো গহীন।

এক গড়ান গেল, দুই গড়ান গেল। তিন গড়ান শেষ করে, সাংলো তুলে রেখে বিলাস টানাছাঁদিতে হাত দিল।

তিন গড়ান দিলুম—প্রথম অনাবস্থার কোটালে। গঙ্গা সাড়া দেয় না এখনো। জলের দিকে একবার তাকিয়ে, তুফালি চলার পাটাতন সরিয়ে, নৌকার জল ছেঁচতে লাগল পাঁচু।

বিলাস টানাছাঁদি পুরো তুলল জলের কিনা ছিটিয়ে। জাল শূন্য।

হুঁ। মেকোও যেন একটু কমই দেখা যায়। সেও আসে উজান ঠেলে। একবার চোখাচোখি হল খুড়ো-ভাইপোতে। মনের মধ্যে দপদপ করে উঠল পাঁচুর। পাপ, পাপ ঢুকেছে এই নৌকায়। ওই শোরের লাতি পাপ মন নিয়ে এসেছে।

কিন্তু সব নৌকার অবস্থাই তো সমান। যত সংশয় থাক, ছেলেটার কাজ দেখে তো মনে হয় না কিছু।

শুধু ঘুসো ভাটা দেখতে হবে। যতক্ষণ আশ, ততক্ষণ শ্বাস। বিলাস লগি ঠেলে চলল উজানে। টানাছাঁদি এবেলা আর নয়, শুধু সাংলো।

চার গড়ান গেল। আবার এক মাইল উজান ঠেলে এল।

পাঁচ গড়ানের শেষ গিয়ে, বিলাস ওকোড় মারল। কী ওকোড় ছোঁড়ার। চার হাত সাড়ে চার হাত মারে। অত বড়ো ভার, আর গভীর জলের তলায়।

টেনে তুলল। একটি পাওয়া গেছে। সেরখানেক হবে।

অমাবস্যার কোটালের প্রথম মাছ। সয়ারাম চেঁচিয়ে উঠল, তোর হাত সাথক রে বিলেস। আজকের সকালে এই পেথম, তোর হাতে বউনি হল।

বিলাস হাসল একটু শুকনো মুখে। মুখ রক্ষে হয়েছে।

উজান ঠেলে আবার জাল ফেলতে যাচ্ছিল সে। পাঁচু বলল, আর নয়। ওবেলার ভাটিতে হবে আবার। রান্না-খাওয়া আছে।

বৃষ্টিটা ধরেছে খানিকক্ষণ। গায়ের জলও শুকিয়েছে গায়ে, শুধু চোখগুলি লাল-টকটক হয়ে উঠেছে।

দামিনী এল আজ ককাতে ককাতে। সঙ্গে সঙ্গে হিমি চুপড়ি কাঁখালে।

ওই দেখো, এত কাজের দড়ো ছেলে। পাঁচ গড়ান মেরে এসেও তোর চোখে মুখে কিসের ভর হল রে। অমনি দেখি তোর জলে-ভেজা মুখে বাতি দপদপ করে।

বুড়ির নাতীনের চোখেও ভরের ইশারা। রাধে আমার কী কেষ্ট পেল, অ্যাঁ? আজ আবার তিন চোখ নিয়ে এসেছে ছুঁড়ি। কপালে একটি টিপ দিয়ে এসেছে।

পাঁচু বলল, অমাবস্তের কোটাল তো কোটাল নয় দামিনী দিদি। মরা কোটালের মুখে এট্টুসখানি টান জোর। পেয়েছি একখানি।

—মাস্তর!

মাস্তর! তোমাদের কাছে তাই।

শুনে বড়ো টনটন করে বুকের মধ্যে। মাছমারার দুঃখ মাছ-বেচনদার কোনোদিন বোঝে না। ওই না পেলে যে ভাটার টানে ডুবে মরতে ইচ্ছে করত।

হিমি বলল, সাংলোতে উঠল?

—হ্যাঁ!

—কার?

—বিলেসের।

তিন চোখ দিয়ে বিঁধলে হিমি বিলাসের প্রাণে। বললে, চপ ওলে বেশ পয়মন্ত আছে।

দামিনী বলল, ও মা! চপ আবার কে লো?

হিমি হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, কেন, আমাদের খুড়োর ভাইপো।

দামিনী বিলাসের দিকে একবার দেখে, আবার দেখল হিমির দিকে।

বুঝি শিউরে উঠল বুড়ি কড়েনীর বুক। সব-আগুন-নিভে-যাওয়া বুকে একদিন বড়ো বাসনা ছিল, সমুদ্রের কড়েনী হবে সে। নাতীনকে যেন সেই নেশায় ধরেছে। বড়ো যে সর্বনাশের নেশা। ও লো মরণী, সোনার পালঙ্কের চেয়ে, রাজভোগের চেয়ে, ওর টান যে অনেক বেশী। করেছিস কী রাক্কুসী!

হুঁ, দেখো, দেখো চেয়ে, তোমার গুণবতী সর্বনাশী নাতীনের কাণ্ড। লাখ টাকার মানুষ ফেরায়, ধরে বাঁধে মাছমারার ব্যাটাকে

তবু পুরো ভাটা দেখতে হবে। যতক্ষণ আশ, ততক্ষণ শ্বাস। বিলাস লগি ঠেলে চলল উজানে। টানাছাঁদি এবেলা আর নয়, শুধু সাংলো।

চার গড়ান গেল। আবার এক মাইল উজান ঠেলে এল।

পাঁচ গড়ানের শেষ গিয়ে, বিলাস ওকোড় মারল। কী ওকোড় ছোঁড়ার। চার হাত সাড়ে চার হাত মারে। অত বড়ো ভার, আর গভীর জলের তলায়।

টেনে তুলল। একটি পাওয়া গেছে। সেরখানেক হবে।

অমাবস্যার কোটালের প্রথম মাছ। সয়ারাম চেঁচিয়ে উঠল, তোর হাত সাথক রে বিলেস। আজকের সকালে এই পেথম, তোর হাতে বউনি হল।

বিলাস হাসল একটু শুকনো মুখে। মুখ রক্ষে হয়েছে।

উজান ঠেলে আবার জাল ফেলতে যাচ্ছিল সে। পাঁচু বলল, আর নয়। ওবেলার ভাটিতে হবে আবার। রান্না-খাওয়া আছে।

বৃষ্টিটা ধরেছে খানিকক্ষণ। গায়ের জলও শুকিয়েছে গায়ে, শুধু চোখগুলি লাল-টকটক হয়ে উঠেছে।

দামিনী এল আজ ককাতে ককাতে। সঙ্গে সঙ্গে হিমি চুপড়ি কাঁখালে।

ওই দেখো, এত কাজের দড়ো ছেলে। পাঁচ গড়ান মেরে এসেও তোর চোখে মুখে কিসের ভর হল রে। অমনি দেখি তোর জলে-ভেজা মুখে বাতি দপদপ করে।

বুড়ির নাতীনের চোখেও ভরের ইশারা। রাধে আমার কী কেষ্ট পেল, অ্যাঁ? আজ আবার তিন চোখ নিয়ে এসেছে ছুঁড়ি। কপালে একটি টিপ দিয়ে এসেছে।

পাচু বলল, অমাবস্যের কোটাল তো কোটাল নয় দামিনী দিদি। মরা কোটালের মুখে এট্টুসখানি টান জোর। পেয়েছি একখানি।

—মাত্তর!

মাত্তর! তোমাদের কাছে তাই।

শুনে বড়ো টনটন করে বুকের মধ্যে। মাছমারার দুঃখ মাছ-বেচনদার কোনোদিন বোঝে না। ওই না পেলে যে ভাটার টানে ডুবে মরতে ইচ্ছে করত।

হিমি বলল, সাংলোতে উঠল?

—হ্যাঁ!

—কার?

—বিলেসের।

তিন চোখ দিয়ে বিঁধলে হিমি বিলাসের প্রাণে। বললে, চপ তালে বেশ পয়মন্ত আছে।

দামিনী বলল, ও মা! চপ আবার কে লো?

হিমি হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, কেন, আমাদের খুড়োর ভাইপো।

দামিনী বিলাসের দিকে একবার দেখে, আবার দেখল হিমির দিকে।

বুঝি শিউরে উঠল বুড়ি ফড়েনীর বুক। সব-আগুন-নিভে-যাওয়া বুকে একদিন বড়ো বাসনা ছিল, সমুদ্রের ফড়েনী হবে সে। নাতীনকে যেন সেই নেশায় ধরেছে। বড়ো যে সর্বনাশের নেশা। ও লো মরণী, সোনার পালঙ্কের চেয়ে, রাজভোগের চেয়ে, ওর টান যে অনেক বেশী। করেছিস কী রাক্কুসী!

হুঁ, দেখো, দেখো চেয়ে, তোমার গুণবতী সর্বনাশী নাতীনের কাণ্ড। লাখ টাকার মানুষ ফেরায়, ধরে বাঁধে মাছমারার ব্যাটাকে

বাঁড়ের মেয়েকে কত তুক্ না জানি শিখিয়েছে দামিনী দিদি। তোমারই ছায়া তো।

বিলাস বলল, একটা তো মাছ, এ কি আর পয়মন্ত হলুম।

দেখো, সারা শরীর দুলিয়ে কেমন গলুয়ে উঠে আসছে মেয়ে। মুকড়া জলের টানা ঢল কেমন কলকল করে আসছে।

দামিনী বলল, আবার নৌকোয় উঠলি কেন?

পাঁচু ছিল কাঁড়ারে। নৌকা তখনো নোঙর করে নি। হাল ঠেলে রাখতে হচ্ছে।

দামিনীর কথার কোনো জবাব্ না দিয়ে বিলাসকে বলল হিমি, দেও, মাছ ওজন করে দেও।

বিলাস বলল, বোসো, লৌকো নোঙর করি আগে।

দুটো মানুষ সামনে পিছনে। ভয় লজ্জা কিছু নেই। কপালের টিপ দিয়ে চিকুর হেনে হিমি বলল গলা নামিয়ে, নোঙর না করলে কী হয়, ঢপ?

বিলাস হিমির দিকে চোখ তুলে বলল, ভেসে যাবে।

—অকূল পাথারে নাকি?

বিলাস বলল, হ্যাঁ, বড়ো অকূল। ডাঙার মানুষের প্রাণ কাঁদবে সেই অকূলে।

—কেন?

—ভয়ে।

—কিসের ভয়?

—প্রাণের।

—প্রাণের ভয় না থাকলে?

—মন গুণে ধন। মনের ভয় আছে না?

—তবু অকূলে যে বড়ো মন টানে, ঢপ?

নোঙর করে হেসে বিলাস বলল, টানে? টানবে বৈ কি, সবাইকেই টানে। আমি তাই যাব। আমি সমুদ্রে যাব। এখন নোঙর করেছি তোমার ঘরের তলায়।

সমুদ্রে যাবে, সমুদ্রে যাবে। এই সর্বক্ষণ ওর কথা। হারামজাদা উজানে মাছ গো। যেখানে মরণ নিয়ে বসে আছে পাষাণের বাধা, সেইখানে মাথা কোটে।

মাছ মেপে দিল বিলাস। দিয়ে বলল, থাঁটি ওজন দিলাম।

হিমি বলল, একটু বেশী ঝোঁকতা দিলে যে!

—তোমার ঘরের তলায় আছি, তাই।

আরে সর্বনেশে, এত যে তোদের রাগ, এত বিরাগ, সে কি শুধু চোরাবানের ছলনা। কখন যে অনুরাগের জোয়ারে গলা-জল হয়েছে, দেখতেই পাই নি।

দামিনীর মুখখানি ভার দেখাচ্ছে।

চলে গেল দিদি-নাতীনে। যাওয়ার আগে বলে গেল হিমি, আমার ঘরের তলায় যদি নোঙর করেছ, দাওয়ায় উঠেসে বস একদিন।

দিদি-নাতনী অদৃশ্য হল। পাঁচু চাপা গলায় গর্জে উঠল, সাবধান, সাবধান রে কেউটে। দাওয়ায় যদি উঠতে চা'বি কোনোদিন, তবে তোর বিষদাঁত ভাঙব আমি।

—বিষদাঁতটা পাবে কমনে তুমি?

শোনো কথা।—হারামজাদা, পাণে মারব তোকে।

ছইয়ের মুখছাটের কাছে শিল-নোড়া নিয়ে বসে বলল বিলাস, শুহু শুহু মারতে যাবে কেন আমাকে?

শুধু শুধু শুয়োটা? মাছ মারতে এসে তুই শহরের ফড়েনীর সঙ্গে পীরিত করবি?

—তা পীরিত কি কারুর হাত-ধরা ?

—চুপ, চুপ ঢ্যামনা কমেনেকার।

—ঢ্যামনা তো ঢ্যামনা !

নৌকো ছুলিয়ে, বিলাস শিলের বুকে নোড়া দিয়ে হলুদ থ্যাঁতলাতে লাগল।

ভেসে যায় বুঝি সব। বাঁধা সুখের ঠিকানা খোঁজা অনেক দূরে। ঘর-গেরস্থি থাকলে হয়।

তিন নৌকা ফিরে এল শূন্য হাতে। কেদমে পাঁচু তার মধ্যে একজন।

বৃষ্টি আর এল না। কিন্তু জল বাড়ছে দুরন্ত গতিতে। জল হয়েছে টকটকে। বিকালের ভাটায় চার গড়ান দিয়ে ফিরতে হল শূন্য হাতে।

দামিনী এল একলা।—ওমা, পাও নি কিছু ?

—না।

বিলাস তাকিয়ে আছে উঁচু পাড়ের দিকে। নাতনী আসে নি দিদিমার সঙ্গে।

দামিনী বলল, তা-লে যাই, ঘরটা খালি রয়েছে। নাতীন তার সইয়ের বাড়ি গেছে বেড়াতে।

চলে গেল দামিনী। দেখো, ছেলের মুখ জুড়ে যেন মেঘ নামল। থমকানো মেঘ, বাতাস নেই।

শ্রীদাম বলল, জলের গতিক কিছু বুঝি নে পাঁচদা।

—গতিক বোঝার সময় হয় নি ছিদেম। এই হল আসল পাহাড়ে জল। অম্বুবাচীতে আসে পশ্চিমের গাঙে জমা জল। এখন-কার জল ঠাণ্ডা। মাছ আসতে চাইছে না। দেখছ না, মেকো মরছে বিস্তর। তারাও চলে যাচ্ছে।

—কিন্তুন পাঁচদা, দেখতে দেখতে আষাঢ় কাটছে। কাল থেকে শাওন মাস পড়ে যাচ্ছে। এদিকে যে চাল বাড়ন্ত।

চুপ চুপ চুপ। ওই একটি কথা পাঁচু অষ্টপ্রহর গুনগুন করছে মনে মনে। মুখ ফুটে বলে নি, শুনতেও চায় নি। কুড়ি দিনের চাল নিয়ে এসেছিল পাঁচু। তেরো দিন কাটল তার মধ্যে।

তবে সুদিনের বান ডাকবে গঙ্গায়, ভয় কি? সেই আশায় সবাই এসেছে, যুগযুগ আসছে। বলল, একেবারে বাড়ন্ত নাকি ছিদেম?

—আজ রাত্তিরটা চলবে।

—বড়ো কম ন্যে এয়েছ ভাই। নগদ কিছু এনেছ?

—আছে, কয়েকটা দিন চলবে।

—দেখো, কী হয়।

আবার রাত্রের ভাটায় ভাসল মাছমারা। মন মানে না। এক ভাটাও ছাড়বার উপায় নেই। এই জোয়ান কোটালের চলন্তা। টানে তার মনে হয়, সংসার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু যার আসার সে আসে না। জলেঙ্গা জল, তোমার নিশানা দেখাও।

খুব সাবধান। রাত্রের অন্ধকারে অঘাটে গিয়ে প'ড়ো না। জেটির কাছ থেকে ফারাক থাকো। নৌকার হ্যারিকেনখানি রাখো ঠিক ছইয়ের মুখছাটের কাছে ঝুলিয়ে। ওইটি তোমার অন্ধকারের চিহ্ন। নইলে লঞ্চ-স্টীমারে ধাক্কা লাগতে পারে। পরের নৌকা ঠোকর দিতে পারে। পাঁচাইনে জরিমানা করতে পারে পুলিশ। যদিও পুলিশের মোটেও টান নেই গঙ্গার ধারে।

ফিরে এল খুড়ো-ভাইপো শূন্য হাতে।

রাত পোহাতেই চড়চড়ে রোদ। সর্বাঙ্গে যেন শত শত টিকার আগুন জ্বালিয়ে বিঁধে রেখেছে গায়ে। সারা গায়ে ঝরে টোপানি। স্বাদে নোনতা। কিন্তু হাত দিয়ে দেখো, তেল। মাছমারা ঘামে না,

ওটা তেল বেয়ে বেয়ে পড়েছে। মাছের মতো, মাছমারার ঘাম নেই।

টানাছাঁদি পড়ল। উঠল শূন্য জাল।

তিন গড়ানের উজান ঠেলে, চার গড়ানের মুখে, পাঁচুর সাংলোয় ধরা দিল একটি মাছ।

চোখে চোখে তাকাচ্ছিস মীন। প্রাণে মারতে চাস আমাদের। দূর সমুদ্রের কী বার্তা নিয়ে এসেছিস তুই, একবার বল। বড়ো ভয়ঙ্কর হাসি দেখি তোর অপলক চোখে। পাঁচুকে ভয় দেখাচ্ছিস। ভয় পায়, প্রাণের জন্যে নয়, তবু প্রাণেরই জন্যে। সবাই তোর পথ চেয়ে আছে।

কী সংবাদ নিয়ে এসেছিস তার কাছ থেকে। যাকে আমি রেখে এসেছি তোদেরই রাজ্যে, সাতবছর আগে। আমার বড়ো ভয়, আমি যে ভুল করে এসেছি। আমি কশার বেঁধে আসি নি। অগুনতি কাশের মুণ্ডু জট পাকিয়ে বেঁধে রেখে আসতে হয়। নতুন কোনো মাছমারা গেলে, সেই দেখে জানতে পারবে, সেখানে কোনো মাছ-মারার মরণ হয়েছে। দেখে তুমিও সাবধান হও। বশীরও বেঁধে রেখে আসে নি। আবার কেউ প্রাণ হারাল কি না, সেই আমার ভয়। রক্তচক্ষু মীন, কী সংবাদ এনেছিস বল।

দক্ষিণে বাতাস বুক চেপে পড়েছে গঙ্গায়। মাঝে মাঝে অস্ফুটে উঠছে ককিয়ে পুবে বাতাসের মোচড়ে।

আর-একটি গড়ান দিল বিলাস।

গায়ের টোপানি মুছে পাঁচু বলল, তুই দে। আমি আর পারব না এখন সাংলোর ভার নিয়ে বসে থাকতে।

বিলাস কাঁড়ারে বসে, বৈঠা নিল কোলে অর্থাৎ পায়ে। হুঁকো টেনে দিল পাঁচু ভাইপোর হাতে। তোমার যা কিছু ঘর-গেরস্থি

সহবত, তা তুলে রাখো এখন ঘরের জন্যে। যদি মেহনতী হও, তবে মেহনতের সময় বাপ-ছেলের মাঝে কোনো দূরত্ব রেখো না।

বিলাস ছু-টান দিয়ে ফিরিয়ে দিল হুঁকো।

গড়ান শেষ। সামনে আওড়। আঙুলে জড়ানো খুঁটনি কোনো সংবাদ নিয়ে এল না। নিজের হাতে উজান ঠেলে ফিরে গেল বিলাস উত্তরে। কালো মূর্তি সেদ্ধ বেগুনের মতো হল। বলল, আর এট্টা গড়ান দেখব ?

—না, ফিরে চ।

এদিকে মাছমারার জেদ আছে ঠিক। জেলের প্রাণ বড়ো অশান্ত। ও যে বড়ো অশান্ত, ওর বাপের মতো। গড়ান মেরে খালি জাল তোলে আর দূর গঙ্গার জলে তাকিয়ে থাকে। ছেলের মন বুঝি অস্থির অস্থির করে! দিন হিসেব করে সমুদ্রে যাবার।

বড়ো রোদ। গামছা বেঁধেছে মাথায়। বিলাস জল ছিটিয়ে দিল গায়ে মুখে। আর দেখো, রক্তগঙ্গা কেমন দগদগ করে রোদ ঝিকিমিকিতে।

মাছ নিয়ে গেল দামিনী। নাতনী এল না। বলে গেল, কাকে বলি পাঁচুদাদা। সেই চুঁচড়োর লোকটি আবার এসেছে। বলছে ছুঁড়িকে, চল। উঁহু। ঘাড় বেঁকিয়ে দিয়েছে। বলে, যেতে-টেতে পারব না। ও-সবে আর নেই। এসেছ, বোসো, দুদণ্ড গল্পগুজব করে যাও। রাজী আছি। পীরিতের খোয়ারি কাটাতে আর আমি পারব না। কত হাতে-পায়ে ধরাধরি করছে। একবার ভুল হয়েছে, বারে বারে হবে না। উঁহু! বলে, নিজের সঙ্গে কারচুপি আর ভালো লাগে না। যা হবার তা হয়ে গেছে, আমার মন এখন চায় না। কপাল ভাই পাঁচুদাদা। মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। মনের ফাঁদ নিয়ে তুই আবার কোথায় ধরা পড়েছিস, কে জানে।

চলে গেল দামিনী মাছ নিয়ে।

কী দেখিস তাকিয়ে তুই উঁচু পাড়ের দিকে। কে তোকে কোপ দিয়েছে বুকে। কেউ দেয় নি। কোপ খেয়েছিস তুই নিজের হাতে। মাছমারার ব্যাটা মাছমারা থাক। মালোর ঘরের মেয়ে আসবে তোর ঘর আলো করে। শহরের মাছ-বেচুনী ফড়েনীতে তোর কি দরকার।

—তিবড়িতে আগুন দে, বিলেস।

—মন নেই দিতে। তুমি দেও।

শোনো! এ যে বেগড়বাই করছে। কিন্তু বলেই আবার উঠল নিজে।—শালার পেট মানেও না। আগুন দেব পেটে এবার।

বাপের বসানো কথা। এ তো মেয়েমানুষের জন্যে ক্ষোভ নয়। স্রোতের জল থেকে শূন্য জাল ঝেড়ে তোলার যন্ত্রণা।

তৃতীয়ার দিনে খুড়ো-ভাইপো চারটি মাছ পেল।

বড়ো অনিশ্চিত। পাঁজির কথা টিকতে চায় না। যখন হয় না, তখন পাঁচ ভাগ, দশ ভাগ কিছুই হয় না। হল তো তোমার সব ভরে উঠল। কেদমে পাঁচুও পেয়েছে। সয়ারাম পেয়েছে তিনটি মাছ।

সংসারে দুটো জিনিস হাতের কাছে চেয়ে না পেলে তুমি অনর্থ করতে পার। মহাজন-জোতদারের সঙ্গে বনিবনা না হলে ধর্মের ঘট বসিয়ে পুজো দিয়ে, দশজনে মিলে পার একটা ব্যবস্থা নিতে।

কিন্তু এখানে! এই অগাধ জলের তলায় বসে কে কলকাঠি নাড়ছে মাছমারার জীবনে, তা আমরা জানি নে। যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়, সে মীন।

এই স্রোতের বুকে তুমি ছপটি হাঁকতে পার, গালাগাল দিতে পার। কিন্তু সে দৃকপাত করবে না। খিলখিল করে হেসে, দহে ফুলে, ঘূর্ণি পাকিয়ে সে যাবে চলন্তায়, আসবে আগনায়। এই তার

নিরুদ্দেশ খেলা। মহাসমুদ্রে গিয়ে, হাসবে অট্ট হেসে। কত মার তুমি তাকে দেবে।

তোমাকে সে এমনি করে মারে।

থাক, এ চারটে মাছ আর নিয়ে যাব না দামিনীর কাছে। নিয়ে যাই পুবপারের পাইকেরকে বেচে।

পাইকের ফড়েরা এখন আর শুধু ডাঙায় বসে চেঁচাচ্ছে না, আছে নাকি ? আছে নাকি কত্তা ? এখন তারা অনেকে নৌকা নিয়ে ঘুরছে জেলের পিছে কেলে হাঁড়ির মতো।

বিলাস বলল, মিছিমিছি এট্টা অনত্থ করবে। রসিক দেখেছে মাছ পেয়েছে। দামিনী জানলে—

সত্যি কথা। একলা পাঁচু নয়। অনেকেই এ রকম করছে। তার জন্যে দুর্গতিও কম হচ্ছে না। পাওনাদারে ধরে রাখছে নৌকা। মাছ ধরাই বন্ধ। এতদিনের চেনাশোনা। ফাঁকি দিলে পরে নিজের ফাঁকি পড়তে পারে। বিশ্বাস একবার ভাঙলে আর ফিরে আসে না। বিক্রি করতে হয়, জানিয়ে করো। অবিশ্বাসী হয়ো না।

পাঁচু বলল, ফিরে চল। পাড়ি দে।

হাল পাঁচুর হাতে। বাতাস আছে ভালো। বিলাস পাল তুলে দিল। দিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে তাকিয়ে রইল দক্ষিণে।

তারপরে হঠাৎ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, খুড়ো, সমুদ্রে যাব এবার টানের মরশুমে।

কী বললি ! হাল বেঁকে গেল। জল বাড়ন্ত। চলন্তার চলকায় ধুয়ে যাচ্ছে গলুই। বেগে বাতাস এল দক্ষিণ থেকে। এমন করে তো কোনোদিন বলে না বিলাস।

—সমুদ্রে যাবি ?

—হ্যাঁ, সমুদ্রে যাব।

—তবে কি সকল মানুষে এদ্দিন ধরে তোর সঙ্গে মসকরা করেছে? যাওয়া তোর বারণ আছে না?

—মারব মাছ, তার আবার বারণ। আমি মালো।

কিন্তু পাঁচুর কুটোকোটি মুখখানিতে রাশি রাশি পুঁয়ে যেন কিলবিল করে উঠল। চোখে দেখা দিল রক্ত। বলল,—বুইছি, শোরের লাতি, মেয়েমানুষের জন্যে তুই বিবাগী হতে চাইছিস।

—মেয়েমানুষের জন্যে?

—হ্যাঁ। ওই রাঁড়ের মেয়ের জন্যে।

—না। ভগবতীর মেয়ে এলেও, সমুদ্রে যাব খুড়ো। গঙ্গায় আমার মন মানছে না আর।

পাঁচু দেখল, বিলাসের বিশাল কালো শরীরে ঢেউ লেগেছে সমুদ্রের। গঙ্গা ওকে ধরে রাখতে পারছে না। বুকের মধ্যে বড়ো ধুকধুক পাঁচুর। তবু চীৎকার করে উঠল, সাবধান—গেলে তোর অকল্যেণ, সোম্‌সারের অকল্যেণ। সবাইকে তুই পাণে মারতে চাস রে যম কমনেকার।

বিলাস যেন কোনো-এক ভাবের ঘোরে গলা চড়িয়ে বলল, আমার বাপ গেছে, তার বাপ গেছে, তুমি গেছ খুড়ো। মাছ মারি আমি, আমি সাগরে যাব।

সাগরে যাব! সাগরে যাব! গায়ে কাঁটা দিতে লাগল পাঁচুর। ভয়ে চীৎকার করে উঠল, চুপ কর বিলেস, শোরের লাতি।

গলুয়ে চলকা ভাঙছে। জলের তলায় যেন কারা ঝাপাই ঝুড়ে, তোলপাড় ঢেউ তুলে দিয়েছে। বাতাসে ছুটে যেতে চাইছে পাল।

বিলাস যেন দূর থেকে বলল, খুড়ো, মিছে তোমার ভয়। আমি সেই ফোড়নের মুখে গেছলাম, যেখেন থেকে খালি লৌকো ফিরে এয়েছিল। বশীর আমাকে দেখিয়েছে। আমি কশার বেঁধে স্তে এয়েছি।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল পাঁচুর। ওরে সর্বনেশে, কপাল বেঁধে এসেছিস, তবু তুই মরতে যেতে চাস। মরণ বুঝি এমনি করে ডাকে।

ডাকুক, কিন্তু বাঁধা সুখের ঠিকানাটি কার কাছে রেখে যাবে পাঁচু। বলল, সকলের পাণ মুঠোয় ন্যে সমুদ্রে যেতে চাস তুই? যাওয়াব তোকে আমি। তার আগে তোকে লড়তে হবে আমার সঙ্গে। দুজনের এট্টা নিকেশ হব, তা পরে যা হবার হবে।

কিন্তু একটানা স্রোতের একড়ি জলের মতো বিলাসের মন যেন ঢলে নেমে গেছে। সে আর কথা বলে না।

চলন্তা হাসছে খলখল করে। দূর গড়কে আগনার লক্ষণ। বাতাসে আঁশটে গন্ধ। মেকোর মরণ ঘটেছে।

মাছ নিতে এল দামিনী। আতরবালা এল আর-একদিক দিয়ে। দামিনীর সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল নৌকার কাছে। আর যেন কেমন করে চেয়ে চেয়ে দেখল সে বিলাসকে। দেখে দেখে হাসল ঠোঁট টিপে টিপে।

দামিনী চলে যায় মাছ নিয়ে। বিলাস ডাকল, ওগো, ও ঠাকরুন, শুনছ।

দামিনী ফিরল।—আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ। তোমার লাতীন আসে না যে?

শোনো, শোনো ড্যাকরার কথা।

আতর হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, ওমা! কথাটা মিছে শুনি নি তালে মাসী। এদের মরণ ঘটেছে!

দামিনী রেগে উঠে বলল, আমার লাতীনে তোমার পেয়োজন?

—তা কী জানি। মন করল জিজ্ঞেস করতে, করনু। জবাব দেওয়া না-দেওয়া তোমার মন।

হ্যাঁ, আরে সর্বনাশ! ঝগড়া করিস তুই কাদের সঙ্গে? লজ্জা-শরমের মাথা খেয়েছিস একেবারে, এত বে-সামাল হয়েছে তোর প্রাণ? ভয়ও কি নেই একফোঁটা? আরে ইল্লুতে, আরে মরণ!

কিন্তু দামিনী বা দেখে কী বিলাসের দিকে অমন করে? বুঝি নিবারণ সাইদারের ছায়া দেখছে বিলাসের মধ্যে। সে যে সমুদ্রের ফড়েনী হতে চেয়েছিল, সেই কথাটি গায় বুঝি তার মন।

আতর যেন রাধার সখী বৃন্দা দূতী। রুপোর বিছেহারে বাঁধা তার অকূল কোমর। বাসি চুলে পান-রাঙানো ঠোঁটে, রঙ সর্বক্ষণ। চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলল, আমার ছোটোমাসী আর আসবে না। বলেছে, তার মরণ আছে ঘাটে, মরতে আর ঘাটে আসবে না, বুয়েচ?

দামিনীর পাতা-ঝরা ন্যাড়া বুকে বাতাস লাগল। আতরের কথাগুলি শুনতে শুনতে, স্রোতের মতো পাক খেতে লাগল বলিরেখা মুখ। চলে গেল বিড়বিড় করে।

আতর হাসতে হাসতে গেল কেদমে পাঁচুর নৌকার কাছে। মাছ ছিল কেদমের, দিয়ে দিল। কিন্তু যেন চুরি করে দিল। বড়ো ভয়ে ভয়ে বাপ্ব-ব্যাটারা উঁচু পাড়ের দিকে তাকায়।

যাওয়ার আগে, আতর ঘোমটা তুলে, আর-একবার হেসে বলে গেল, বড়ো জবর মরা মরেছ খুড়ো, তবে এখেনে কেন?

বিলাস যেন হাঁদা গঙ্গারাম। তাকিয়ে রইল পশ্চিমের উঁচুতে।

রাগে পাঁচু গরগরায়, তার চেয়ে হুতোশ বেশী। ওরে, অমন করে তাকাস কী? নিয়ে এলি উথালি-পাথালি বুক। তার উপরে বৃষ্টি নামালি অঘ্রানের। এবার দেখছি তোর ফতুর হওয়া বাকি।

বিলাস তিবড়িতে আগুন দিয়ে গেয়ে উঠল,

আমার কিছুতে নাই মন
আমি ভাসব অকূল পাথারে হে
এই আমার মতি বিলক্ষণ।

হে মা গঙ্গা, হে খোকাঠাকুর, বিলাসের আমার এই বিলক্ষণ মতি। আমি জানি, ও মাছ মারে। জলের তলায় বড়ো সংশয় তার জীবন। মীনচক্ষু সবসময় ডাক দিয়ে নিয়ে যায় তাকে অকূল পাথারে। সেইখানে তার আসল মরণ-বাঁচন। চারদিক থেকেই ডাক পড়েছে বিলাসের।

কিন্তু আমার রক্তে আর অকূলের ডাক নেই। ডেকে ডেকে সে মরেছে। যার মরে নি, সে আর ফেরে নি। আমি কূলে ভিড়তে চাই।

বিলেস, অকূল বড়ো ভয়ের। তোকেও কূলে ফিরতে হবে।

একটু বাদেই এলেন ব্রজেন ঠাকুরমশাই, কদম পাঁচুর মহাজন।

মাছমারা মানুষ, ঠাকুর তাদের তুই-তোকারি ছাড়া কথা বলেন না। দশ-বিশ গণ্ডা জেলে নিয়ে তাঁর কারবার। সবরকমে বড়ো পাইকের উনি এই গঞ্জের। বাইরের চালানিও বিস্তর আসে ঠাকুরের। ঠাকুরকে দেখে, কেদমের মুখখানি আমসি হয়ে গেল। বলল শুকনো হেসে, এই যে, আসেন ঠাকুরমশায়।

ঠাকুর বললেন, কি রে, মাছ পাস নি?

হাত দুটি জোড় করল কেদমে। বলল, পেয়েছিলাম গো মশায়, দিয়ে ফেলিচি।

—দিয়ে ফেলিচি?

ঠাকুরের ফরসা মুখখানি লাল হয়ে উঠল। খবর জানতেন আগেই।

বামুন মানুষের ছিরিমুখের কথা শোনো, তোর কোন্ বাপের ধন দিয়ে ফেলেছিস? গত সনের কটা টাকা শোধ দিয়েছিস, অ্যাঁ? দিয়ে ফেলিচি!

মহাজনের এমনি কথা। তার ওপরে শহুরে বাস। গাঁয়ের মহাজনের ভালোমন্দ বুঝতে কষ্ট হয় না। সে প্রাণে মারবে কিংবা রাখবে, গতিক দেখে ঠাহর পাওয়া যায়। শহুরের ব্যাপার বোঝা দায়।

কেদমের ছেলে দুটিও হাত গুটিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ঠাকুরের দিকে।

কেদমে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে ঠাকুরমশায়, বড়ো কু-কাজ করেছি। তিনখানি রাত পোহালে আর এ মনিষ্যি কটার পেটে কিছু পড়বে না। তাই নগদা বেচে দিইচি।

যথার্থ কথা, নির্যস প্রাণের কথা। ওই এক ব্যায়রামে মরেছে তাবৎ মাছমারা। কোথাও তার সত্যরক্ষা হয় না।

কিন্তু ঠাকুর মানবেন কেন। বললেন, প্রাণ জল করে দি । এই শ্রাবণ মাস, ভালো চালান নেই, নদীতে আকাল, শা আমাকে তিনটে মনিষ্যির পেট দেখাচ্ছে।

শোনো মহাজনের বচন। তাই পাঁচু বলে, ওরে মাছমারা, সুদিনে তুই এক, দুর্দিনে তুই আর-এক মানুষ। তোর মরণ নেই, তাই পেটের দায়ে তুই মিছে কথা বলিস মহাজনকে।

উপরের পাড় থেকে নেমে এল রসিক। সেও ঠাকুরের দাদন খায়। যেন ব্যাপারটি আঁচ করে বলল, মাছ বেচে দিয়েছে বুঝিন?

বুয়েচি বাবা, আতরবালাকে বেচে দিয়েছ। রোজ দেয় ঠাকুরমশাই, একদিন আর কী করবেন। দেখতে সব ভালোমানুষ, ভাজার মাছটি উলটে খেতে জানে না। তলে তলে সব ঘুন।

ঠাকুরের মুখ দেখে বোঝা যায়, তেতে এসেছেন আগে থেকেই। কে তাতিয়েছে বোঝ এবার।

বিলাস বলে উঠল, ওই এলেন আবার শানাইয়ের পোঁ।

কথাটা ভালো শুনতে পায় নি রসিক। কিন্তু বিলাসের ভাব দেখে ফিরে তাকাল।

পাঁচু চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, চুপো, মাকড়া কমনেকার।

ঠাকুর বললেন, কেন, ও মাগীর মুখ বড় মিষ্টি লেগেছে বুঝি? দেখছি শালার জাত খারাপ।

পাঁচটা নৌকা পাশাপাশি। ঠাকুরের কথাগুলি যেন সবাইকে মেরে উস্তোম খুস্তোম করছে। সবাই হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ।

কেদমে কী বলতে যাচ্ছিল হাত জোড় করে। তার আগে বিলাস বলে উঠল, তা অত গাল দিচ্ছেন কেন গো মশায়?

ওই শোনো। আরে তুই কার মুখের উপর কথা বলছিস। শহর-গঞ্জের আড়তদার, ঠাকুরকে তুই চিনিস না।

ঠাকুর ফিরে তাকালেন। বললেন, কী হয়েছে?

বিলাস বলল, বলছি বলে, হাত জোড় করে ক্ষ্যামা চাইছে মানুষটা, অত জাত বেজাত করছেন কেন?

ঠাকুর বললেন, বড়ো যে পীরিত দেখছি?

পাঁচু প্রায় ডুকরে উঠল, এই, এই বিলেস!

রসিক বলল দুচোখে আগুন জেলে, এর বড়ো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ঠাকুরমশাই।

—কেন, কোন্ গরমে?

[illegible] বলল, বড়ো গরম। দামিনীর নেশা খায়।

ঠাকুর বললেন, গালাগালে অত যদি লাগে, তুই শোধ দে না।

যেটা মনে আসে, সেটা সহজ করে বলে বিলাস। সেখানে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলল, সে এ্যঁজ্ঞে আমার মুরোদ নাই।

—তবে ?

—তবে আপনার বড়ো মুখে ছোটো কথা ভালো না। জাত বেজাত কেন ? ট্র্যাকা নিয়েছে পুলুশে দেন !

পুলুশ, অর্থাৎ পুলিশ। পাঁচু ততক্ষণে ভয়ে ও রাগে কাঁপছে। হাতের কাছে কিছু খুঁজে না পেয়ে, অগত্যা খানিকটা পাঁক কাদা তুলে ছিটিয়ে দিল বিলাসের গায়ে। প্রায় আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল, আরে মড়া রে, শোরের লাতি, আজ তুই মরবি।

বলে, নৌকা থেকে নেমে ঠাকুরের সামনে গিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না ঠাকুরমশায়, এই শোরটাকে স্যে আমার বড়ো জ্বালা। ওর মুখ বড়ো খারাপ, মাপ করে দেন।

ঠাকুর যেন কেমন একটু হকচকিয়ে গেছলেন। বিলাস তখন মাথা নীচু করে গায়ের কাদা ধুচ্ছে। খুড়ো-ভাইপোকে দেখে ঠাকুরের রাগের মাত্রাটা কেমন যেন ঝিমিয়ে গেল। বললেন, মুখটা তা হলে একটু মিষ্টি করা দরকার তোমার ভাইপোর। ইজ্জত জ্ঞান থাকা ভালো। সেটা এর মধ্যে তো পাই নে।

বলে কেদমের দিকে দেখালেন। বললেন, তুমি কী মাছ পেলে, দামিনীকে না দিয়ে আমাকে দিতে পার ? জাত বলতে আমি তোমাদের জাত তুলে কথা বলি নি, এই ব্যাটার ছোঁচ-গিরির কথা বলেছি।

তা বটে। কিন্তু এ সংসারে যে মাছমারাকে ঋণ খেতে হয়, তারা সবাই কেদমের মতো ছোঁচা। পাঁচু চুপ করে রইল। ঠাকুর বিলাসকে মাপ করেছেন, সেইটাই অনেকখানি।

ঠাকুর চলে যাওয়ার আগে আর-একবার বললেন কেদমকে, নোলাটা একটু কম কর, বুঝলি? টাকা শোধ না হওয়া ইস্তক মাছ যেন আর কারুর ঝাঁকায় না ওঠে, বলে গেলুম।

ঠাকুর চলে গেলেন। পিছে পিছে গেল রসিক। সেও মাছমারা। কিন্তু প্রাণটি যেন মাছমারার নয়। যে মাছ মারে তার মাৎসর্য ভালো নয়। কেন না, তোমাদের সকলের বাঁচা-মরা একখানে।

ঠাস করে একটা শব্দ হল। সবাই চমকে ফিরে তাকাল কেদমের নৌকার দিকে। কেদমে তার বড়ো ছেলের পিঠে একটি চড় মেরেছে। মেরে বলল, গালে হাত থুে ভাবছটা কী, অঁ্যা, আমার মানী ব্যাটা? গিলবে তো, তিবড়িতে আগুন দেও।

পরান চমকে উঠে হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাপের দিকে। তারপর উঠে গেল। সকলেই চুপচাপ। কেদমে গিয়ে ছইয়ের মধ্যে লুকাল।

ঠাকুরের অপমানটা যত না লেগেছে, তত লেগেছে বিলাসের প্রতিবাদ। বিলাসের ওপর রাগ নয়, নিজের জোয়ান ব্যাটা বসে রইল কাঠের পুতুলের মতো, ইজ্জতে ঘা লাগল কেদমের? কে? না, যার উপরে মনটা কেদমের বিরূপ, সে।

পাঁচু বলে উঠল, আহা, কর কী কেদম।

জবাব দিল না কেদম। মাথা গোঁজ করে, তাকিয়ে রইল জলের দিকে। চোখ দুটি জ্বলছে দপদপ করে।

সব নৌকোর মাঝিরাই চুপচাপ। কথা যোগায় না কারুর মুখে।

জলের কলকলানিও থেমে এল। জল যেন স্থির হয়ে গেল আগনার মুখে। জোয়ার আসছে। তলে তলে এসে গেছে, তাই গঙ্গাও চুপচাপ। তার বুক ভরে সে নীরব হল। মাছমারা নীরব হল কিসের ভারে?

সন্ধ্যা এখনো নামে নি। দিন তবু যায় যায়। পশ্চিম আকাশের কানকো ছিঁড়ে যেন রক্ত পড়ছে। সূর্য হেলে গেছে চোখের আড়ালে। দলা-দলা মেঘ, পুব-বাতাসে যায় পশ্চিমে। তাতে দিন-শেষের আলো পড়ে মনে হয় যেন, রক্তের টোপানি ঝরছে আকাশের ঢালুতে।

মাছমারার বুকের ঢালুতে কত রক্ত ঝরে, সেটা দেখা যায় না। অপমান আর লাঞ্ছনা নতুন নয়। তবু, নতুন করে বাজে প্রতিবারেই।

সমুদ্রে, পানসা জালের জগৎ-বেড়া ঘের দিয়ে যখন মাছ ধরে, তখন কেনবার লোক পাওয়া যায় না। বন্দরে, মোহনায়, বড়ো বড়ো আড়তদার পাইকেররা দাঁড়িয়ে থাকে বরফ-ভরতি লরি নিয়ে। সাই-ভরা মাছ। প্রতি নৌকোতে পাঁচ-সাত মণ করে থাকে। কত মাছ নেবে নাও। দরাদরি হয়।

কত করে মণ হে? পাইকিরি দর বলো।

মাছমারা বলে, তিরিশ ট্যাকা দেন।

আড়তদার, চালানদার মুখখানি শক্ত করে থাকে। থাকবেই, মাল যে বড়ো বেশী দেখা যায়।

তবে পঁচিশ দেন? তাও নয়। কুড়ি? পনেরো?

মাছমারাকেই দর নিয়ে নামতে হয় মুকড়া জলের টানের মতো। বাজার নেই তার হাতে, মোটর লরি নেই তার। বরফ-কলের সঙ্গে নেই কারবার। ওই জগৎটি তার নাগালের বাইরে।

কিন্তু অকূলে-সঁপে-দেওয়া প্রাণের বিনিময়ে যে মাছ এল, তাতে যে পচন ধরে। কষ্টের কেষ্ট যে একেবারে পেছন দেখাবে। ধরে রাখবার উপায় নেই। নৌকোর খোল খালি করতে পারলে সে বাঁচে।

তখন পাঁচে নামে।

মহাজন থুথু ছিটিয়ে টাকা গোনে। হেসে বলে, একদিনের কারবার তো নয়। তোমারো কিছু থাক, আমারো কিছু হোক।

তা বটে। মাছমারা দেখে, মীনচক্ষুর অপলক চোখে বড়ো হাসি চিকচিক করে। জোয়ার কাটিয়ে, সে আবার চলন্তায় ছোটে অকূল সমুদ্রে। তার প্রাণ পড়ে আছে সেখানে।

শহরের মানুষ বলো, কী দরে তুমি মাছ খাও?

মাছমারার মাছ পেলে জ্বালা, না পেলেও জ্বালা। দেখা যায় যেন এইটিও তার জীবনেরই বিধান।

তবু মাছমারার প্রাণ জ্বলে কেন? না, মন মানে না।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ডিবড়িগুলি জ্বলছে সব একসঙ্গে। আগুন জ্বলে দপদপিয়ে।

শ্রীদাম মাঝি নামগান করে, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ···

শুধু বিলাস তাকিয়ে থাকে উঁচু পাড়ের দিকে।

এমন সময়ে একটি নৌকো এসে ভিড়ল পাঁচুর নৌকোর গায়ে। সয়ারামের গলা শোনা গেল, বিলেস!

বিলাস একটু অবাক হয়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।

এ নৌকোয় নেমে এল সয়ারাম। অন্য নৌকোটি সয়ারামকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল উত্তরে।

পাঁচু বলল, ওটি কার লৌকোয় এলে?

সয়ারাম বলল, এদিককারই লৌকো। ওপার থেকে আসছিল, বললাম, এট্টু পার করে দেও আমাকে।

—অ।

আসলে সয়ারামের নজর বিলাসের দিকে। কিন্তু বিলাস নির্লিপ্তভাবে বাঁশের নল দিয়ে ফুঁ দিচ্ছে উনুনে। খুড়ো আছে গলুয়ে, বিলাস কাঁড়ারে। সয়ারাম কোনো কথা না বলে এসে বসল বিলাসের সামনে। চোখ মিটমিট করে তাকাল। এমনিতেই তার মুখখানি সর্বক্ষণ শুকনো শুকনো। মাছ নেই। তার উপরে নিজেদের

নৌকোই ভাড়া খাটছে নিজেদের কাছে। নৌকোর সংসার বড়ো টলমল করছে।

বিলাস বলল, কী মনে করে?

সয়ারাম একবার উঁচু পাড়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, এই এলু একবার। আসব আসব করি, আসা হয় না।

বিলাস বলল, ফিরে যাবি কেমন করে?

সয়ারাম সংশয়-ভরা চোখে তাকিয়ে বলল, রাতটা থাকব তোর কাছে।

—কেন?

—কেন আবার কী, মন চায় না?

বিলাস একবার ভ্রূকুটি করে তাকাল সয়ারামের দিকে। সয়ারাম গালে হাত দিয়ে বসল।

বিলাস বলল, তবে চাল বের করে নে আয় ছইয়ের মধ্যে থেকে।

চাল বের করে, ধুয়ে, হাঁড়িতে দিয়েও সয়ারাম গালে হাত দিয়ে বসল।

বিলাসের কালো চোখে মুখে তিবড়ির আগুন লকলক করছে। সয়ারামের চোখে ভয় ও সংশয়। কী জানি, অন্তরে অন্তরে বিলাস হেসে আছে কি রেগে আছে।

গলা নামিয়ে বলল সয়ারাম, কথাটা শুনলুম কেদমে খুড়োর ছেলে পরানের মুখে। সত্যি তবে?

বিলাস যেন গায়ে মাখে না। কাঠের হাতা দিয়ে, হাঁড়িতে ভাত নেড়ে বলল, কোন্ কথা?

—বুড়ী ফড়েনীর লাতীনের কথা?

—কী কথা?

—বড়ো নাকি জবর মেয়ে?

—হবেও বা।

—তোকে দেখলে নাকি চোখে মুখে তার বেজায় হাসি দেখা দেয়?

—তা হবে।

হুঁ, গতিক বড়ো সুবিধের নয়। বিষের ক্রিয়া হয়েছে, মনে হয় বড়ো খাপচি কেটে কেটে কথা বলে যে বিলেস। বলে, তোকে দেখলে আর থির থাকতে পারে না?

—হতে পারে।

—শুনিচি, পয়সাওয়ালা ফড়েনী।

বিলাস জবাব দেয় না।

সয়ারাম আবার বলে, ওখেনে তবে তোর মন বসেছে?

বিলাস ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। বলে, মন আবার বসে কেমন করে?

—ও-ই হল। মন টেনেছে তা হলে?

জবাব নেই বিলাসের। চোখ পাকিয়ে তাকাল সয়ারামের দিকে। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না তার। বলল, চুপ মেরে থাকিস নে বিলেস, বল, বল না কেন?

—কী, বলতে হবেটা কী?

—বলে, এটা তো আমার অঘটন বলে মন গাইছে। অঘটন ছাড়া কিছু ঘটাস নে তুই। আমাকে বল, তোর মন টানছে না?

বিলাস ঘাড় তুলে, ক্রুদ্ধ চোখের খোঁচা মারল সয়ারামকে। সয়ারাম বলল, হাত তুলিস নে যেন, খুড়ো দেখে ফেলবে। আমি বুয়েচি, তুই মায়ায় পড়েছিল। মন মানছে না তোর?

—কেন? না মানলে তুই দিবি?

সর্বনাশ, এ তো আর রাখ-ঢাক নেই। ডাকিনীর মায়া লেগেছে বন্ধুর। শহর-ফড়েনীর সর্বনাশী ফাঁদে পড়ে গেছে। যা শুনেছে,

তা হলে মিথ্যে নয়। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা গেছে। মনের দিশা নেই। বলল, কী বললি?

—বলব আবার কি রে ন্যাকা। না মানলে তুই দিবি?

—দেয়াদেয়ির আছে কী। শুনি, সে তো বেবুশ্যে।

দমাস করে একটি ঘুষি পড়ল সয়ারামের কাঁধে। ধুপ করে যেন কাঁঠাল পড়ল গাছ থেকে। বলল, শালা আমার, বানচত। যাকে যা-নয়, তাই বলছ? কত লোক তার পায়ে গড়াগড়ি খায়, সে আবডাল দিয়ে বাঁচে, তাকে বেবুশ্যে বলছ?

হাতের কাছে আর-কিছু ছিল না। নইলে সয়ারামের মরণ ছিল। কাঁধটায় লেগেছে সয়ারামের। কাঁধ হাতিয়ে, এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, থাক, মারিস নে, আমার লেগেছে। খুড়ো দেখতে পাবে। ভগমান আমাকে খালি সইতে দিয়েছে।

সয়ারাম গালে হাত দিয়ে বসে রইল চুপ করে। বিলাস আবার বলল, খারাপ যা বলবার, তা আমাকে বল, তাকে কেন?

বিলাস শিলের উপর হলুদ ফেলে, নোড়া দিয়ে ছেঁচতে লাগল।

শব্দহীন ব্যাকুলতায় জোয়ারের জল পাড় ভাসিয়ে দিয়েছে। আকাশে একফালি চাঁদ। আলো তার কেমন যেন কুহকী মায়ায় ঘেরা। সব কিছুই দেখা যায়, আবার দেখা যায় না। আকাশের তারা খসে কিংবা জোনাকি ওড়ে, ঠাহর হয় না।

সয়ারামের মনটা হঠাৎ উলটো গেয়ে উঠল। তাই তো! বন্ধু আমার অমর্ত্তর বউকে ফেরায়, সেখানে তার মন বসে নি, প্রাণ টানে নি। এখানে কেন এমন হল? কিছু বুঝেছে নিশ্চয়। গামলি পাঁচীতেও যার মন ওঠে নি, ওখানে তার বুক উথালি-পাথালি করে উঠেছে। তাকে তুমি ছাখ-রঙ বলতে পারবে না। অর্থাৎ, যাকে দেখি, জোয়ান মেয়েমানুষ হলেই হল, তাকেই আমার ভালো লেগে

যায়, তা নয়। বিলাসকে তো চেনে সয়ারাম। কিন্তু এ কোথায় এসে মন পাতলে বিলাস। বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে কেমন করে

সয়ারাম বলল, সে রোজ আসে বিলেস?

বিলাস বলল, না। বলেছে, আসবে না। এখেনে তার মরণ আছে, তাই।

আ পোড়াকপাল! বিলাসের মন পুড়ছে। এ যে মন ফসফস করার বাড়া। কিন্তু সে যদি না চায়, তবে বিলাস মন পুড়িয়ে মরে কেন?

চিকচিক করে বিদ্যুৎ চমকাল। এর মধ্যেই কুহকী আলোটুকু কখন গেছে। জমাট বেঁধেছে টুকরো মেঘ। ভরা জোয়ারে জলের স্রোত উঁচু পাড়ে উঠতে চায়।

পাঁচু যেন ঝিমুচ্ছিল এতক্ষণ। কলসী নিয়ে উঠে এল কাঁড়ারে, জল আনতে যাবে।

সয়ারাম বলল, খুড়ো, আমাকে দেও, জল নে আসি। জল ভেঙে আবার তুমি কেন যাবে।

পাঁচু কলসীখানি দিল সয়ারামের হাতে। সয়ারাম বলল, চ বিলেস, দুজনে যাই।

বিলাস বলল, চ।

হাঁরে ক্যাংলা, খাবি? না, হাত ধোব কোথায়? পাঁচু দেখে, জোয়ারের জলে ছপছপ করে, কেমন করে বিলাস চলে যায়। সয়ারামের সামনে পাঁচু কিছু বলতে পারল না। কিন্তু বুকে রইল বড়ো ধুকধুকুনি।

উঁচু পাড়ে উঠে, সরু রাস্তা গেছে পশ্চিমে। দুপাশে বাড়ি। টালি-খোলা-গোলপাতা-ছাউনি ঘরের সারি। সামনে একটি বিজলী আলো টিমটিম করছে। তার নিচে টেপাকল।

আশেপাশে গলার স্বর শোনা যায় মেয়ে-পুরুষের। মোটা মেয়ে-গলার গান ভেসে আসছে কোত্থেকে,

মাথা খাও, যেও না কো
পরানে দাগা দিয়ে।

সয়ারাম কলসী ধরেছে, হাতল টিপছে বিলাস। গান শুনে দুজনে তাকাল দুজনের দিকে। কিন্তু, বিলাস বারে বারে একটি বাড়ির দিকেই তাকায় কেন; নাতনীর বাড়ি বুঝি ওইটি। বন্ধু বড়ো কান খাড়া করে আছে। চোখে তার পলক নেই। সেখানে ঘোর মায়া।

কলসী উপচে জল পড়ে যায়। সয়ারাম বলল, চ বিলেস, কলসী ভরে গেছে।

এমন সময়ে মানুষের ছায়া দেখে দুজনে চমকে উঠল। দেখল, দুলাল খুড়ো।

হেসে বলল দুলাল, খুড়ো যে। জল নিতে এসেছ? কিন্তু উলটো হয়ে গেল যে?

—কেন?

—জল আনতে যাওয়ার কথা তো আর-একজনের গো।

বলে কেশো গলায় হেসে উঠল দুলাল। শব্দটা চাপা, কিন্তু দুলালের খালি গা যেন আওড়ের জলের মতো ফুলে উঠল। বলল, আমার ছোটোমাসী গেছে ডাক্তারের বাড়ি। তার রোগ হয়েছে।

বিলাস পাড়ের দিকে মুখ করে বলল, অ।

—হ্যাঁ, বড়ো নাকি হাঁকপাক করে বুকের মধ্যে, অবশ অবশ লাগে, ধড়ফড় করে।

তবু বিলাস চলে যায় দেখে দুলাল বলল, কই গো খুড়ো, দাঁড়াও, একটা বিড়ি খেয়ে যাও নিদেন।

দুলাল বলল, আর-একদিন হবে। খুড়ো একলাটি বসে রয়েছে।

বিলাসের মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল সয়ারাম, ওরে বিলেস, এ কী দেখছি! দেখছি, তোর মন আর মানছে না।

দুলাল আবার বলল, আর-একটা কথা শুনলুম। রসিকেরা নাকি বাঁধাছাঁদি জাল পাতবে।

ওই দেখো, কালী গোখরো অমনি ফণা তুলেছে। চকিতে শক্ত ঘাড় ফিরিয়ে বলল বিলাস, এ শরীলে পাণ থাকতে সেটি হতে দেব না খুড়ো। আমরাও মাছ মারতে এয়েচি।

দুলাল বড়ো ভালোবাসে তাকে। একটুক্ষণ বিলাসের রাগ দেখে বলল, নিশ্চয়, সেইজন্যেই তো তোমাকে বললুম।

উঁচু পাড়ের ঢালুতে বিলাসকে দেখে পাঁচুর নিশ্বাস পড়ে। বড়ো ভয় লাগে। চোখের আড়াল হলেই আন কথা মন্ত্র দেয় বিলাসের কানে। উঁচু পাড় থেকে যে ওর চোখ নামে না।

এখনো জোয়ার ফুলছে। কূল ভেসেছে, তবু শব্দ নেই। তবু যেন কী এক বিচিত্র শব্দ চাপা সুরে বাজে। সে শব্দ দক্ষিণের। পাঁচু বলে, দক্ষিণের জল, বিলেসকে ফিরিয়ে দাও তুমি।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল শুক্লপক্ষের দশমী। জোয়ান কোটালের এই তো মুখপাত। অমাবস্যার জোয়ান কোটাল ছুটকির ছেউটি টান। আর এই শুক্লপক্ষের শ্রাবণ্যে গঙ্গা, কূলে আর তাকে ধরে রাখা যায় না। অম্বুবাচীর জলে যে-অনাগত কালের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সে কাল আজ দেখা দিয়েছে দিগন্ত ভাসিয়ে। প্লাবন দেখা দিয়েছে। মেয়ে আর কোনো শরম মানে না। সে আজ বড়ো রঙ্গিণী হয়েছে। রক্তে তার নেশা, শরীর রড়ো টলোমলো মাতালের মতো।

মীয়াজীপীরের দহে, কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কার অত ঘুংড় নাচের ঘুঙুর বাজে ঝমঝমিয়ে। দক্ষিণের আওড়ে কোন্ খ্যাপা মহাকাল বুকে ধরে টানে রঙ্গিণীকে!

সাবধান, সাবধান হে!

কলকল খলখল করে নিরন্তর নামছে ঘোলানি। উত্তরের ঢল এখনো নামছে কলকল নাদে। যেন, সেও প্রলয় চায়।

এতদিন কচুরিপানার দেখা ছিল না। কোথায় কোন মজা গাঙ ভেসেছে, মজা পুকুর বিল বাওড় গ্রাম সুদ্ধ ডুবেছে, তাই এত কচুরিপানা।

কিন্তু জলে যে আসল কিছু দেখা যায় না। মেকো কেন নেই জলে একটিও। রসনা চিংড়ির তিড়িংবিড়িং কোথায়। এত জল, কিন্তু গঙ্গায় বেনপোকাটিও নড়ে না।

মাগো গঙ্গা! ভগবতী! তোর বুক জুড়ে যে রক্তের ঢেউ দেখি! গাঢ় লাল রক্ত বয় স্রোতে। কঁ্যাচা দিয়ে গিঁথলে যেমন রক্ত ওঠে ভলকে ভলকে, তেমনি রক্ত ওঠে তোর আওড়ের আবর্তে, দহের পাকে।

শুক্লপক্ষের জোয়ান কোটালের প্রথম মুখে, প্রথম অঘটন ঘটল হাসনাবাদের সুরুলের।

পাঁচু আর বিলাস ফিরে আসছিল পুব থেকে। ভাটা গেছে শূন্য। নৌকো টানতে মন চায় না। শরীর যেন অবশ লাগে।

সুরুল ফেলেছিল বিনজাল। বাঁশের জোল ভাসছে স্রোতের মুখে আটকা-পড়া সাপের মতো। নিচে, মাটির সঙ্গে জাল গাঁথা আছে কাঁকড়া দিয়ে। কাঠের মস্ত বড়ো লাঙলের মতো খোঁচা। যেন মস্তবড়ো বর্শা। তাকে বলে কাঁকড়া,. কামড়ে ধরে থাকে মাটি।

পাশ দিয়ে আসছিল পাঁচুর নৌকো। হোল কাছি ধরেছে মুরুলের ভাই। ওচোল কাছি,' অর্থাৎ ওকোড় কাছি ধরে টানছে মুরুল। জোয়ান মুরুল, শক্তিমান পুরুষ, হাতের পেশী কাঁপে থরথর করে, তবু জাল ওঠে না।

পাঁচু পাশের কানদড়ি ঢিল করল। হালে চাপ দিয়ে গতি ধীর করল নৌকোর। জিজ্ঞেস করল, কী হল গো মুরুল?

মুরুলের সর্বাঙ্গে ঘাম। একেবারে নেয়ে উঠেছে! মাছমারা জানে, ওটা ঘাম নয়। হাত দিয়ে দেখো, মনে হবে তেল। নির্যাস তেল, লালার মতো ভারী। কাছি চেপে বসেছে হাতে। হাজা ফেটে রক্ত পড়ছে। তবু টানে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালার জাল যে ওঠে না পাঁচদা।

ওঠে না? তা বটে, বিন্ জাল তো। গহীন গাঙের তলায়, একেবারে পাতালে গিয়ে ঠেকে যায়। কিন্তু অত বড়ো জোয়ান মানুষের টান, ওঠে না কেন জাল?

খাড়া দাঁড়িয়ে, লোহার-তার-জড়ানো কাছিতে আবার টান দিল মুরুল। চীৎকার করে বলল ভাইকে, আমমুলে, হোলকাছিতে টান মার।

আমামুলও টান দিল। নৌকো কাত হয়ে জল উঠল বগবগ করে। ভয়ে পাঁচু হাঁক দিল, সাবধান, মুরুল!

আমামুল ধপাস করে পড়ে গেল পাটাতনের উপর। কী হল?

দেখা গেল, মাটিতে গাঁথা কাঁকড়া জলের উপর ভেসে উঠেছে বিকট বিশাল জন্তুর মতো।

পাঁচুর বুকটা প্রথম ধক করে উঠল। হেই গো মা গঙ্গা, সব্বোনাশ করেছিল।

আমানুল চীৎকার করে উঠল, হোই আল্লা! জালখান বেলিয়ে গেছে গো ভাইজান।

বেলিয়ে গেছে?

—অঁ।

খুড়ো-ভাইপো চোখাচোখি করে এ নৌকায়। নুরুল দেখল, ওকোড়কাছি ছিঁড়ে গেছে তার হাতে। কাঁচা মাংসের মতো হাত দুখানি রক্তারক্তি হয়েছে। নৌকো ভেসে যায় দেখে, হাল ধরল সে। নৌকো নিয়ে আবার এল সেখানে। অপলক দুচোখ ভরে, দুভাই তাকাল জলের দিকে।

রক্তাম্বরী গঙ্গা হাসে খলখল করে স্রোতের বাঁকে বাঁকে। ছোটো ছোটো ঘূর্ণি পাক দিয়ে নাচে বেজায়। কী আছে জলের তলায়, কে আছে, কে এমন খেলা খেলে, কিছু দেখা যায় না। তবু চোখের পাতা পড়ে না। জল দেখে দুই ভাই।

গহীন জলের জাল, বালিচাপা পড়ে গেছে। তার নাম বেলিয়ে যাওয়া। বড় সর্বনাশের যাওয়া। আর কোনোদিন ফিরে পাওয়া যাবে না।

এই ঘোলা মিঠেন জলে, সুদিনের বান ডাকে। দিলে সে ভরে দেয়। না দিলে সে এমনি করে মারে। জলে তার দন্তাঘাত হয় না। তাই তাকে মা বলেছ তুমি। কিন্তু ছেয়ালো শরীরে তার যৌবন এসেছে, এখন তুমি বাঁচিয়ে ফের নিজেকে। গহীনে তার নানান রদবদল। নতুন চরের মাথা তুলবে সে কোথায়, তাই টেনে নিয়ে আসছে বিশাল বালুর পাহাড়। তলায় যার জাল পড়ে সেই সময় তার রেহাই নেই।

বাতাস ঢিল দিল। পাঁচু বলল, দাঁড় ধর বিলেস।

বিলাস তখনো তাকিয়ে ছিল নুরুলের নৌকার দিকে। দূরে

জলের দিকে তাকিয়ে বলল, নদীটা এবারে যেন বড্ডো খাই খাই করে।

পশ্চিমের শ্মশানঘাটে চিতার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। লেলিহান শিখা আকাশে উঠতে চায়।

পরদিন শূন্য ভাটার বৃথা গড়ান মেরে এসে, বিলাস গেল ছইয়ের মধ্যে চাল বের করতে। চালের ধামার ঢাকা খুলে বিলাসের বুক চমকে উঠল। ডেকে বলল, অ খুড়ো, চাল যে মাত্তর একজনের মতন আছে।

—অ্যাঁ?

আর কথা সরে না পাঁচুর মুখে। সমুদ্রের হামাল ডাকল বুকে। যে ডাক শুনে সমুদ্রের মাছমারা টানের দিনেও পালাতে পথ পায় না।

দখনে বাওড়ে হ্যাকা পড়ল আছড়ে। জলের টানে বড়ো শাসানি। কোন্ অদৃশ্য থেকে মহামরণ হাত তুলে তাড়া দেয়,—পালা পালা।

নগদ টাকা বের করল পাঁচু। বের করতে হল মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে-আসা টাকা। কিছু ঋণ শোধ হয়েছিল দামিনী আর তার নাতনীর। ঘরে বাইরে মাথা-বোঝাই ঋণ এখনো বাকি। জোয়ান কোটালের মুখেই আগে নগদ টাকায় হাত। মহাজনের রক্ত-চোখ দপদপ করে জ্বলছে সেই টাকায়। বলছে, পাঁচু, সুদে-আসলে যা হয়েছে, তোমার ভিটের দামে সে ঋণ শোধ হবে না। ওই ভিটেখানি ছাড়া আর তো তোমার কিছু নেই।

গড়ানের পর গড়ান যায় বৃথা। ওকোড় মারার ডাক আসে না খুঁটনির গা বেয়ে। যেমন নাকি ডাক্তার কবিরাজ মশাই তোমার নাড়ি দেখেন হাত টিপে,—নাড়ির গায়ে খবর পান, তোমার প্রাণ আছে কি নেই,—এও তেমনি। খুঁটনি বেয়ে সেই প্রাণের খবর আসে না। উজান ঠেলা সার। তবু আগনায় প্লাবনের লক্ষণ। সহস্র

ফণা মেলে, গোঁ শব্দে আসে সে দুকূল ভাসিয়ে। মুখে তার ফেনিয়ে-ওঠা গ্যাঁজলা ওঠে। সামাল সামাল রব পড়ে মাছমারার। নৌকো ঠিকমত না আগলাতে পারলে, বানের ঝাপটায় চুরমার হতে পারে। আর মুকড়ায় বড়ো দুর্বিষহ টান। জলের টান নয়, মনে হয়, কে যেন তার শক্ত হাতে নৌকো ধরে হু হু করে টেনে নিতে চায় সমুদ্রে।

বাতাস গেছে একেবারে ঘুরে। পুবে সাঁওটা এসেছে জল মুখে নিয়ে। বড়ো ভারী বাতাস। আড়-পাথালি নৌকোর গলুয়ের ঝুঁটিটা যেন মুচড়ে দিতে চায়। বাতাস সোঁ সোঁ করে ডাক ছাড়ে এই গাঙের বুকে। গঙ্গা যেন আরো অকূল হতে চাইছে।

বিলাস গড়ান মারে আর বলে, হত যদি সমুদ্রের পাটা জালের ঘের, লৌকোর পুরো খোল বোঝাই হত এতক্ষণে।

সমুদ্র, সমুদ্র, সমুদ্র। দক্ষিণের নিশি-পাওয়া বিলাস। শুধু ওই ডাক শুনতে পায় সে। কিন্তু সমুদ্রে মরণ বসে আছে না ওত পেতে?

পাঁচু তাকায় রক্তগোলা জলের দিকে। সমুদ্রের শমন যেন এখানেও এসেছে, থাবা বাড়িয়েছে। সে নেই কোথায়? এ গঙ্গায় কিসের ছদ্মবেশে ঘুরছে সে?

তবু বিলাস তাকিয়ে থাকে উঁচু পাড়ে। ওর গড়ান যায় বৃথা, ধামায় নেই চাল। যেন সমুদ্রের ডাক শোনে উঁচু পাড়ের দিকে চেয়ে।

বৌঠান, এ বাতাসে তোমাদের নিশ্বাস শুনতে পাই। জানি তোমরা ফিরছ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। গোটা সংসারের সকলের চোখ এখন এই মাছমারার উপরে। বিলাসকে তুমি ডাক দিয়ে নাও ফিরিয়ে।

এল শ্রাবণের পূর্ণিমার কোটাল। জোয়ান কোটাল।

জগন্নাথ ঠাকুর এসেছিলেন, চলে গেছেন। শ্রাবণের ধারায় ধুয়ে গেছে তাঁর রথের চাকার দাগ। এবার শ্রীকৃষ্ণ আসছেন ঝুলন খেলায়। কদমফুল ফুটেছে গাছে গাছে। গঙ্গার তটে তটে বনহেনার ঝাড় সাদা হয়ে উঠেছে। চারিদিকে সবুজ লকলক করছে ধারায় স্নান করে। বিষকাটারির ঝাড়ে বাতাসের হাহাকার দিবা-নিশি। নেলোবন মাথা কুটছে।

কদমের তলে পেখম মেলবে ময়ূর। দেখে পাগলিনী হবে ময়ূরী। নীপবনে দুলবে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে। শোনো, মেলার বাঁশি ডাক দিয়েছে নগর-গ্রামের মানুষকে।

মাছমারারা কাছে কাছে থাকে পরস্পরের, চোখে চোখে তাকায়। কথা বলে না। যে কথাটি বুকের ভারী গোন ঠেলে উপচে আসে ঠোঁটের কূলে, সেই কথাটি বলতে চায় না কেউ।

মুখ চাপা থাকে। মন দমাবে কে। সে অষ্টপ্রহর বলে, হেই গো গঙ্গা, টোটা পোড়া দেখি তোর বুকে।

হ্যাঁ, নেমেছে শাউনে টোটা। শ্রাবণের মহা মন্বন্তর। গঙ্গায় মাছমারার এত বড়ো মন্বন্তর আর হয় না।

এ কী রূপ দেখি তোর গঙ্গা। কোথায় সর্বনাশ ঘটিয়ে এসেছিস তুই? কোন্ সর্বনাশের রক্তের দাগ নিয়ে এলি তুই উত্তর থেকে।

পূর্ণিমার দিনই পুব থেকে এল পালমশাই—মাছমারাদের মহাজন। তারপর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একবার এর নৌকোয়, আবার তার নৌকোয়।

কী, জল কী বলে? হুঁ, নৌকো নিয়ে পালাতে চাইছে সব। সেইজন্যে এসেছে মহাজন পাল। চেয়ে দেখুক, কে এসেছে। দেখে, পালাবার ভাবনা ছাড়ুক। ঋণ শোধ করতে হবে।

প্রতিবছরই আসে। মাছ পড়লে নিজেই ফড়ে-পাইকেরদের ডেকে দরদস্তুর করে। মাছ বিক্রি করে টাকা রাখে নিজের পকেটে। হিসাব রাখো, কত শোধ যাচ্ছে। খাবার টাকা নেই? আচ্ছা, এই নাও চালের দাম। কী গেলাটাই গিলতে পার বাপু তোমরা।

মহাজনের এমনি কথা। আশ্রয় নেয় এসে গঞ্জের চালায়। হোটেলে খায়। কী খেয়ে থাকতে হবে, সে ভাবনা নেই। মহাজন মানুষ, ঝুলি তার শূন্য থাকে না। নইলে সে মহাজন কেন।

আর শহরে বাজারে এসেছে। একটু ভালো-মন্দ খায়। সুদ কিস্তি হিসাব-নিকেশের গোনা-গাঁথার মধ্যে সময় তো হয় না এমনি বেড়াতে আসার। কাজের জন্যে আসা, সেই ফাঁকে একটু-আধটু শখ মেটানো। পয়সাটি ফেলবে, হাতের কাছে সব হাজির।

আর বড়ো মেয়েমানুষের ভিড় শহরে। মাছমারার পিছনে পিছনে বা কতক্ষণ ঘোরা যায়। বড়ো একলা একলা লাগে, রক্তে বড়ো মোচড় দেয়। তবে পাড়াগাঁয়ের মানুষ, সঙ্গে দু-চার পয়সা থাকে, একটু ভয় ভয় লাগে। কিন্তু মেয়েমানুষের বাজারের টানটা তার চেয়ে বেশী। যে কদিন থাকতে হয়, সে কদিন নেশাটা কাটতে চায় না।

হোটেলে খায়, মেয়েমানুষের ঘরে কাটায় কিছুক্ষণ, তারপর গঞ্জের বড়ো রাস্তায়, বড়ো বড়ো দোকানের বারান্দায় শুয়ে রাতটি কাটায়। তারপরে মাছমারাদের নৌকোয়। একটি আসল কাজ। এর তার খোঁজ-খবর নেয়। অমুকে কোথায়? অমুকের নৌকো দেখি না যে। টৌটা হেঁকেছে বলে বসে থাকলে হবে? কাজ করো, কাজ করো।

তা মিথ্যে নয়। টৌটার সর্বনাশা রূপ দেখে যখন হাত-পা গুটিয়ে আসে, জাল ফেলতে মন চায় না, মহাজনের মূর্তি তখন গুণের কাজ করে। বুকের মধ্যে করে ধুকুপুকু।

মহাজন ভাসে নিজের টানে। মাছমারা ভাসে নিজের ভাসিয়ে। সে যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে, জানবে সেটা ভাগ্য। সে কখনো নিজেকে ফাঁকি দেয় না। মহাজন ফতোশের উপর ফতোশ চাপায় শুধু।

রোদ-জল বাঁচিয়ে ছইয়ের মধ্যে বসে বলে, এখেনে খণ করেছ কত? হুঁ, জানি হে সব জানি। তা যা খুশি তাই করো গে, আমারটা না নিয়ে ফিরছি নে।

যদি মাছ পড়ে, তখন আসবে থাউকোর কথা। হোটেলের খাওয়া, মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া, এ দুয়ের শোধ তুলতে হবে। মহাজন তো এ-সব পকেট থেকে দেবে না। হিসেবের ওপরে তখন ফাউ যাবে।

আকাশে পূর্ণিমার পঞ্চদশীকে আর চোখে দেখা গেল না। গোটা আকাশ জুড়ে মেঘের মহা সমারোহ। বিদ্যুৎ-কশা এখানে ওখানে ফাটল ধরায় তার বুকে। চারদিক অন্ধকার করে নামে বৃষ্টি। দিনের বেলা মেঘলাভাঙা রোদে পোড়ায়।

শহরের মানুষ যাতায়াত করে এপার ওপার। চেয়ে দেখে। বোঝে না কিছু। বলে, কী হল হে। এবারে যে মাছ পড়ছে না। না, খাওয়া হল না এবারে। খাওয়া হল না। শোনো, শোনো গো গঙ্গা, মান তোর নয়, মান যায় আমার।

কোথায় কোন্ সর্বনাশের মার নিয়ে এলি তুই মাছমারার উপরে।

সর্বনাশ করেছে গঙ্গা আরো উত্তরে। বন্যা নেমেছে। কুশী ভেসেছে, প্লাবন হয়েছে মহানন্দার বুকে। পাহাড়ী ঢল ভেঙেছে। যাদের আসার তারা আসতে পারছে না। সমুদ্রের উত্তাপে আছে তারা। ঠাণ্ডা কনকনানিতে টিকতে পারে না।

কিছু কিছু নৌকো আসতে দেখা যাচ্ছে উত্তর থেকে। ছেলে-মেয়ে-বউ, ঘর-গেরস্থালি নিয়ে, গঙ্গার পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে আসছে তারা। বৃত্তান্ত কী? না, বন্যা হয়ে গেছে। যে কয়েকখানি আসছে, সবই প্রায় মাছমারাদের নৌকা। ঘর ভেসে গেছে। জলে কোনো প্রাণী নেই। এদিকে আসছে, ভিক্ষা করবে।

দূর হুগলী নদীয়া মুর্শিদাবাদের মরণের সংবাদ তাদের মুখে। দাগ নিয়ে এসেছে তাদের গায়ে।

জিজ্ঞেস করো, কাহিনী শুনতে পাবে। জাল পেতে মাছমারা নৌকো নোঙর করে রেখেছিল উঁচু পাড়ের কিনারে। বিঘাখানেক জমি চাপা পড়ে নৌকাসুদ্ধ নিপাত দিয়েছে। গঙ্গাও খায়, বড়ো জবর সে খাওয়া। দূর উত্তর থেকে সেই লকলকে জিভ নিয়ে সে এদিকে আসছে।

সমস্ত নৌকাগুলির চেহারা গেছে বদলে। মানুষগুলি রোদে-পোড়া, জলে-ভেজা শকুনের মতো হয়েছে!

আ! কী জ্বালা গো হাতে পায়ে। বড়ো ব্যথা। পোকা বিড়বিড় করছে দগদগে হাজায়। দাঁড় বৈঠা ধরা যায় না। সাংলোর কাছি যায় না ধরে রাখা, কাঁচা দগদগে মাংসে কেটে বসতে চায়। গাবের আঠা মাখছে সবাই হাতে। যেমন করে প্রলেপ দেয় জালে, নৌকায়। কিন্তু রাক্ষুসে পোকা। ভেদ করে উঠছে গাবের আঠার আস্তরণ।

রোদে শুকিয়ে জ্বালা। জলে ডুবিয়ে টনটনানি। ব্যথায় জ্বর তুলে দেয় গায়ে। দিলে কী হবে। জ্বরের উপর বৃষ্টি ধুয়ে যায়। প্রাণে বড়ো আগুন। ভিতরের জ্বলুনি তাতে নেভে না।

চোখ-খাবলার মতো খপিস চোখে তাকিয়ে পালমশাই বলল, এ নৌকা কার বাঁধা রয়েছে? লোক কই?

শ্রীদামের নৌকা। নগদ পয়সা যা ছিল, তা নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। শ্রাবণ টোটা তাড়া দিয়েছে অনেককে। নৌকা তুলছে শুকনো ডাঙায়। একজনকে রেখে, চলে গেছে দশজন। সেই একজন নৌকার পাহারাদার।

পালমশাই মুখ খারাপ করতে আরম্ভ করে। টোটার মার লাগে যেন তার গায়েও। সব পালালে আসলে ফাঁকি পড়বে তার। মেয়ে-মানুষের কথা ভুলতে হয় তখন। শখ সুখ ছেড়ে জলে জলে ঘোরে।

গঙ্গা আকাশে উঠছে, গঙ্গা পাতালে নামছে। সমুদ্রের চারিদিকে মরণ থাকে ওত পেতে। গঙ্গায় ডাক ছেড়েছে শমন। শোনো, পাতাল থেকে উঠছে মরণ-ভেরী।

তবু কান রাখো সজাগ। নজর রাখো কড়া। এখন তুমি বেসামাল হলে, রক্ষে নেই। এই সময়েই সে টেনে নিয়ে যায় অঘাটে।

দক্ষিণ বাতাস নাড়া দিচ্ছে আমার বুকে। ঘরে ফিরে যাবার উপায় নেই। জলেঙ্গা জলের প্রস্তাবনায় মাছের আসর জমল না। চারদিক থেকে ঘিরছে আমাকে মীনচক্ষু।

বিলাস, তবু তুই উঁচুপাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখিস। তোর পেটে ভাত নেই পুরো। তবু তোর বুক উথালি-পাথালি। দেখে আমার বুক ফাটে। আমি না তোর জ্বালা জুড়োবার কাল গুনছি। গড়ান দে, গড়ান দে, তবু গড়ান দে।

দেয়, কিন্তু তারও জোয়ান কোটাল যায় যে! বর্ষার শুক্লপক্ষে, জোয়ান কোটালে গঙ্গা রঙের নেশায় চোখে মুখে দেখতে পায় না। বেটী কানী হয়েছে। তবু তার বড়ো উলসোনি। বিলাসও উলসে উঠেছে—প্রাণের গহনে যার শূন্য ভাটার টল।

ও কে, কেবলি কাছা খুলে খুলে বসছে নৌকার ধারে, ছইয়ে মুখ গুঁজে? চণ্ডীপুরের ফকির।

শমন এসেছে হাতে-কলমে। কন্নাল রোগ, আমাশয়ের মহামারী নিয়ে আসছে। এই জল, রোদ আর বৃষ্টি। পেটে নেই পুরো ভাত। মাথা চাড়া দিচ্ছে রোগ।

দেবী ভাগীরথী, এখন মূর্তিমতী সংহারিণী। স্রোতের টানে টানে ফিরছে রোগ-বীজ।

তা ছাড়া, জলে জলে থাকার ওই আসল রোগ। ওই যে জাল ফেলে এক ভাবে বসে থাকা, কম খাওয়া আর পুবে ভারী বাতাস, তারই রোগ। মনে হয়, পেটে যেন দপদপ করে আগুন জ্বলছে। আঁজলা আঁজলা জল দেয় সবাই পেটে। তবু ঠাণ্ডা হতে চায় না। গড়গড়িয়ে উঠে, আর নাভিকুণ্ডলের কাছে মোচড় দিয়ে ওঠে ব্যথায়। জিভটা মোটা মোটা লাগে মুখের মধ্যে। নাকের মধ্যে একটা কিসের গন্ধ অষ্টপ্রহর ভোঁতা করে রাখে বাকি গন্ধ। শরীর টলে কিংবা নৌকো দোলে, ঠাহর পাওয়া যায় না। জল পাক খায় না মাথা ঘোরে, অনুমান করতে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে পাটাতনের উপর। তারপর রক্তে টান পড়ে। ভয়ংকর রক্ত-আমাশা দেখা দেয়। মাছমারা যন্ত্রণায় কাঁদতে চায়, কান্না আসে না। রাগ হয়, ভয়ংকর রাগ। কার উপরে, সে জানে না। শুধু হেঁসো দিয়ে নিজের পেটটা কোপাতে ইচ্ছে করে।

ইতিমধ্যেই কয়েকজনের রোগ দেখা দিয়েছে। গতিক দেখে মনে হয়, আরো হবে। এ সবই টৌটার মার। মাছমারারা একটু পেট পুরে যেবারে খেতে পায়, সেবার রোগের আমদানি কম। সে আসে, ঘোরাফেরা করে কাছে কাছে। দাঁত বসাতে পারে না।

এবারে ঘরপোড়া গোরুর চোখে যেন সিঁদুরে মেঘ দপদপ করে।

যে দু-একজনের এখনো হালে পানি আছে, তারা যায় শহরের ডাক্তারের কাছে। বোতল পুরে নিয়ে আসে ওষুধ। মাছমারা,

এইখানে তোর জীবন-মরণ। শুধু দেখতে হবে, সুদিনের বান ডাকে কিনা। বৃথা যেতে দিস নি এই মুকড়া, এই আগনা। নৌকা রাখ আড়ে, গড়ান দে। গড়ান মেরে যা দিনরাত্রে।

দ্বিতীয়া পর্যন্ত কোটালের জোর। মরতে মরতে আরো দু-একদিন যায়। তাও গেল। চাঁদ-চাপা মেঘ-জমাট আকাশ। তবু যেন ভোরের অস্পষ্ট আভাসের মতো সবকিছুই দেখা যায়। থেকে থেকে, মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। হঠাৎ একটু হাসির মতো। যেন মহা সর্বনাশ তার হাসি আর চেপে রাখতে পারছে না সবসময়।

কালো কালো নৌকাগুলি টানে ভেসে যায়। সাড়া-শব্দ নেই আর। কারুর মুখে কথা যোগায় না।

গড়ান চলেছে।—পাঁচু বলল, মা ভগবতী, সত্যি টৌটা হয়ে গেল গো।

ওই এক কথা। বিলাস জলের দিকে তাকায়।

টিকটিকি উঠল টিকটিক করে। দপ করে জলে উঠল বিলাসের চোখ।

পাঁচু বলল, সত্যি সত্যি সত্যি।

ছইয়ের মুখছাটের কপালে টিমটিমে হ্যারিকেন। তার আলোয় দেখল রক্ত-চক্ষু টিকটিকি ছইয়ের বেড়ায়। হাতের কাছে ছিল বৈঠা। নিশানা করে মারল খোঁচা। টপ করে জলে পড়ল টিকটিকি।—শালা। ভালোতেও টিকটিক। মন্দতেও টিকটিক? খালি পেছু পেছু টিকটিক। নিকুচি করেছে তোর টকটকানির।

মহা আতঙ্কে ও ক্রোধে ডুকরে উঠল পাঁচু, ডাকল বলে মারলি। ওরে সর্বোনেশে, ও যে নির্ঘাত কথার সাক্ষী। খনার জিভ ওর মুখে।

বলতে বলতে, রাগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পাঁচু উঠে এল বিলাসের কাছে। যেন খুন চেপেছে চোখে।

বিলাস বলল, যার জিভই থাকুক, ও আসুক আগে জিভের আড় ভেঙে।

ঠাস করে চড় কষালে পাঁচু বিলাসের গালে। হারামজাদা! বিলাসের চোখও জ্বলে উঠল। হাত দিয়ে গাল মুছে, খুড়োকে দেখল একবার। গায়ের পেশী উঠল কেঁপে। তারপর মাথা নিচু করে বলল, যাও, কাঁড়ারে গ্যে বোসোগে।

পাঁচু ওইখানে দাঁড়িয়েই শক্ত হয়ে থাকে খানিকক্ষণ। আবার হঠাৎ বুকের কোথায় বড়ো কাঁপন ধরে যায়।

কাঁপতে কাঁপতে গেল কাঁড়ারে। বলিরেখা-ভরা এবড়ো খেবড়ো গাল ছুটি ভেসে গেল জলে।

শাঙনে টোটা কারসাজি করছে, শান্ত হও পাঁচু। সংসারের গাঙে ঝড় উঠেছে। তোমার জীবন, ঘর-গেরস্থি, সব কিছুর খুঁটা আসছে উপড়ে। শান্ত হও, বিলাসকে ধরা যাবে না আর তোমার হাত দিয়ে। শমন ওকে চালাচ্ছে। সর্বনাশের মায়া ওকে দিয়ে নতুন খেলা দেখাচ্ছে। ও উজানে যেতে চায়।

কিন্তু বুক বড়ো টাটায় মুখ-নিচু বিলাসের দিকে চেয়ে। তুই উনো পেটে থাকিস, দুনো খাটিস। পশ্চিমের উঁচু পাড়ে বাতি জ্বললে, কথা শুনলে, মাঝ-নদীতেও একবার চমকাস। মাল্লোর আইন আর মান ছাড়া তুই আর কিছু মানতে চাস নে।

কিন্তু মরণ ঘুরছে চারদিকে, বিলাস কেন শান্ত থাকে না এখন। বৌঠান, তোমার পা খুঁটে এক চিমটি ধুলো বাতাসে ছিটিয়ে দিও। মাকড়াটার গায়ে এসে পড়ুক।

কিন্তু এই খেপী গঙ্গার বুকে, বিলাসও খ্যাপা হয়ে ওঠেছে যেন। অঘটন ঘটল একটা। তাকে চোদ্দগুণ করলে বিলাস।

কেদমে পাঁচুর ছিল চল্লিশ-হাত খুঁটে জাল। জাল ফেলেছিল

পশ্চিমপার ঘেঁষে, কাঁকড়ার নোঙর দিয়ে গেঁথে। জোয়ারের বেলা। জালের ওপরে ভাসছে ছোল জলের মানুষকে দেখাবার জন্তে। দেখে যাও।

পশ্চিমের মহাজনী নৌকা আসছিল বারো-দাঁড়ী। পেল্লায় হাল। আসছিল জাল-বরাবর। দেখে কেদমে চেঁচালে, এট্টুস বেঁকে যাও মাঝি ভাই, তোমার হালে ঠেকবে।

মাছমারার দুঃখ সে বোঝে না। ওই জালে যে মাছমারার প্রাণ ডুবিয়ে বসে আছে, জানে না সে।

বেঁকতে গেলে বিশ হাত বেঁকতে হবে, সময় যাবে। চালিয়ে যাও।

কেদমে চেঁচাতে লাগল, বেঁকে যাও, ভাই, বেঁকে যাও।

আসছে দক্ষিণ থেকে। জোয়ারের টানে, সে আর বাঁকে? দিলে ভাসিয়ে। শুধু দেখা গেল, জালের ছোল চলেছে ভেসে মহাজনী হালের সঙ্গে। তলারটুকু আর বুঝতে বাকি থাকে না।

মাছমারার প্রাণ। একখানি খুঁটে জাল, দাম তার দুশো আড়াইশো প্রায়। অতল জল থেকে লাফ দিয়ে উঠল, খুঁটে জালের কাঁকড়ার গুঁড়ো, অর্থাৎ লাঙলের মতো জালের মস্ত নোঙ্গর। মাটিতে গেঁথে থাকে সে।

কেদমে চেঁচিয়ে উঠল, দিলে, দিলে আমার সর্বনাশ করে।

সেই সময়ে মহাজনী নৌকার সামনে পাঁচুর নৌকা। গলুই থেকে লাফ দিয়ে উঠল বিলাস মহাজনী নৌকার কানায়। হাতে বৈঠা।— শালা, পাণে মারছ?

—বিলেস, নেমে আয়, আয়।

বারোদাঁড়ী উঠল মারমার করে। পাঁচু দেখল, বিলাসের বৈঠা কাকে আঘাত করল মাথায়।—হেই রাম রাম।

এক মাঝি পড়ল জলে।—আয় শালা মাছমারার প্রাণ খাবি।

বিলেস লাফিয়ে পড়ল হালে। জলে পড়ল দুজনে ঝাপটাঝাপটি করে।

—বিলেস।—

জোয়ার চলছে ফুলে ফুলে। মেঘ ডাকে গুরু গুরু। গঙ্গা হাসছে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে। যাবৎ মাছমারার নৌকা আসছে ঘিরে চারদিক থেকে।

বিলেস। এ কিসের আগুন তোর বুকে। সংসারে আছে কত অধর্ম, পাপ, অন্যায়। সব জায়গায় তো তুই পারবি নে ঝাঁপিয়ে পড়তে। চীৎকার করে ডাক দিল সে, বিলেস!

ওই, ওই দেখা যায়, দুটি মাথা ভেসে চলেছে উত্তরে। একজন পালাচ্ছে, একজন ছুটছে পিছে পিছে। ছুটছে বিলাস।

—ওটা কে?

—বিলেস।

—আমাদের তেঁতলে বিলেস?

—হ্যাঁ।

ছুটল দুটি বাছাড়ি। গিয়ে তুলল দুজনকেই। মহাজনী নৌকার হালমাঝিসুদ্ধ। তার আগে যেটা পড়েছিল জলে, তাকে তুলেছে কেদমে নিজের নৌকায়।

কে জানে, কোনো বে-আইনী মাল ছিল কিনা নৌকায়। পুলিশ ডাকাডাকি করলে না তারা। পঞ্চাশ টাকা দিল কেদমে পাঁচুকে।

টাকা হাতে নিয়ে, মরদ বুড়ো কেদমে পাঁচু হাঁটুতে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল। বলল, এ জীবনে আর খুঁটে জাল এতখানি করতে পারব না আমি।

খবর শুনে গোটা পশ্চিম আর পুবপারের সবাই একেবারে পাঁচুর কাছেই বৃত্তান্ত জেনে গেল। বিলাসকে বলল, যথার্থ কাজ করেছ, খুব ন্যায্য হয়েছে

দামিনীও এল হুতোশ নিয়ে। কী নাকি হয়েছে? দাঙা হয়েছে নাকি? শোরগোল পড়ে গেছে দেশময়।

লোকে দেখে এক জিনিস, বলে এক কথা। বিলাস দেখে আর। দেখে, দিদিমার সঙ্গে নাতীন আসেনি।

দামিনী সব শুনে ফিসফিস করে বলল, মনে আছে পাঁচুদাদা, তোমার দাদার কথা?

মনে আছে বৈকি! এ রকম ভাবে জাল ছিঁড়েছিল আর একবার এক মহাজনী নৌকা। মালভরত্তি তাদের নৌকা। যাবে মুর্শিদাবাদ। নৌকায় লোকও অনেক। ভাটা পড়ে গিয়েছিল, জাল ছিঁড়ে বেশী দূর যেতে পারে নি। নোঙর করে রইল মাছমারাদের বুকের ওপরেই।

রাত তখন কত, আন্দাজ নেই পাঁচুর। দেখল, চিতাবাঘের মতো দাদা নিবারণ নৌকা থেকে জলে নামছে। নিঃশব্দে নেমে চলে গেল। মনে হল, একটা সাপ যাচ্ছে এঁকেবেঁকে। তারপরে কোথায় অদৃশ্য হল।

ফিরে যখন এল, তখন চোখ লাল কোকিলের মতো। পাঁচু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিছিলে?

জবাব দিলে, রাত বোধহয় কাবার হল। এক ছিলেম তামাক সাজ দিনি পেঁচো।

একটু পরেই মহাজনী নৌকা থেকে চীৎকার উঠল, গেল, গেল, ডুবে গেল। ভোররাত্রে সে নৌকা ভরাডুবি হল। আপনি আপনি ডুবে গেল জলে। তলার কাঠ খসে গেছে। শুধু প্রাণে বেঁচেছিল মানুষগুলি।

হুশ করে নিশ্বাস পড়ে দামিনীর। বিলাসের দিকে তাকায়।

পাঁচু বলল, কিন্তু বড়ো ভয় করে দামিনীদিদি।

দামিনী যেন চমকে উঠে বলল, করে বৈকি দাদা, খুব ভয় করে। তোমার ভাইপোকে একটু সামলে-সুমলে রাখো।

বলে আর একবার বিলাসের দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

নাতনীর কথা আর জিজ্ঞাসা করে না বিলাস।

পরদিন সন্ধ্যায়ও শূন্য ভাটা গেছে। মন আর মানছে না। পাঁচুর শরীরটা বড়ো ভার ভার লাগছে। চোখ দুটি বুজে আসছে যেন। মাথাটাও টিপটিপ করছে। বলল, বিলেস, জলটা তুই ন্যে আয়, আমি পারছি নে।

টেপাকলে জল আনতে গেল বিলাস। কোনোদিকে না তাকিয়ে হাতল টিপতে গিয়ে, কানে এল হিমির গলা। দামিনীকে বলছে, এট্টু দেখে আয় মাছ প'ল কিনা।

—দেখব আর কী। জানি পড়ে নি। পরশু দশ টাকা ধার দিয়েছি পাঁচুকে। শুনি, তাতেও একবেলা খেয়ে থাকছে। এমন জীবন মানুষের হয়।

—তবু যা একবার দি-মা।

—কেন বল তো? তোর সেই ছোঁড়াকে দেখতে মনে করে তো, নিজে গিয়ে দেখে আয়।

—মরণ তোর দি-মা। কী যে বলিস। মন করলে তো যেতুমই, সে কি তোর কথার জন্যে বসে থাকতুম।

দিদিমা আপন মনেই বকবক করে চলল, আর কী ডাকাবুকো ছেলে বাবা। মহাজনী লৌকোয় উঠে মাঝি ঠ্যাঙায়?

হিমি বলল, বেশ করেছে। খুন করলে না কেন?

তারপর চুপচাপ। রাতের ঘোর নেমেছে। আ কপাল, বিলাসের কল টেপা বন্ধ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কল টিপল। আশেপাশে নানান গলা শোনা যায়। ভাঙা হারমোনিয়াম হাঁপাচ্ছে যেন কোন্ ঘরে।

বিলাস দাঁতে দাঁত টিপে হাতল টিপছে। তার পিছনে হিমির বাড়ির দরজা।

জল ভরার আগেই, সেখান থেকে শোনা গেল হিমির গলা, কে হে? গঙ্গার মাঝি নাকি?

শক্ত করে কলসী ধরল বিলাস। পড়ে না যায়।

সামনে আসতে আসতে বলল, কে? কথা নেই যে মুখে।

পরমুহূর্তেই অস্ফুট গলায় বলে উঠল, ঢপ!

বিলাস বলল, না, তোমার কত ঢপ আছে। বলে হনহন করে এগিয়ে গেল।

কালো মূর্তির অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় তরতর করে এগিয়ে গেল হিমি।—শোনো, ঢপ, ওগো ঢপ, শোনো।

বিলাস থামল না। হিমি বললে, মাইরি বলছি, মাথার দিব্যি দেব। দাঁড়াও একটু। একেবারে আমগাছের গোড়ায় এসে দাঁড়াল বিলাস।

হুঁ। যা ভেবেছি তাই। হারামজাদা আবার ডেকে নিয়ে এসেছে ছুঁড়ীকে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে। ওই যে দেখা যায়, কালো ছায়ায় গোরা মেয়েমানুষ।

হিমি দাঁড়াল বিলাসের কাছে এসে। বলল, রাগ করেছ ঢপ?

বিলাস বলল, তুমি মহারানী, আমি মাছমারা। তোমার 'পরে কখনো রাগ করতে পারি!

হিমি আরো কাছে এল। বড়ো সুবাস তার গায়ে। এই হাতে পায়ের হাজায় পোকা, পোকা-বিড়বিড়, আঁশটে-গন্ধ গায়ের কাছে

মানায় না এই গহনা-পরা মেয়েকে। বলল, চপ, বড়ো রাগ করেছ তুমি।

বিলাস বলল, মাছমারারা মানুষের 'পরে রাগ করে না। যার 'পরে করে, তাকে দেখা যায় না এ সোমসারে। আমি যাই।

—না, দাঁড়াও। হিমি হাত ধরল বিলাসের।

কী ভারী গন্ গো আগনার মুখে! সে যে প্রলয়ের মুখে বান হয়ে আসে ছুটে। বুকের মধ্যে বড়ো পুবে সাওটার ঝড়।

হিমির চোখে জল এসেছে। বলল, চপ, আমি অজাতের মেয়ে, বড়ো দুঃখু পেয়েছি এই মানুষের সোমসারে। ভেবেছিলুম, আর নয়। সোমসারে নেই মনের মানুষ, থাকব একলাটি। মা আমার রাঁড় ছিল। কিছু টাকা-পয়সা আছে, কেটে যাবে। কিন্তু—

জোয়ারের চাপা কলকলানি শোনা যায়। বিলাস বলল, মহারানী বল।

হিমি বলল, চপ, দোহাই তোমায়, মহারানী বোলো না। তোমার ওই কুচকুচে কালো রঙা পেথমদিন দেখে ভয়ে বাঁচি নে। মনে হল, এমন মানুষ দেখি নি কখনো। আমার ঠেকারে ঠেকারে কথায়, তোমার কালো চোখে আগুন দেখলুম। আমার আরো ভয় হল। আবার না এসে পারলুম না সেই ভয় কাটাতে। কে, এ কী ভয় ধরিয়ে দিলে আমার মনে?

—কোথায় তোমার ভয় ধরালুম?

—কেন, আমার বুকে।

—কিসের ভয়?

—আমার একলা থাকার সাহস হারিয়ে গেছে। চপ, তুমি মাছ মেরে খাও, আমি খাব বেচে। কিন্তু এ কী করলে তুমি আমার! আমি যে থাকতে পারি নে।

কাছে লেপে এল হিমি।

ছেউটি গাঙের জল কূল ভাসালে গো। ছুহাত দিয়ে বিলাসের কালো কুচকুচে পেশল হাতখানি জড়িয়ে ধরল হিমি। আগনা ছুঁল ডাঙা।

জন্মের নেই ঠিক-ঠিকানা হিমির। প্রথম থেকে জীবনে দেখেছে, বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা। নিজেকে পারে নি বাঁচিয়ে ফিরতে। অনেক টানাপোড়েন গেছে। জীবনে কোনো বাধানিষেধ দাঁড়ায় নি মাথা তুলে। প্রেম করতে চেয়েছে, তার চেয়ে ঘৃণা করেছে বেশী।

সেই আড়ষ্ট প্রাণের আড় ভেঙেছে আজ।

বলল, ঢপ, মহারানী যদি বললে, মহারানীর মান রাখো।

—কেমন করে, বলো?

—আমার ঘরে এসে বোসো, ছুটি কথা বলি প্রাণ খুলে।

বিলাস তাকাল জলের দিকে। জোয়ার এসেছে। চারদিকে শ্রাবণ্যে টোটার করাল হাত ফিরছে গঙ্গায়। বলল, মাছমারার কাজ শেষ করি, তা পরে আসব।

—আসবে তো?

—যদি তাড়া না দেও।

বিলাসের প্রকাণ্ড কালো বুকে, ছোট্ট একটি তারার মতো হিমি মিটমিট করে জ্বলে উঠল নিঃশব্দ হাসিতে।

নৌকায় উঠে, কলসী রাখতে না রাখতে, সামনে জ্বলে উঠল লোলচর্ম গর্তে ছুটি জ্বলন্ত চোখ। পাঁচু সাংলো তুলে মারল বিলাসকে সলির ঘা। সপাং সপাং করে মারল।

—পাপ! তোর পাপ ডেকে এনেছে এই শাঙনে টোটা।

বিলাস সাংলোর ব্যাকারি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল গলুয়ে। বলল, টোটা তোমার জলে, কানা জল, পাপ তার নিজের চোখের।

—হারামজাদা, মাকে গাল দিচ্ছস তুই।

—মা হলে যদি, তবে গাল খেতে হবে।

—খেতে হবে?

—হ্যাঁ খেতে হবে। মুখ বাইড়ে গাল দিতে যাব এবার সমুদ্রে।

—সমুদ্রে?

—হ্যাঁ।

পাঁচু দেখছে, মরণ ঘুরছে চারিদিকে। পাহাড়ে ঢলে মহাকাল নেমেছে জগতে। নেমেছে বিলাসকে বাহন করে। এই মহিষমূর্তি, যমের বাহন।

জোয়ান কোটালের ভারী গোনে, পাক দিয়ে গেছে মরা কোটাল। উত্তরের কনকনানি তলে তলে থাবা বাড়িয়ে গেছে মোহনায়। দরজা বন্ধ করে বসে আছে সমুদ্রের।

সয়ারাম ভালো করে কথা বলে না বিলাসের সঙ্গে। রাগ করে নয়, এখন কারুর মুখেই কথা নেই। খালি ঠাণ্ডারাম দেখা হলে পাঁচুকে বলে, পাঁচদা, বাড়ি চলে যাব গো। আগে জানলে এবারে খেতমজুরি করতাম।

—ফিরে গ্যে কী করবে ঠাণ্ডারাম?

—হাসনাবাদ না হয় কালীনগরে গ্যে হাটের দিনে লৌকোয় মাল টানলেও কিছু রোজগার হবে।

—তা হবে। কিন্তু পালমশাই ছাড়বে তো!

—ছাড়তে চায় না। বলে, 'যেতে চাও, লৌকো রেখে যাও। কিসের বিশ্বেস তোমাদের। ফিরে গ্যে লৌকো বেচে স্তে যদি দূর আবাদে চলে যাও, ত্যাখন আবার খুঁজবে কেটা?'

পাঁচু ভাবে, তাও মিথ্যে নয়। মাছমারার জীবনে এমনটিও হয়েছে। নিরুপায় মানুষ তার সব বেচে দিয়ে, বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলে দূর বাদাবনে।

ঠাণ্ডারাম এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, আজ এই পর্যন্ত সারা-দিনে কিছু খাই নি পাঁচদা। মহাজন বলেছে, রাতে কয়েকটা ট্যাকা দেবে। দিক, আমি পালাব, তোমাকে বলে রাখলুম।

পালাতে চায় ঠাণ্ডারাম। এটা জেলখানা নয়, সত্যি সত্যি আর কেউ বেঁধে রাখে নি। গঙ্গা তাড়িয়ে দিচ্ছে।

পুব আকাশে আধখানি চাঁদ উঠেছে। ক্ষয় হয়েছে অনেকখানি। মরা কোটালেও ভাটার টান বড়ো জোর। যত দিন যায়, হাতের জোর বোধহয় কমে। টানের জোর বেশী মালুম দেয় হাতে।

পাঁচু-বিলাস গড়ান দেয়। ঠাণ্ডারাম ফিরে আসে। একটু বাদেই একটা চীৎকার ভেসে এল, গেল, গেল, গেল!

—কে গেল, কী হল?

খুড়ো-ভাইপো জাল তুলে ফেলল, নৌকা ফেরাল উজানে।

—জেটিতে লৌকো ঢুকে গেচে।

—কার হে?

—ঠাণ্ডারামের।

ঠাণ্ডারামের? চারটি নৌকা ছুটে গেল জেটির কাছে। গোটা কাঁড়ারখানি মচকে ভেঙে আটকে রয়েছে জেটির লোহার জালে।

বিলাস চিৎকার করে উঠল, কাঁড়ারে কে ছেল?

—ঠাণ্ডারাম।

—তবে সয়ারাম কমনে গেল?

সকলে তাকাল দক্ষিণে। দূরে ভেসে যাচ্ছে কে দুই আঁকড়ে ধরে।

কে বলে উঠল, আ সর্বোনাশ, উদিক পানে সেই আওড়টা আছে। দয়ে ডুববে যে গো?

ছুটি নৌকা ছুটল তীরবেগে দক্ষিণে।

বিলাস বলল, খুড়ো, নৌকো বাঁধো জেটির গায়ে।

থরথর করে কাঁপে পাঁচুর হাত। এই কতক্ষণ আগে না ঠাণ্ডারাম পালাতে চেয়েছিল। এমন পালানো আর হয় না। পাঁচু দেখল, গঙ্গার স্রোতের বাঁকে, তরঙ্গে তরঙ্গে মীনচক্ষুর ছড়াছড়ি। বড়ো চকচক করে। কিন্তু নৌকা কেন বাঁধতে বলে বিলাস।

নৌকা বাঁধল। বিলাস জেটির রেলিং ধরে নামল জলে। অন্য নৌকার আর-একজন মাঝিও নামল। দুজনেই পা ডুবিয়ে ঠাহর করছে, মানুষ পাওয়া যায় কিনা।

জলে বড়ো চাপ এখানে। নিচে থামের গা থেকে, জল পাক খেয়ে উঠেছে, ঘূর্ণি হয়ে যাচ্ছে। যেন টেনে নিতে চায়। একড়ি ঢলে জল নামছে আর যেন খলখল করে হেসে বলছে, যা যা, মুখের খাবার কেড়ে নিস নে। পালা, পালা।

—পেয়েছি।

—পেয়েছ?

হ্যাঁ। ডুব দিয়ে উঠে বিলাস বলল, দুটো ডাণ্ডার ফাঁকে মাথাখানি আটকে রয়েছে।

বলে আবার ডুব দিল বিলাস। উঠে বলল, অ্যাটটা দড়ি দেও দিনি।

দড়ি নিয়ে ডুব দিল। নিশ্বাস বন্ধ করে টানা স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে পাঁচু। মরণের কাছে বিলাসের ঘোরাফেরা। ভুলে যাস নি, আমি তোর আশ্রয় বসে আছি এখানে।

দড়ির এক অংশ নিয়ে আবার উঠল বিলাস। বলল, দড়ি ছে বেঁধেছি। দড়িটা ধরে থাকো একজন, মাথাটা ঠেলে দিই আমি।

একসঙ্গে উঠল জ্যান্ত বিলাস আর ঠাণ্ডারামের মড়া। মাথা কেটে চৌচির। জলের এত টানেও সব রক্তের দাগ মুছে দিতে পারে নি।

কে একজন বলল, কেমন করে হল? টেনে নিল কী করে?

কেমন করে আর। পেটে ভাত ছিল না। মা থাকলে, শমন দিয়ে এমনি করে ডেকে নিয়ে আসে।

আ মরি মা গো গঙ্গা, তবু তোর কী কলকল হাসি। যেন মহা নাগ-নাগিনীর শঙ্খ-লাগা মদমত্ততায় পাক খেয়ে এঁকেবেঁকে চলেছিস। সংসারের মানুষ মহা ত্রাসে ইষ্ট জপ করে।

পালমশাইয়ের মুখ দেখে বোঝা গেল, মশায় বড়ো বেকুব হয়ে গেছে। মুখখানি গেছে শুকিয়ে। অনেক পাওনা ছিল ঠাণ্ডারামের কাছে। খালি বলল, এরা আসে বা কেন, মরে বা কেন।

তা বটে। সংসারে মানুষ আসে কেন, কেন বা মরে। উজান ঠেলে সমুদ্র থেকে মাছ কেন আসে, মরে কেন, ভাব একবার। সাধু-ফকিরের কথা জানি নে। জীবনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি আমি, আমি তার প্রেমে পড়েছি। তাই না জীব-ধর্ম আমাকে পালন করতে হয়।

ঠাণ্ডারামকে শ্মশানে পুড়িয়ে ফিরল সবাই। পাঁচু ভাবে, কিন্তু আমার শরীর যেন আস্তে আস্তে ঢিল দিচ্ছে। ক্ষয়া-চাঁদ আসে আকাশের মাঝে মেঘ ঠেলে ঠেলে। আপনার জলে কিসের বার্তা আসছে দক্ষিণের।

অ বিলেস, তুই কেবল উঁচু পাড়ে যেতে চাস। যেন মহা নাগ-নাগিনীর শঙ্খ লাগার আশায় বড়ো উথালি-পাথালি আনমনা তোর প্রাণ। কিন্তু ওরা মায়াবিনী। ডাকিনীর ছলনা। ওরা ভালোবাসে না।

বিলাস ডাকল, অ খুড়ো।

—অ্যাঁ।

—অমন কঁকাতে লেগেছ কেন?

—হাত ছুখান বড়ো শুলোয় রে বিলেস। মাংস দগদগ করে। পেটটাও যেন কেমন ব্যথা-ব্যথা লাগে।

বিলাস উঠে এল খুড়োর কাছে। বাঁশ-ফালির পাটাতন সরিয়ে, গাবের আটা বের করে, তিবড়িতে চাপিয়ে গরম করে নিল। তারপর মাখিয়ে দিল খুড়োর ছুই হাতে। কিন্তু পোকাগুলি মানে না। ভিতরে দাপাদাপি করে।

বিলাস বলল, খুড়ো, সাংলো বাওয়া ছাড়ো তুমি, হাত ছুখান যে ছিঁড়ে যাবে।

তোর প্রাণটা তবে টাটায় রে খুড়োর জন্যে। হাঁটুর উপর হাত ছুখানি নিয়ে এমন করে গাবের আটা মাখাস, মনে হয়, মায়ায় ভরা তোর বুক। শুধু কাজে ঠাহর পাই নে। বলল, বর্ষায় মাছমারার হাত অমন হবেই। তা বলে জাল ফেলা বন্ধ রাখব কেমন করে? মরে যাব না?

খুড়োর হাত ছুটি ছেড়ে দিয়ে মুখ ঝামটা দিল বিলাস, মলেই হল আর কি, না?

মরতে দিতে চায় না বিলাস। এবার মীনচক্ষুর হাসি পাঁচুর চোখে চিকচিক করে। কথা শুনে বুকের মধ্যে হাসি-কান্না, ছুইয়েতেই ওঠে ভরে। তবে আকাশে অমন বিছ্যুৎ-চিকচিক হাসি কিসের। ও হাসিটা চিনতে পারে না বিলাস।

বড়ো একটি নিশ্বাস ফেলে পাঁচু বলল, যাই, দামিনীদিদির কাছে একবার ঘুরে আসি।

—কেন?

—চাল যা আছে, তাতে আর একটি বেলা চলবে। হাতের নগদ

ট্যাকা সব ফুরিয়ে গেল। পালমশাইও হাত উপুড় করবে না, বোঝাই যাচ্ছে।

পাঁচু উঠে গেল। জোয়ার এখনো আসে নি। আসবার মুখে। পিছল কাদা ঠেলে ঠেলে পাঁচু যায়। মনে হয়, বিলাসের চোখ. দুটি তার পিছে পিছে আসছে।

দামিনীর বাড়ীতে ঢুকতে বড়ো সঙ্কোচ হয়। বেচুনীর বাড়ি, পরিবেশ অচেনা লাগে। তবে অনেকবার যাওয়া-আসা হয়েছে, ভয় কমে গেছে।

বাড়ি ঢুকে দেখল, একটি ঘরের দাওয়ায় লম্ফ জ্বলছে দাউ দাউ করে। চারটি লোক বসে বসে তাস খেলছে। এরা দামিনীর ভাড়াটে আগে মেয়েমানুষ ভাড়া থাকত। নাতনী তুলে দিয়েছে।

পাঁচু ডাকল, দামিনীদিদি আছ নিকি গো?

জবাব নেই। লোক চারটেও ফিরে তাকায় না। লম্ফর আলোয় ভূতের মতো মাথা গোঁজ করে খেলে যাচ্ছে। ওদিকে কোথায় রান্নার ছ্যাঁত ছ্যাঁত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

আবার ডাকল পাঁচু, দামিনীদিদি আছ?

—কে?

বলতে বলতে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল নাতনী। বেগতিক দেখল পাঁচু। বলল, দামিনীদিদি কমনে গেল?

নাতনীকে বেশ হাসিখুশী দেখা গেল। রূপখানি তো আছে। তার উপরে কালিন্দী আর রাইমঙ্গলের মোহনার হ্যাঁকা লেগেছে শরীরে। বলল, ওমা, খুড়ো এসেছ? এস এস, দাওয়ায় উঠেসে বস।

বলে বেড়ায়-গোঁজা একখানি চটের আসন পেতে দিল। হ্যাঁ, পাঁচুর বুকের মধ্যেটা যেন খুশি ও সম্মানে কেমন উপচে উপচে পড়ে। মেয়ে সহবত জানে খুব। খুড়োকে খাতিরও করছে বেশ।

তবু পাঁচুর সঙ্কোচ। মনের মধ্যে ঘোর আতঙ্ক। মায়াবিনী মেয়ে সে।

কিন্তু উঠে বসতে হয়। তবে, হিমি যেন ভালো করে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না পাঁচুর দিকে। গায়ের কাপড় একটু বেশী করে গোছাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, কী মনে করে খুড়ো?

সে কথা নাতনীকে বলবে কেমন করে পাঁচু। হয়তো বলতে হবে একদিন। কিন্তু প্রথমবার টাকা চাওয়া, দামিনীদিদি মাঝখানে না থাকলে চাওয়া যায় কেমন করে। বলল, কথা এমন কিছু নয়। আসুক দামিনীদিদি, তা পরে বলবখনি। এখন যাই।

হিমি হঠাৎ ঘরে ছুটে যেতে যেতে বলল, না, যেও না খুড়ো, আমি শুনব। রান্নাটা নামিয়ে আসি।

একটু পরেই ফিরে এল হিমি! বলল, আমাকে বললে হবে না খুড়ো?

—সে দামিনীদিদি তোমাকে বলবে মা।

হিমির মনটা আনচান করে উঠল। কী বলবে খুড়ো দিদিমাকে। হিমির কথা নাকি। বলল, তুমিই বলো খুড়ো, তোমার মুখ থেকেই শুনি।

পাঁচুর লজ্জা করে, ভয়ও করে। তবে মহাজন বলে কথা। তা ছাড়া, এখন থেকে তো নাতনীর সঙ্গেই কারবার হবে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল পাঁচু, পালমশাই তো কিছু করবে না মা, তাকে কিছু বলাও যাবে না।

হিমি বলল, পালমশাই কে?

—আমাদের গাঁয়ের মহাজন। ইদিকে, কাল সকালে খাবার মতো চাল আছে। তোমাদের ট্যাকা অবিশ্যি আমার শোধ দেয়া হয় নি সব। কিন্তন শোধ দিতে হলে, দুটি পেটে না দিলে তো চলে না।

পাঁচুর আধ-ফোগলা মুখে বড়ো করুণ হাসি। বুকের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে। কী বলে নাতনী।

হিমির মুখে ভাবনা দেখা দিল। বলল, তোমাদের তো হাতে করে কখনো ট্যাকা দিই নি, আমার খেয়াল ছিল না। ট্যাকা কিছু ছিল, একজনকে দিয়ে দিয়েছি। তার ঘর ছাওয়া দরকার, বর্ষায় তার চালাটি গেছে।

দুরু দুরু করে উঠল পাঁচুর বুক। হিমি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

পাঁচু বলল, কমনে যাও গো?

—এই আসি একটু। মহাজন বল আর যাই বল, মেয়েমানুষ তো। শুনে চুপ করে থাকি কেমন করে? ও পিসে।

দাওয়ার খেলার আসর থেকে একজন উঠে এল। তাকে কী বলে কোথায় পাঠালে হিমি! তারপরে বলল, খুড়ো, তোমাকে যেন নিজঝুম নিজঝুম লাগছে।

পাঁচু বলল, হ্যাঁ, শাওনে টোটা পড়ে গেল গো। তার উপরে শরীলটাও ভালো বুঝি নে।

হিমি বলল, জলে জলে থাকা। দুদিন ডাঙায় বসে বিশ্রেম করো খুড়ো। বয়স হয়েছে তো।

হ্যাঁ, মনটা নাতনীর ভালো। মায়াবিনীর ছলনা নয় তো। লাখ টাকার মানুষ ফেরায়, তার মন মাছমারা বুঝবে কেমন করে। তবে কথাগুলি ভালো লাগে। বলল, মাছ মারি মা, য্যাতোক্ষণ বসে রয়েছি, ত্যাতোক্ষণ শুয়ে থাকতে পারব না। বিদেশে বিভুঁয়ে তুমি যে বললে এইটুকু, সেই আমার অনেক গো মা।

হিমি বলল, শুধু বলা কেন। মহাজন হলেও মানুষ তো। থাকো না দুদিন এসে।

অ বিলেস, দ্যাখ, আমাকেও ফাঁদে ফেলতে চায় শহরের

করেনী। মাছ মেরে খাই আমি, এ কথায় আমি ভুলতে পারব না। তার মিষ্টি স্বভাব তার কাছে থাক, আমি যেন মাছমারা থাকি। বিলাস, তুইও থাকিস। এ জলের বড়ো টান।

পাঁচু খুশী হয়ে হেসে বলল, শাওনে টৌটা কেটে গেলে অসুখ আমার আপনি সারবে গো। সে ভাবনা কোরো না। তোমার ভাগ্যি ন্যে মা গঙ্গা পরান খুলুন, তা হলেই বাঁচি।

হিমি হেসে উঠল। বলল, আমার পোড়া ভাগ্যি!

বলে নাতনী গম্ভীর হয়ে গেল। পিসে এসে হাতে টাকা গুঁজে দিল তার। দিয়ে পাঁচুকে একবার দেখে চলে গেল।

হিমি টাকা গুনে দিল পাঁচুর হাতে, এই নাও, কুড়ি ট্যাকা। এর বেশী পারলুম না এখন।

টাকা পেয়ে পাঁচুর বুকে বাতাস লাগল। বলল, এইতেই হবে মা এখন, পোড়া পেট মানবে কটা দিন। যাই, ছোঁড়াটা একলা বসে আছে।

পাঁচু চলে গেল। মন বলে, নাতনীর চোখ দুটি যেন পিছে পিছে আসে। আসবার সময় যেমন বিলাসের চোখ দুটি এসেছিল। তা আসবে। রাইমঙ্গল আর কালিন্দী মেশে, ঝিল্লে আর বিত্তেধরী মেশে। টানে টানে মেশে। তার ঘূর্ণিতে পড়ে কে মরে, সে খোঁজ তারা রাখে না।

শ্রাবণ্যে টৌটা খলখল করে বেড়াচ্ছে গঙ্গায়। অনেক মাছমারা পালিয়েছে। আরো পালাচ্ছে প্রায় রোজই। যাদের উপায় নেই রয়েছে তারা। পালমশাই ধরে রাখতে পারছে না। মুখ খারাপ করে গালাগালি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ফিরে গিয়ে নাকি নালিশ করবে। ভয় দেখাচ্ছে নিলাম ক্রোকের।

এ অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের পাড়ায়, বাচ্চা বুড়োরা বেরিয়ে পড়েছে শহরের রাস্তায়। ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির ফ্যান চেয়ে খাচ্ছে। ঘটিবাটি গেছে বন্ধক।

পশ্চিমপারের মাছমারাদের সভা বসে গেছে। দল বেঁধে গেছে সবাই সরকারের প্রতিনিধির কাছে। প্রতিনিধি অনেক। ইনি বলেন, অমুকের কাছে যাও। অমুকে বলেন, আমি নয়, মন্ত্রীর কাছে যাও।

ছুটোছুটি করে মরছে সবাই। পাঁচুরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে। তারা দূরের মানুষ, এখানে অচেনা। যা করে মহাজন।

পুবপারের জেলেপাড়ার মাছমারারাও হাঁটাহাঁটি শুরু করেছে। জাগ্রত মরণ-দেবতা হানা দিয়েছে ঘরে ঘরে। তার ভয়ঙ্কর সংহার-মূর্তি এক মাসের মারেই সবকিছু ভেঙে ফেলতে চাইছে। বাপ-ছেলেয় মারামারি করছে, বউ-সোয়ামী ছাড়াছাড়ি করছে। এই না মাছমারার জীবন! এক কোটালে বাঁচে, আর-এক কোটালে মরে। মাছের প্রাণের চেয়েও তার আয়ু টলোমলো।

ঘা যখন হয়, তখন তাড়াতাড়ি হয়। দেখতে দেখতে দগদগিয়ে ওঠে। সময় লাগে শুকোতে। এখন কারুর শুকোবার ভাবনা নেই।— জ্বালা জুড়োয় কেমন করে, সেই ভাবনা।

তবু রেষারেষি করে এপার ওপার। কে পাবে আগে সরকারের সাহায্য, তারই রেষারেষি। বাঁচার জ্বালা এমনি, তখন অপরকে মারতে দ্বিধা নেই।

তবু গঙ্গা ফুলছে, রণরঙ্গিণী হয়ে, ভারী গোনের মুখে আসছে উত্তাল বান নিয়ে। অ-মাছমারারা দলে দলে আসে সেই বান দেখতে। কোম্পানি নাকি নোটিশও দিয়েছে, গঙ্গার গতিক বড়ো সুবিধার মনে হয় না। উত্তরের বন্যা, দক্ষিণেও সমুদ্র একটু বেশী

ফুঁসছে। দুলালের কথা মনে পড়ে, এনার হিদয়খানি বড়ো অকুলান হয়ে পড়ছে, কাটিয়ে গহীন না করলে আর চলছে না।

তাই জল আরো উঁচুতে উঠছে। রক্তগঙ্গা তার রক্তাক্ত দাগ মেরে আসছে যতদূর পারে।

আকাশ বাতাস জল, সব ঠিক আছে। শুধু যার প্রত্যাশা, সে আসে না। জলে কনকনানি। হিমালয়ের রুদ্র দেবতা প্রসন্ন না হলে, দক্ষিণের রুদ্রাণীরও প্রাণ শান্ত হয় না।

তারপর এল সরকারের সাহায্য। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এল, কিন্তু এক পারে। পশ্চিমপারের চল্লিশ ঘর শুকনো ডোল পেল সরকারের কাছ থেকে। চাল, গম, আর কিছু ডাল। তারও আবার ফ্যাসাদ আছে। নাম রেজিস্ট্রি করো, পরিচয় প্রমাণ-পত্র নিয়ে এসো, তারপর পাঁচ মাইল ঠেঙিয়ে যাও ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায়। মিউনিসিপ্যালিটির তল্লাটে সরকারের রিলিফ এখন আইনে অচল।

ছেলে-বুড়ো তাই যাচ্ছে ছুটে ছুটে। তবু তো পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পুব পার একেবারে নিঃসাড়। সন্ধ্যার পরে আর বাতিটিও জ্বলে না। দাওরায় উঠে শেয়াল হাঁক পাড়লেও সাড়া দেয় না কেউ। তারা তখনো ছুটোছুটি করছে সরকারের কাছে।

কিন্তু গঙ্গা যায়, আসে নিরন্তর। হাসে খলখল করে। আকাশে মেঘের বড়ো বড়ো চাংড়া মুখে বিদ্যুৎ হাসে।

পুব-দক্ষিণের মানুষদের কোনো কথাই নেই। কে তাদের জন্যে তদ্বির করবে। তারা দেখছে চেয়ে চেয়ে গঙ্গার দিকে। খালি পেটে ভালুক দাপাচ্ছে। কাছা খুলে বসছে সবাই দুই আঁকড়ে ধরে।

বড়ো লাঞ্ছনা গো মা। কাকে অভিশাপ দেব আমরা, ঠাহর পাচ্ছি নে। অন্ধ হয়ে কাকে আঘাত করব, তার খোঁজ জানি নে। চিনি শুধু তোকে। সাংলোর সলি দিয়ে মারব নাকি তোকে।

সবশেষে গঙ্গার মুখোমুখি দাঁড়ায় সবাই। নিরুপায় সন্তানেরা দাঁড়ায় মায়ের কাছে। নলেন টানা শুরু হয় গঙ্গার পুব পাড়ের চড়ায়। একটু বেদী পাতে মাটির। সেখানে হত্যো দিয়ে পড়ে মাছমারা। একে বলে নলেন টানা।

—কে হত্যো দিয়েছে ?

—পুরোথোঁড়গাছির ছিনাথ মালো আর পুবপারের এক চুমুরি।

জাল বাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আসে সবাই। বেদীর সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুজন। এই দুর্জয় সংহারিণী গঙ্গার সাক্ষাৎ চায় তারা। এই তাদের বিশ্বাস। চিরকালের এমনি চেনাশোনা, গঙ্গাকে বলতে হবে, এ তার কী মন, কেমন মতি। গঙ্গা বলুক, নইলে সে উঠবে না, বসবে না, খাবে না। আমরণ এই অনশন। দুকূলপ্লাবী এই জল। শুধু জল তো নয়। যে মহাপ্রাণ রয়েছে, মা বলেছে তাকে তারা। তবে কেন বলবে না। যারা আসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তারা গোল হয়ে ঘিরে হরিধ্বনি দেয়। জোয়ারের বেলায় এসে নামগান করে। মেটে ধূপদান থেকে ধোঁয়া ওঠে আকাশে।

যারা হত্যো দিয়েছে, তারা ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বরে চীৎকার করে, মা—মা গো! কী অপরাধ আছে মাছমারাদের বল মা! আমাদের— কী গতি হবে মা! কী আছে তোর গর্ভে এবার বল, নইলে উঠব না।

সেই আর্ত চীৎকারের পাশে, বড়ো শান্ত বড়ো ভয়ঙ্কর গঙ্গা হেসে চলে দিবানিশি। উপোসী চিল কাঁদে চীৎকার করে। গম্ভীর বক নিঃশব্দে ফেরে অপলক চোখে, ভাটার পলিতে।

—মা, মা গো!

সারা অঙ্গ কাঁপে থরথর করে। বেদীর সামনে মুখ ঘষে গ্যাঁজলা ওঠে বাসি মুখে।—মা···মা গো।

গঙ্গা চলে দুর্বোধ্য হেসে, কুলুকুলু করে।

আবার একটা গণ্ডগোল উঠল মাথা চাড়া দিয়ে। প্রতি বছরই ওঠে। পশ্চিমপারের পাড়ার মাছমারারা পাতলে বাঁধাছাঁদি জাল। বাঁধাছাঁদি জাল বিশালবেড়, বাঁধে গঙ্গার এপার ওপার জুড়ে।

দুলাল আগেই জানিয়েছিল বিলাসকে। কিন্তু সত্যি সত্যি ফেলবে, এটা বিশ্বাস করে নি। টৌটার সময় মানুষ ভালো বুদ্ধি হারায়।

বাকি মাছমারারা চেঁচিয়ে উঠল, এ অনিয়ম হতে পারবে না। আমরা জাল বাইব কোথায়? আমরা কি মরব নাকি?

বাঁধাছাদি বড়ো বাধা। এই জাল ফেললে, এক হাত জায়গা থাকে না গঙ্গায়। সাংলো বল, টানাছাঁদি বল, কিছুই ফেলা যাবে না বাঁধাছাঁদি ডিঙিয়ে। শুধু তাই নয়। বাঁধাছাঁদি পেরিয়ে আর কোনো তল্লাটে মাছ যেতে পারবে না, আসতে পারবে না।

এ তো সমুদ্র নয় যে জগৎবেড় জাল ফেলবে তুমি। সমুদ্র অনন্ত। জগৎবেড় নাম শুনেও তিনি হাসেন। কিন্তু গঙ্গার দেহে বাঁধাছাঁদিই আড়ে বাঁধা পড়ে যায়।

পশ্চিমপারের মাছমারারা বললে, আচ্ছা, আর ফেলব না, এই বারটি শেষ।

কিন্তু শেষ হল না। আবার ফেললে। দু-একটা মাছ পড়লও।

কেদমে পাঁচু চিনেছে বিলাসকে। বলল, বিলেস, এটা তো ঠিক হচ্ছে না।

সকলেই গোল হয়ে ঘিরে এল। এ কি অনিয়ম। প্রতি বছরই কথা কাটাকাটি হয়, প্রতিজ্ঞা করে পশ্চিমপারের মাছমারারা। কিন্তু কাজের বেলা ঠিক খেলাপ করবে। বাকি মাছমারা যায় কোথায় তাহলে। মরতে মরতেও যেটুকু আশা, সেটুকুও টিপে মারতে চায়। একটা বিহিত না করলে তো চলে না।

বিলাস বলল, চল, জাল খুলে দে আসি।

সবাই একবাক্যে সায় দিল, তাই চল।

পাঁচু চীৎকার করে উঠল, খবদ্দার বিলেস, মারামারি করিস নে, আপোসে মেটাবি।

বিলাসদের পাঁচ গণ্ডা নৌকা এসে লাগল গঞ্জের নিচে, বড়ো চরায়। পশ্চিমপারের মাছমারাদের ওইখানেই ভিড়, ওইখানেই বেঁধেছে বাঁধাছাঁদির খুটো, পাহারা বসে আছে দল নিয়ে।

আপোসে মিটতে চাইল না। পশ্চিমপারের লোকেরা এল লাঠি নিয়ে। খবর্দার, জালে হাত দিলে রক্তারক্তি হবে।

দেখতে দেখতে পশ্চিমপারের লোক ভিড় করে এল।

রসিকের চোখই সবচেয়ে বেশী জ্বলছে ধকধক করে। পালিয়ে-বেড়ানো হিংস্র চিতাবাঘটা যেন সুযোগ পেয়ে দাঁড়িয়েছে বিলাসের মুখোমুখি। হাতে তার তেল-চকচকে বাঁশের লাঠি। বলল, বড়ো যে তড়পাচ্ছিলে কদিন। এখন একবার তড়পাও দেখি, ঘাড়ে কটা মাথা আছে?

রসিকের মাথা ডিঙিয়ে বিলাস সকলের দিকে চেয়ে দেখল। তার চোখও বাদার বাঘের মতো জ্বলছে দপদপিয়ে। চীৎকার করে বলল, তোমরা মারামারি করতে চাও?

জবাব এল, জাল খোলা চলবে না। এখানে লাঠি আছে।

এদিক থেকে একজন বলে উঠল, এখেনেও টাকির লাঠি আছে।

আর একজন ছড়া কাটল, টাকির লাঠি, সাতক্ষীরের মাটি গোবরডাঙার হাতি…

বিলাস ক্রুদ্ধ গলায় বলে উঠল, আরে খেত্তরি তোর লাঠি মাটি হাতির নিকুচি করেছে। মীমাংসা তোমরা করবে না?

ওদিক থেকে জবাব এল, মহারানীর জলে মাছ ধরা, তামাসা কিসের।

অর্থাৎ রানী রাসমণির খাজনা-বিহীন জলে মাছ ধরার কথা বলছে।

বিলাস ছুটে গেল জলের দিকে। পাঁচু পিছন থেকে হাঁক পেড়ে উঠল বিলেস, বি-লেস।

বিলাস শুনল না। পাঁচু ছুটল পিছনে পিছনে। পাঁচগণ্ডা নৌকার মাছমারা, বিলাসকে ঘিরে ধরে ছুটল সঙ্গে সঙ্গে।

মরবে, মরণ ধরেছে বিলাসের। ওরে সর্বনেশে, তুই মরে আমাকে মারতে চাস। আমার পেটে মোচড় দিয়ে ব্যথা উঠছে, মাথা ঘুরছে। তোকে আমি কী করে সামলাই। বৌঠান! খোকাঠাকুরের নাম নাও।

রসিকের গলাই সবচেয়ে উঁচু শোনা গেল, সাবধান!

বিলাস দেখল জালের খুঁটোর কাছে রসিক। চকিতে তার হাত থেকে লাঠিগাছটি ছিনিয়ে বিলাস ফেলে দিল জলে। রসিকও সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিলাসের উপর। অনেকগুলি লাঠি-বৈঠা ঠকঠকিয়ে উঠল।

বিলাসের চোখে মুখে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করছে রসিক। বিলাস চীৎকার করে উঠল, জাল খুলে দিলুম আমি।

পাঁচুর বুকে ভয়ার্ত কান্না ও ক্রোধ উথলে উঠল। এ কি বিলেস, মুখের কষে তোর রক্ত ছুটছে। সমুদ্রে তুই কশাড় বেঁধে এসেছিস। গঙ্গায় এসে মরছিস তুই?

জাল খুলে দিল বিলাস। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পশ্চিমপারের মাছমারা নৌকো নিয়ে ভাসল জাল বাঁচাবার জন্যে।

এবার বিলাস ফিরল রসিকের দিকে। নাকে মুখে তার রক্তের দাগ। কিন্তু কালো কুচকুচে বিলাসের সর্বাঙ্গে যেন মূর্তি ধরেছে স্বয়ং

[illegible]কে জাপটে ধরে সে জলে নামল। বুক দিয়ে জলে ঠেসে ধরল জলে।

পাঁচু ভয়ে চীৎকার করে উঠল, ওরে শোয়েরের নাতি, আমার লক্ষ্মী বাবা বিলেস, খুন হয়ে যাবে যে?

বিলাসের হাত শিথিল হল। ছেড়ে দিল রসিককে। রসিক পাড়ে উঠল হেঁচড়ে হেঁচড়ে। নাক দিয়ে জল ঢুকে গেছে। বারে বারে গলায় হাত দিচ্ছে। যেন এখনো একটি সাঁড়াশি-হাত আঁকড়ে আছে তার গলা। দম ফুরিয়েছে তার। কিন্তু একটা মারামারির লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল।

ব্যাপারটি প্রথমে দেখেছে পালমশাই। সে খবর দিয়েছে ব্রজেন ঠাকুরকে। ব্রজেন ঠাকুরই এসে থামালেন।

মহাজন মানুষ ব্রজেন ঠাকুর, সকলেই ধারে তাঁর কাছে। তিনি ডাকলেন গঞ্জের আরো দু-চারজন মান্যগণ্য লোককে। মারামারি রোধ হল বটে সাময়িক ভাবে। কিন্তু সকলেই গণ্ডগোল করছে।

ব্রজেন ঠাকুর বললেন, বেশ, এখানকার যাঁরা নেতারা আছেন তাঁদের ডাকা হোক। সভা বসুক বিকেলে।

পশ্চিমপারের লোকেরা তাই মেনে নিল। কিন্তু বোঝা গেল তারা একটু মুষড়ে পড়েছে। এ ঘটনা প্রায় প্রতি বছরেরই। তবে এতখানি হয় না কোনোবারেই।

নৌকোয় এসে পাঁচু তার অশক্ত হাতে আরো দু ঘা দিল বিলাসকে। বলল, হারামজাদা, মানুষ খুন করতে চাস তুই। এ ভাটিতে আর জাল ফেলা নয়, তোকে নে বাড়ি ফিরে যাব আমি।

বিলাস মুখের রক্ত ধুয়ে বলল, হাঁ, তকে মরতে যাব বাড়িতে, সুখ আর ধরছে না। তুমি বোসো দিনি ঠাণ্ডা হয়ে। শুধু শুধু মেরো না বলে দিচ্ছি।

পাশে পাশে কয়েকটি নৌকা চলেছে। কেদমে চেঁচিয়ে বলল, বাবা বিলেস।

—কী বলছ খুড়ো।

—তুই বাবা পিকিত বাছাড়ি বীর।

আরো কয়েকটি নৌকোর মাঝিও সায় দিয়ে উঠল, যথার্থ বলেছ কদম পাঁচু। পুবের মান রেখেছে। যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর দরকার।

উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল দামিনী। নৌকো দেখে নেমে এল। বলল, কী হয়েছে পাঁচুদাদা, মারামারি করেছ তোমরা?

বিলাসকে দেখিয়ে পাঁচু বলল, জিজ্ঞেস করো ওঁয়ারে। দামিনী দিদি, আমার শরীল খারাপ, এ হারামজাদা আমাকে নিকেশ না করে ছাড়বে না।

বিলাস কোনো কথা না বলে তিবড়ি নিয়ে বসল। দামিনী গেল ফিরে। নাতনীকে তার সংবাদ দিতে হবে, সেইজন্যেই আসা।

কিন্তু কী হবে মারামারি করে। বাগবিতণ্ডায় কী আসে যায়। গঙ্গার টোটা-হানা বুকে এসেছে অদৃশ্য রাক্ষসী, সে নিরন্তর হাসে খলখল করে।

পুবের চরায় অনশন চলেছে একটানা। অনশন এমনি অমনি হয়েছেই।

বিকালে সভা বসল। এসেছে সব মাছমারা। অনেক নতুন মানী লোক এসেছেন সভায়।

একজন সোনার বোতাম লাগানো, আঙুলের সোনার আংটি চকচকিয়ে বললেন, জাল যখন আছে, তখন ফেলতেই হবে। তোমরা সকলেই ফেলতে পার বাঁধাছাঁদি জাল।

পশ্চিমপারের লোকেরা বলল, ঠিক ঠিক।

কেমন হল? বিলাস উঠল। পাঁচু তাকে বসিয়ে দিল ঘাড় ধরে। বোস, হারামজাদা, এত বড়ো বড়ো সব লোক রয়েছেন, উনি যাচ্ছেন কথা বলতে।

কিন্তু শোয়ের গোঁ। মালোর ব্যাটা উঠল আবার ঠেলে।—এটা কেমন কথা হল, শুনি?

এদিকে শুলতোনি উঠল।

—কে? কে কথা বলে?

—বিলেস।

—তেঁতলে বিলেস?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ।

মাস্তলোক এই বাজারের একজন বড়ো আড়তদার। বললেন, কেন? কথাটা মন্দ কী হল?

—আমাদের তো বাঁধাছাঁদি জাল নেই মশায়।

—নেই? কিন্তু সে দোষ তো ওদের নয়।

পশ্চিমপার—ঠিক ঠিক।

বিলাস উঠে দাঁড়াল। বলল, মশায়, বিচার করছেন কেমনধারা আপনি? আমরা আসি দূর গাঁ থেকে, লোকোয় বাস। বাঁধাছাঁদি আনতে পারি নে।

—সে দোষ কার?

পশ্চিমপার—ঠিক ঠিক।

পাঁচু হামলে উঠল, বোস বোস বিলেস, শোয়ের লাত্তি।

কিন্তু মন বলে পাঁচুর, মানীর মুখে এ কেমন মানের কথা?

বিলাস বলল, আমার যদি বাঁধাছাঁদি না থাকে, তবে কি আমি

কলা ঝুলে কে থাকবে মশায়? এটা কেমন [illegible]। তাহলে, গরিব মাছমারারা কী করবে?

[illegible] বসেন ঠাকুর চুপচাপ। সব মাছমারাই তার [illegible] খায়। কাজেই [illegible] না খাওয়াই ভালো।

আর-একজন মান্য লোক বললেন, গরিব-বড়োলোকের তো কোনো কথা নেই। তুমিও বাঁধাছাঁদি এনে ফেলো, কেউ বারণ করবে না।

বিলাস বলল, বাবু, বুঝে কথা বলেন। ওটা নিয়ম নয়, আকচা-আকচি বাড়বে তাতে।

এমন সময় সভার মঞ্চে আর-একজন উঠলেন। জোয়ান বয়সের মানুষ। কী যেন বললেন মঞ্চের বাবুদের। তারপরে সকলকে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ ভাই। গরিব জেলে সবখানে আছে। বাঁধাছাঁদি সেখানে চলে না। একমাত্র টানের দিনে, রাত্রে বাঁধাছাঁদি চলতে পারে। এখন বন্ধ রাখতে হবে।

একটা হৈ হৈ হল ভীষণ। কিন্তু শেষ কথাই সাব্যস্ত হল।

রাত হয়ে গিয়েছিল।

ফেরবার পথে, কেদমের সঙ্গে গল্প দিয়ে হেঁটে এল বিলাস। ঘাটে নামবার আগে, হঠাৎ দাঁড়াল হিমির দরজার কাছে।

কেদমে পাঁচুও দাঁড়াল। বলল, তুমি ঘুরে এসো, আমি যাই। কেদমে আর সে কেদমে নেই। বিলাসকে সে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছে। অন্ধকার উঠোন। ঘরেও বাতি নেই। বিলাস ডাকল, মহারানী আছে নাকি?

—কে?

অন্ধকার এক কোণ থেকে ছুটে এল হিমি।—এ কি, তুমি এসেছ? এসো এসো। মা গো, কী ভয় পেয়েছিলুম।

—এত ভয় কেন মহারানী?

—ভয় হবে না? মহারানী ডাক শুনে যে চমকে উঠেছি। আর সারাদিনই আমার ভয়ে ভয়ে কেটেছে, মারামারি করেছ তোমরা।

—দুখের সময়ে পায়ে পা দে ঝগড়া বাধাতে রসিকেরা। সাধ করে কি কেউ মারামারি করে? তা সে-সব মিটে গেছে। তোমার বাড়ির মানুষেরা কমনে গেল?

অন্ধকারেও হিমির চোখ চকচক করছে দেখা যায়। কপালে টিপ, নাকছাবির পাথরও ঝিকমিক করছে। চাপা গলায় বলল, যার যেখানে মন টেনেছে, সে সেখানেই গেছে।

—আর তুমি কোথায় ছিলে এই আঁধারে?

—বসে ছিলুম এক কোণে চুপ করে।

—কেন মহারানী?

হিমি গলা নামিয়ে বলল, আমার যেখানে মন টানে, সেখানে যেতে পারি নে, তাই। পা বেঁধে দিয়েছ তুমি, বলেছ, সময় হলে আসবে। নিজে আর যেতে পারি নে ঘাটে। রাত হলে রোজ বসে থাকি এমনি।

—মহারানী!

—ডেকো না গো এমনি করে। আমার বুক বড়ো কাঁপে।

—কাঁপবে কেন? আমি যে জানি, সত্যি মহারানী। কিন্তু দুলাল খুড়ো বলেছেল, তোমার অসুখ করেছে, ডাকতরবাবুর কাছে নাকি যেতে হবে?

হিমি যেন চুপি চুপি বলল, হ্যাঁ, তখন যে বড়ো বেশী কাঁপত, তাই তো ঘাটে যেতুম না। ডাকতর আমার নাড়ি টিপে দেখলে, চোখ দেখলে, জিভ দেখলে, তা পরে বললে, ও মেয়ে, তোমার রক্ত বড়ো উতল হয়েছে মা। বে-থা হয় নি? কী লজ্জা, কী লজ্জা! ও মা, ডাকতরবাবু এ কী কথা বলে গো। বললুম, না। বললে, তাই

তোমার শরীর খারাপ মা। এর ওষুধ তো আমার কাছে নেই। তা এই নাও, একটু ঘুমের ওষুধ দিলুম।

অন্ধকারের বুকে অন্ধকার বিলাস। অন্ধকারের বুকে মিশতে চায় হিমি। বলল, এসো ঢপ, বোসো। দু হাত দিয়ে টানল হিমি বিলাসকে।

বিলাস বলল, আজ বসতে আসি নি। মন মানে না মহারানী, একবার দেখে গেলুম। আসব, শীগগির আসব।

—কবে?

—টোটার মার শেষ হলে।

—একটু বসে যাও ঢপ।

বিলাস দাওয়ায় উঠে বসল। ঘরে উঠে বসবার সময় তার হয় নি।

জোয়ান কোটাল উথলে উঠল কূলে কূলে। পাড় ভাসল। বিলাসের বুকের অন্ধকারে মিশিয়ে গেল হিমি। অন্ধকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মতো নীলাম্বুধি বিলাস। উজানী মাছের মতো ভেসে বেড়াল হিমি সেই সমুদ্রে।

কিন্তু শ্রাবণ্যে টোটার থাবা ওঠে না। পিপাসা মেটে না তার রক্তের।

পূর্ণিমার জোয়ান কোটালের জন্ম হয়েছিল মরা মুখ নিয়ে। তারপরের অমাবস্যাও গেছে মরার মতো চুপি চুপি। কদিন রোদ গেছে খুব। আবার মেঘ জমছে আকাশে। প্রতিদিন মেঘ জমছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গুরু গুরু গর্জনে ডাক ছাড়ছে দূরের আকাশ।

পাঁচু আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সময় সাংলো নিয়ে বসে থাকে, জলে ফেলে না। বসে থাকতে পারে না আর তার

নিয়ে। বিলাস থেকে থেকে খুড়োর দিকে তাকায়। খুড়ো বারে বারে কাছা খোলে, কষায়। বিলাস বলে, খুড়ো, উপরে গো ছদিন বসে থাকো।

পাঁচু বলে, না, লৌকো ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কিন্তুন আকাশের এ কী ছিনালিপনা বুঝি নে। ঢালে না কেন?

শুক্লপক্ষের একাদশী এল। সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি এল ফিসফিস করে।

প্রথম রাতের ভাঁটায় হঠাৎ একটি ছোটো ইলিশ পড়ল কেদমে পাঁচুর সাংলো জালে। দেখে বুঝি কেদমে খুব খুশী। যেন হেসে বাঁচে না। সবাইকে মাছ দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, দেখো গো, মাছ পেয়েছি।

বলে, হঠাৎ মাছটাকে ল্যাজে ধরে, বাঁশকালির পাটাতনে আছড়াতে লাগল। ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে গর্জে উঠল, কেন, কেন এসেছিস ঢং-মারানী।

পরান বাপকে জড়িয়ে ধরে বলল,—বাবা, বাবা, অমন কোরো না বাবা।

মাছটাকে ছুড়কুটে ফেলে দিয়ে, হাঁটুতে মাথা গুঁজল কেদমে।

পাঁচু সাংলো ফেলেছিল। আচমকা বুকটা তার কেমন করে উঠল। মনে মনে বলল, মেরো না, মেরো না এমনি করে। ছোটো হোক, যত ছোটো, মাছমারা, ও ছাড়া তোমার জীবনে আর কেউ নেই। তোমার জীবনে মরণে সে। তাকে তুমি বুকে করে রাখো।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দেয়। পুবে সাওটার মনে হয়, যেন কোন কিসের সে ছুটেছে চুপিচুপি। গঙ্গায় এত নৌকা কিন্তু সব যেন নিঝুম। মড়ক লাগলে গ্রামের যেমন হাল হয়, সেই রকম। ছইয়ের মুখছাটের কাছে সকলের বাতিও জ্বলে না আজকাল। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডেকে যায় ডাঙায়। নিচে তার ঘূর্ণিতে কে যেন

মাথা দোলায় অনবরত। আর কাছের পাড়ার মেয়েগুলি মাঝে মাঝে হাসে ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ সাংলো খসে পড়ল পাঁচুর হাত থেকে

বিলাস চমকে উঠে বলল, কী হল খুড়ো?

শব্দ নেই। বিলাস দেখল, খুড়ো ঝুঁকে পড়েছে জলের দিকে। প্রাণপণে সাংলো টেনে তুলে ছুটে এল বিলাস। এসে ধরল খুড়োকে।

খুড়োর গায়ে জ্বর। আমাশায় কাপড় খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু চোখ রয়েছে তাকিয়ে। যেমন অন্ধকারে চকচক করে জল, তেমনি কোটরে চকচক করে খুড়োর ছুটি চোখের বিন্দু। না, জল নয়, যেন অপলক মীনচক্ষু।

শক্ত বিলাসের গলায় ভয়ার্ত হুতোশ। ডাকল, ও খুড়ো, তোমার কী হয়েছে?

সুরহীন চাপা-পড়া গলা শোনা গেল পাঁচুর, বাবা বিলেস, আমি মাছমারা। দক্ষিণ থেকে দাদা এয়েছে, আর এয়েছেন মীনেরা। আমার মরণ হচ্ছে রে।

—অ খুড়ো, তুমি কি বলছ?

—ঠিক বলছি বাবা। আমি মাছমারা। এই মরণ আমার ভালো। বিলেস—

পাঁচুকে ছেলেমানুষের মতো বুকে তুলে বলল বিলাস, খুড়ো, আমি তোমাকে বাড়ি স্থে যাব গো, খুড়ীর কাছে স্থে যাব।

যেন জলের অতল থেকে তেমনি সুরে বললে, পাঁচু, না বিলেস, আমার সময় হয়েছে। যত জনাকে মেরেছি, সবাই এয়েছেন। তোর খুড়ীকে বলিস। বৌঠানকে বলিস। আর বিলেস—

বিলাসের গলা ভেঙে গেল। বড়ো শক্ত ছেলে বিলাস, না? তবে এখন খুড়োর জন্মে কাঁদে কেন। বলল, বলো।

—বিলেস, বাদার সেই কালো পুরুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এয়েছেন আমার কাছে।

—কই?

—এই যে, তুই। তুই যে তার ছায়া, বাপের ব্যাটা।

—না, না গো খুড়ো।

—হ্যাঁ। মাছমারাকে কেউ যদি বিধেন দেয়, তুমি মাছ মেরো না, সে বিধেন মানা যায় না। বিলেস, তুই মাছমারা। তুই সমুদ্রে যাস টানের মরশুমে। ওটা মাছমারার জীবনের বিধেন। বাতাসের মুখে আমি এই কথাটা শুনি।

এবার বিলাসের বুকটা ফাটতে চাইল। বলল, না, না গো খুড়ো, তোমার সঙ্গে যাব।

দৈববাণীর মতো স্থির স্বরে বলল পাঁচু,—না। তুই সাই দে যাবি বিলেস। আর বিলেস—

—বলো।

একটু যেন দম নেয় পাঁচু। চোখের কোলে তার জল এসেছে। বলল, দামিনীর নাতীনের প্রাণখানি পোকার বলে বুইছি। ছুঁড়ী তোকে ভালোবাসে। মানুষের জীবনে এমন হয়। দামিনী চেয়েছেল তোর বাবাকে, পায় নি। নাতীন পেয়েছে তোকে। মাছমারার ঘরে যদি মেয়েটা আসতে চায়, তবে নিস। বিলেস—

—বলো।

—আমাকে হাঁটুতে দে হাল ধর। নৌকো ভেসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সামনে আওড়। ঘূর্ণিজলের শব্দ শোনা যায়।

বিলাস হাল ধরল। ঠিকই, সামনে দহ। কাউকে চীৎকার করে ডাকতে পারছে না বিলাস। বলল, খুড়ো, পারে চলো। দামিনীর কাছে ধার করে একবার বত্তি ডাকি।

—না, ওপারে যাচ্ছি। আর সময় নেই বাপ। বিলেস, একটা কথা বলি, মানুষ চিরকাল মাছ ধরবে। এ সোমসারের মানুষ মাছ-ভাত খাবে। তুই মাছ মারিস। জীবনে তাতে তোর কিছু বাদ পড়বে না। তোর কল্যেণ হোক। তুই দুধে-ভাতে খাস।

বিলাস গলা চড়িয়ে ডাকল, খুড়ো।

মেঘের ফাঁকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে চাঁদ। চোখ দুটি পাঁচুর তেমনি অপলক, চিকচিক করে। টেনে টেনে বলল, বা-বা!

বিলাস যেন সেই ছোটো ছেলেটি। বলল, আমি দুধে-ভাতে খাব, তুমি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ কমনে গো?

পাঁচুর গলা ডুবে এল। যেন আওড়ে তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কিন্তু কথাগুলি আবার যেন পরিষ্কার হল। বলল, আমি এতদিন হালে বসেছি, এবার তুই বসবি বাপ। আমার আগে তোর বাবা বসত। তার আগে আমার বাবা। বিলেস…।

—খুড়ো!

—তোর ভাই, আমার ছেলে, আগামী সনে তোর দাঁড় ধরবে। শাগুনে টোটার কথা বলিস তাকে। তুই টোটার শেষ দেখে যাস। মাকে গাল দিস নে। আর—

কথা ফুটল না। ঠোঁট কাঁপতে লাগল।…বোঠান, পেথম পোহরের শ্যাল ডাকছে এখন ধলতিতেয়, শুনতে পাচ্ছি গো। হুতোম প্যাঁচাটা ডেকে মরছে কেন, ঠাহর করতে পারছ না? কেন অমন দমকা দমকা বাতাস আছড়ে আছড়ে পড়ছে বেড়ায়, অনুমান করতে পারছ না? কেন তোমার জায়ের হাত থেকে বাটিখানি পড়ে গেল, তাই ভেবে মরছ? ওই জানান দিচ্ছে। পাঁচু তোমাদের ছেড়ে যায়। বিলেস…বা-বা বি-লে-স…

ও, সংসার ছেড়ে যাচ্ছি, তাই আর সাড়া নেই, না?

হে দক্ষিণরায়, তোমার ভয়ঙ্কর রূপ আমি দেখেছি। মা বনবিবি, তোমার মহামারী বিভীষিকা দেখেছি দাঁড়িয়ে পাথারে। হে সমুদ্র, তোমার রুদ্র রূপ আমি দেখেছি। বাদা, হেতাল, সুঁদুরি বনের মালো, তোমার খরা শুনেছি। মাগো গঙ্গা, তোমার অনন্ত বুকের মহাসর্বনাশকে দেখেছি, তোমার আশীর্বাদ পেয়েছি অনেক। তুমি আলজ খোলা জটায় লুটিয়ে, রুদ্রাণী তুমি আমার শিয়রে। তোমাদের মাঝে একদিন মাছধরা আমি ফিরেছি, তোমাদের হাতে রেখে গেলুম বিলেসকে। বিলেস রাখবে ঘর-গেরস্থি।

সহসা নৌকা যেন থেমে গেল। শক্ত হাতে আঁকড়ায় যেন কে। কে? যক্ষ, না রক্ষ, না প্রেত? নাকি কেউ বসে ছিল ঘূর্ণিদহের ছদ্মবেশে।

কেউ না, জোয়ার আসছে, থম খেয়েছে গঙ্গা। পরমুহূর্তেই প্রবল গর্জন শোনা গেল। বিলাস পিছন ফিরে দেখল, কয়েক হাত উঁচু হয়ে, ফণা-তোলা নাগের মতো বান আসছে।

পাঁচুকে বুকের মধ্যে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে, দু হাতে হাল ধরল বিলাস। এই প্রথম তার হাল ধরা।

দেখতে দেখতে বিলাসের মাথা ছাড়িয়ে বানের ঢেউ এসে পড়ল। গলুই উঁচুতে উঠে খাড়া হয়ে উঠল নৌকা। বিলাস কষে চাপ দিল হালে। ঢেউয়ের মাথার সঙ্গে নেমে গেল আ ার। জোয়ার এল। দক্ষিণের জল। বাতাস এল, পুবে সাওটা। ফিসফিসে জল, তবু থেকে থেকে চাঁদ দেখা যায়। আর দেখা যায়, জলে কিলবিল করে চকচকিয়ে চলেছে জোয়ারের স্রোত। দূর আকাশে হিলিবিলি বিদ্যুতের। মেঘের গুরু গুরু চাপা গর্জন আসছে ভেসে।

পুবের চরায় নলেন টানা চলেছে নিরন্তর। টিমটিম করে বাতি জ্বলছে সেখানে। ছায়ার মতো মানুষেরা হরিধ্বনি করছে। ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে, মা, মা গো!...

—সামনে এসো হে। কার নৌকা ?

কেদমে পাঁচুর গলা ? বিলাস বলল, কেদমে খুড়ো, ইদিকে এসো।

—কে, বিলেস ?

—হ্যাঁ। একবারটি ইদিকে এসো, খুড়ো আমার মরে গেল।

—আ বাবারে বাবা! আ গো মা গঙ্গা! তুই বলিস কী রে বিলেস! পাঁচদা মারা গেল ?

ছেলের হাতে হাল দিয়ে, এ নৌকোয় এল কেদম।

পুবপারের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল নৌকা। কেদমের বুঝি কান্না পেয়েছিল। চীৎকার করে বলল, ধলতিতের পঁচানন মালো মারা গল হে-এ-এ-এ!

ভগবতীর বেদী-ঘেরা মানুষগুলি হঠাৎ থতিয়ে গেল।

গঙ্গা ফুলছে, ফুলছে, ফুলছে। এঁকেবেঁকে, নেচে, হেসে দিগ-দিগন্তে চলেছে ছুটে।

এখানে কশাড় বাঁধার চিহ্ন রেখে যাওয়া যায় না। শ্রাবণের জোয়ান কোটালে যখন গড়ানের পর গড়ানেও খুঁটনি বেয়ে কোনো সংবাদ আসে না, তখন মাছমারা টের পায়। টনক নড়ে তার। মরণ বুঝি আসে।

মাছমারাদের নৌকো এসে লাগল পশ্চিমপারে। খবর পেয়ে ছুটে এল দামিনী। জোয়ারের হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে কাঁদল বুড়ী। বলল, এই সেদিনেও হাঁপাতে হাঁপাতে গেছল আমার কাছে। বড়ো যে মান-জ্ঞান ছেল। তা হাত কচলে কচলে বললে, বড়ো শরম লাগে দামিনীদিদি, কিন্তু মাছমারার পাণ, শরমে কী হবে। আর দশটি ট্যাকা দিও। হিমি দিলে দশটা ট্যাকা। যাওয়ার সময় বললে, গঙ্গার কাণ্ডটা দেখছ তো দামিনীদিদি। পাঁচ সন আগের কথা মনে পড়েছে আমার। এবার বুঝি আর বাঁচি নে।...

হিমি জড়িয়ে ধরেছিল দিদিমাকে। নজর তার বিলাসের দিকে। বিলাসের কোলে পাঁচুর শব। হিমি রুদ্ধ গলায় বলল, কত করে বলেছিলুম, খুড়ো, দুদিন থাকো-সে ওপরে। থাকলে না…

নৌকায় করে শবযাত্রা হল। একটু দক্ষিণেই শ্মশান। পাঁচ-ছটি নৌকো একসঙ্গে চলল। ঠাণ্ডারামের মৃত্যুর দিনও এমনি গিয়েছিল অনেকে।

রাত কাবার হতে বেশী বাকি ছিল না। পাঁচুকে পুড়িয়ে বিলাস নৌকায় উঠল। নৌকার ফালি বাঁশের পাটাতন খুলে পরিষ্কার করল সব ধুয়ে। স্নান করল। হালে টান দিতে যাবে। কে যেন নৌকায় উঠে এল।

—কে?

—আমি সয়া।

এতদিন পরের নৌকায় ছিল সে। এবার এল বিলাসের নৌকায়। ফিরে যাবারই বা পয়সা ছিল কোথায়? পালমশাই হাত উপুড় করবে না আর। মরণের সংবাদ নিয়ে যাবে একেবারে সবশেষে।

বিলাসের কাছে এসে বসল সয়ারাম। শরীর ফুলতে লাগল তার কান্নায়।

আকাশ কালিন্দী রূপ ধরেছে। শেষরাতে পুবে বাতাস আরো ভারী আর ঠাণ্ডা ঝাপটা দিচ্ছে। এপাশে ওপাশে কয়েকটি নৌকার হালে শব্দ হচ্ছে ক্যাঁচ কোঁচ কর্ র্ র্…

বিলাস বলল, সয়া, কাঁদিস নে।

—কাঁদব না?

—না, কাঁদিস নে।

—আচ্ছা।

বলে সয়ারাম কাঁদতে লাগল।

ভাটা পড়ে গেছে। নৌকাগুলি পুবে সরে গেল। ভাগাড়ের দহ আছে সামনে। কতগুলি শেয়াল নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে।

খানিকক্ষণ পর সয়ারাম বলল, বিলেস, আমি তোর নৌকোয় থাকব।

জবাবে বিলাস বলল, নৌকোর নোঙরটা ফ্যাল দি-নি।

নৌকো নোঙর করতে না করতে, উঁচুপাড় থেকে একটি মূর্তি নেমে এল খানিকটা। জিজ্ঞেস করল, কারা এলে?

বিলাস ফিরে তাকাল। মহারানী! জবাব দিল সয়ারাম, বিলেসের নৌকো এল।

বিলাস উঠে গেল উপরে হিমির কাছে। ঘোর নীলাম্বরী পরেছে হিমি। বিলাসের গায়ের মতো অন্ধকার শাড়ি। চুল বাঁধে নি। এলো চুল সারা পিঠে ছড়িয়ে বাতাসে উড়ছে। অন্ধকারে জেগে আছে গোরা মুখখানি আর দুখানি হাত, তার উঁচু সীমানায় নিটোল কাঁধ।

বিলাস বলল, এ সময়ে এখেনে কেন মহারানী?

হিমি তাকিয়ে ছিল বিলাসের মুখের দিকে। বুঝি ঢপের শোক কতখানি, জানতে চায়। কিন্তু এই অন্ধকারের মতো, বহু ভাবের ঘোরে একটি নৈর্ব্যক্তিক লয়ের মতো বিলাসও অন্ধকারে মেশামেশি।

হিমি বলল, তোমার পথ চেয়ে। উঠে এসো ঘরে।

বিলাস হিমির মুখখানি কাছে টেনে নিয়ে এসে দেখতে লাগল। হিমি বলল, কী দেখছ ঢপ?

বিলাস বলল, খুড়ো বলে গেল, 'বিলেস, দামিনীদিদির নাতীনের মনখানি পোক্কার বুয়েছি।'

হিমির গলায় কথা আটকে এল। বিলাস তাকাল দূর গঙ্গার বুকে।

হিমি বলল, চল, ঘরে উঠে এসো।

বিলাস বলল, মহারানী, ঘরে যাবার সময় হয় নি। সামনে পূর্ণিমার জোয়ার কোটাল দেখে তা-পর যাব।

বিলাস জোয়ান কোটাল দেখতে চায়। এত শোকের মধ্যে, ইমির বুকের খালি ঘরেও যেন ভরা কোটাল ভাসিয়ে যায়। মাছমারা সখানে আসে না।

বিলাস আবার বলল, মহারানী, ঘরে যাও। শাওনে টৌটার মার এখনো শেষ হয় নি।

ছদিন ধরে মহিষকালো আকাশে কেবলি বিদ্যুতের ঘটা গেল। বৃষ্টি হল ফিসফিস করে। তারপরে মহিষগুলি দাপাদাপি শুরু করল ভয়ঙ্কর। বৃষ্টি এল মুষলধারে। মেঘ নামল গড়িয়ে গড়িয়ে, জড়িয়ে ধরতে আসছে যেন গোটা গঙ্গার বুকখানি। বাজ পড়ল হুঙ্কার দিয়ে। পুবসাগরের রুদ্র ঝড় শুরু হল হঠাৎ।

তারপরেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এল।

ভাদ্র মাস পড়েছে।

সয়ারাম চীৎকার করে উঠল, জলে ওগুলান লাফায় কিরে? বিলেস…ও বিলেস!…

বিলাসও তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। ভাটা পড়েছে, সাংলো জালের গড়ান মেরে চলেছে ছজনে।

বিলাসের গলায় তেমন উল্লাসের সুর শোনা যায় না। বলল, কাল থেকে দেখছি। ভাসনা লাফাচ্ছে জলে।

হ্যাঁ, ভাসনা তিড়িংবিড়িং করে। অর্থাৎ রসনা চিংড়ি। দূর সমুদ্রের জল এসেছে গঙ্গায়। জলে তার দেখা দিয়েছে আবার জীব। এতদিন কিছুই ছিল না।

চলন্তায় গড়ান দিয়েছে বিলাস।

হ্যাঁ, গড়ান মার, গড়ান মেরে চল বিলেস। মুকড়া টানের জল, প্রাণ দেখা দিয়েছে। জল বড়ো গহীন, সাংলো আরো নামা। চল, আমি আছি তোর কাছে কাছে।

আঃ, পোকা বড়ো কিলবিল করে হাজার মাংসে। পাটাতন সরিয়ে বিলাস কাটা লেবু বার করল। রস নিংড়ে নিংড়ে দিল কাটা মাংসের মধ্যে। জালা করে উঠল। তারপরে একটু কমল জলুনি। থামল পোকার কিলবিলোনি। লেবুর রসে হাজার পোকা মরে।

আস্তে আস্তে জলের পোকারও বাড়াবাড়ি দেখা যায়। মেকো এসেছে, উজানী পোকা। উজানীদের আসবার সময় হয়েছে বুঝি গঙ্গায়।

সামনে আওড় দেখা যায়। চিকচিক বিদ্যুৎ চমকাল, আর বিলাসের খুঁটনি-জড়ানো আঙুল যেন চকিতে কেঁপে গেল একটু।

ওকোড় মারল বিলাস। নৌকা কাত হয়ে পড়ল।

প্রথম গড়ানেই দুটি ইলিশ। বড়ো জাতের মাছ, প্রকৃত মেয়েলি গড়ন।

সয়ারামও ওকোড় মারল। মাছ উঠল একটি। বলল, টোটা কাটল নাকি রে বিলেস?

মুখের কাছে মাছ তুলে ধরে বিলাস। বলে, কোথায় ছিলি? খুড়োকে খেয়ে তবে এলি।

তার পরের গড়ানে আবার দুটি পেল বিলাস। শেষ রাত্রের ভাটায় বিলাসের লোহার মতো হাতের এক ওকোড়ে চারটে মাছ উঠল সাংলোয়।

সয়ারাম চেঁচিয়ে প্রায় কেঁদে ওঠে—ও বিলেস, এমনি করে মাছ পলে সাংলো যে বেশীদিন টিকবে না।

বিলাস বলে, জাল আছে আরো।

সয়ারামের জলে-ধোয়া রোদে-পোড়া গালে জল। বিলাস বলে কাঁদিস নে সয়া।

সায়ারাম বলে, আচ্ছা।

বিলাস বলে, হাতখান বুঝি ছিঁড়ে পড়ে রে সয়া। হাজা বড়ো দগদগ করে। ছইয়ে গোঁজা আছে প্যাকাটি, গুঁড়োর তলায় আছে গাবের আঠা। একটু গরম কর দিনি।

গাবের আঠা গরম করে, বিলাসের দু হাতে মাখিয়ে দিল সয়ারাম, নিজের হাতেও মাখল। জালের কাছি আর সহজে কেটে বসতে পারবে না।

বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণ নয়। পুবে সাওটার ঝাপটায় গুঁড়ি গুঁড়ি ভেসে আসে। ইলশেগুঁড়োনি।

একদিনে, বিলাস একলা ধরল সতেরো সের ইলিশ মাছ।

দামিনীর হাসি আর ধরে না। কেঁদে আর বাঁচে না। কোথায় ছিল এত মাছ? কাকে খেয়ে এল?

সাংলোর সঙ্গে টানাছাঁদি ভাসাল বিলাস। সতেরো সের থেকে পরদিন বাইশ সের। পুর্ণিমার দিন সাঁইত্রিশ সের মাছ একলা ধরল বিলাস।

মাছ মাছ, উজানী মাছ এসেছে।

দিদিমা আর নাতনী নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না। অষ্টপ্রহর লোক ছুটছে বাজারে। বরফ ভাঙছে, টাটকা রাখছে মাছ।

হিমি আসে ছুটে ছুটে। জোয়ারের বেলায় আসে। এসে নৌকায় উঠে পড়ে। বলে, ওগো চপ, আর কতদিন?

বিলাস বলে, এই যে মহারানী, জোয়ান কোটাল যায়। ভরা কোটাল শেষ করি আগে।

হিমি হাসতে যায়, চোখে জল এসে পড়ে। চুপি চুপি বলে, আমি যে কিছু না দেখে ভেসে পড়েছি। চপ, আমারো যেন ভরা কোটাল যায়।

বিলাস বলে, মহারানী, এসুন বলে। ঠিক কোটালে যাব। তোমার কাছে না গ্যে থাকতে পারবে না ভেঁতলে বিলেস।

পূর্ণিমা গেল। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী। তখনো টান ভাটায় খুব জোর। সমুদ্র উজাড় করে মাছ আসছে। তারনগুহারবার আর কোলাঘাটের মোহনায় বুঝি মাছ থই পাচ্ছে না।

সরকারী ডোলের কথা মনে নেই আর কারুর। বাঁধাছাঁদি জেলে কেউ ঝগড়া বাধাতে চায় না আর।

আকাশ এক-এক বার গুরু-গুরু করে। আবার কালো করে নামে বৃষ্টি।

ফড়ে-পাইকেরদের ভিড় কমে না নদীর ধারে। আতরবালারও কোটাল দেখা যায়। সব সময়েই হাসে। বিলাসকে একটু বেশী চোখে চোখে রাখে। বলে, আমাদের ছোটোমাসীটিরে একেবারে মেরেছে?

বলে খিলখিল করে হাসে। চুবড়িতে কিনে কিনে জড়ো করে মাছ। দুলাল আসে, নিয়ে যায়।

পালমশাই আর ব্রজেন ঠাকুর সকলের মাছই আটকাবার চেষ্টা করে। কত আটকাবে। উপচে পড়ে যে।

হিমি আসে সন্ধ্যার জোয়ারে। যখন সয়ারাম বাজারে যায়। মাছমারারা এখন ডাল খায়, একটু পিঁয়াজ কাঁচালঙ্কাও আসে। জেলো ডাঁটার সঙ্গে দু-চারটি গোল আলুর শখের খাওয়াও দেখা যায়। তাই সয়ারাম বাজারে যায়।

হিমি আসে।—ওগো চপ!

—বলো।

—আর কতদিন?

—এই সময় হল বলে। গঙ্গা যে বড়ো দিচ্ছে কি না। এই কালটুকু কাটুক।

—আমার যে বড়ো ভয় করে চপ।

—কেন?

—সেই যে বলেছি, একলা থাকতে বড়ো ভয় লাগে। তুমি যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছ।

—ভয় কী মহারানী?

—ভয় নয়? এত ভয় যে কোনোকালে পাই নি গো। তুমি আর দেরি কোরো না।

দেরি করা বিলাসের হাত নয়। গঙ্গা এতদিন সাড়া দেয় নি। দিলে তো, ভরে দিল। না নিয়ে যায় কেমন করে মাছমারা।

তারপরে অমাবস্যা এল। বিদায় নিতে লাগল অনেক মাছমারা।

পালমশাইও বিদায় হল বিদায়-নেওয়া নৌকোর সঙ্গে। কিন্তু গঙ্গার কাল তখনো শেষ হয় নি। মাছের পাইকারী দর একশো থেকে আশী, সত্তর, ষাট, পঞ্চাশে নেমে এল আস্তে আস্তে। যেমন করে জোয়ান কোটাল শেষ হয়। অমাবস্যার মরা কোটালে আবার একটু দাম চড়ল।

দর কমল বটে মাছের। মাছমারারা তবু ক্ষান্ত হয় না সহজে। মাছ মাটিতে পুঁতে ফেলার দিন আসে নি। তাও হয়। অপর্যাপ্ত মাছ, পচে যায়, পড়ে থাকে বাজারে, হাওয়া দূষিত হয়। সে রকমও হয়েছে অনেকবার।

কেদমে পাঁচু এখন আর যেন বিলাস ছাড়া জানে না। খুবই প্রসন্ন। আদর করে ডাকে, ওহে বাছাড়ি।

—কী বলছ কেদমে খুড়ো?

—এমন মাছ কিন্তুন বাবা কয়েক বছর হয় নি। তারপর ভাজের

তমার জলের দিকে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে, তবু দুজন দেখে যেতে পারলে না।

হ্যাঁ, দুজন। পাঁচু আর ঠাণ্ডারাম।

সন্ধ্যাবেলার নামো-নামো-অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল সয়ারাম। মুখ চেপে রইল হাঁটুতে।

বিলাস বলল, ও সয়া।

—উঁ ?

—কাঁদিস নে রে।

—কেন বিলেস, কাঁদব না কেন ?

—না, কাঁদিস নে। কেঁদে কী হবে ?

—তোর মতন আমার পাণটা যে শক্ত নয় বিলেস।

—শক্ত কর। কাঁদিস নে।

—আচ্ছা, কাঁদব না।

শুধু দু চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যায় সয়ারামের। দাদার জন্যে বড়ো শোক পেয়েছে সে।

বুঝি কেদমের গলায়ও কান্না পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। বলে, দুটি পুরোনো লোক গেল।

—তা গেল।

বলে বিলাস দূর দক্ষিণে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলে, এট্টা কথা ছেল পাঁচকা।

—বলো।

—ভাবছি বলে টানের সময় আমি সমুদ্রে যাব।

কেদমে পাঁচু তার নৌকোয় এগিয়ে এসে বলে, তা বেশ তো বাবা, খুব ভালো কথা। তোমার ওপরে এখন সবাই সদয়। বাপ জ্যেঠা গেছে দক্ষিণে। তুমি ছেলে দড়ো, ঘাঁত-ঘোঁত বুঝেছ। মহাজন

তোমার জুটবে। তুমি মহাজন ধরো, সাথে সঙ্গে চলো। আমাদেরও সঙ্গে চলো।

বিলাস বলে, তাই যাব পাঁচকা। তুমি সবাইকে বলো। সংবাদ দেও গাঁয়ে সব আলো ঝালো নিকিরি চুনুরি মাছমারাদের। তোমাকে আমার সহায় চাই পাঁচকা।

—থাকব বৈ কি বিলেস, নিশ্চয় থাকব।

হিমি আর থাকতে পারে না। আবার শুক্লপক্ষ এসেছে। জলের ঘোলানি একটু কম দেখা যায়। আশ্বিন মাস পড়ো-পড়ো। এই মেঘ, এই রোদ। এই হাসি, এই কান্না। হিমির প্রাণের মতো। কী কুহক ঠাঁই নিয়েছে তার বুকে। এই ভয়, এই নির্ভয়। এই মুখ ভার, এই আর হেসে বাঁচে না।

বুড়ী দামিনী দেখে আর অদৃশ্যে গালে হাত দেয়। এত পোড়-খাওয়া মেয়ে। তবু কেমন ভাব লেগে গেছে। লাগে। এ পোড়া প্রাণ, বড়ো যে নিলাজ। পোড় যত খায়, তত যে গাঢ়-রক্তের ছোঁয়া লাগে।

হিমি এসে হাত ধরে নিয়ে যায় এবার বিলাসকে।

বিলাস বলে, যাবার সময় হইনে আসে মহারানী।

হিমি বলে, না। ভাদুরে পুন্নিমে যদি কাটাচ্ছই, সাঁজার কাটিয়ে যাও চপ এখেনে। গঙ্গাপুজো হোক, তা 'পরে যাও।

বিলাস হিমির মুখটি তুলে ধরে। মুখখানি শুকু-শুকু দেখায়। চোখের দুটি তারা বড়ো চঞ্চল হয়েছে, কিন্তু পাতা-দুটি বড়ো ভারী ভারী লাগে, কেবলি নেমে যায়।

বিলাস বলে, তাই যাব মহারানী।

—ঘরে আসবে কবে ঢপ ?

—আর ছুটি দিন।

অন্ধকারে উঁচুপাড়ের গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলে দুজনে। সয়ারাম তিবড়ি জ্বালিয়ে, নৌকায় বসে দেখে। বিলাস আর হিমিকে দেখে তার মনে হয়, বাতাসে বড়ো সোহাগ উথলে উঠেছে। ঘরে ফেরার জন্যে প্রাণটা তার হু হু করে ওঠে।

হিমি আবার বলে, ঢপ!

—বলো।

—সাঁজার যদি কাটাও, কাত্তিকে চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রাও হেঁকে নিয়ে যাও।

বিলাস হেসে বলে, গঙ্গার বারোমাসের মানুষ করতে চাও মহারানী ?

—সে কপাল কি আমি করেছি ?

—আমার যে মাছমারার কপাল। মহারানী, বাড়িতে মা-কাকীর সঙ্গে দেখা করে, আমি সমুদ্রে যাব টানের সময়ে।

সমুদ্রে! হ্যাঁ, সমুদ্র, সমুদ্র, সমুদ্র। ঘোর অন্ধকারে যেন মিশে একাকার হয়ে গেল বিলাস। নীলাম্বুধি অন্ধকারের মতো মহাসমুদ্র হয়ে গেল। সেই বুকে ভেসে পড়ে বলে হিমি, সমুদ্রের টান লেগেছে আমারো। আমি এখেনে থাকব কেমন করে ?

—তুমি যাবে মহারানী, অকূলে ভাসবে আমার সঙ্গে ?

—সেই যে আমার বড়ো সাধ। নইলে থাকব কোথায় গো ?

মহাসাগরে হামাল ডাকে। মহাপ্লাবন ওঠে তার বুকে। বিলাস বলে, সেই আমার আশা, মহারানী। তোমাকে নে যাব আমি। তারপর সাঁই নে সমুদ্রে যাব। তার আগে মহাজন ধরব।

—মহাজন কেন ?

—মহাজন চাই নে? পাঁচ হাজার ট্যাকা চাই আমার। বারো গণ্ডা নৌকো নেয়ে আমি যাব, দুশো মাছমারা যাবে আমার সঙ্গে। সাঁইদার আমি, তাদের খাওয়া-পরা ভালো-মন্দ আমাকে দেখতে হবে।

হিমি যেন সমুদ্রে ডুব দেয় আর ওঠে। বিলাসকে ছাড়ে না। বলে, চপ, সমুদ্রের মহাজন হতে মন করে আমার।

তা বটে, পাঁচু বুঝি শুনতে পায় না। এই কালো কুচকুচে পাহাড়ে বুক দেখলে, সমুদ্রের ফড়েনী হতে মন করবেই।

আর-একজনেরও করেছিল।

বিলাস দেখে, অন্ধকারে যেন হিমির মুখখানি সাদা ফুলের মতো ফুটে আছে। বলে, তা, তোমার কাছে আমার সবকিছু বন্ধক রেখেই তো সাগরে যাব। তুমি আমার সবচেয়ে বড়ো মহাজন।

দামিনীর গলা শোনা যায়। হিমি···অ হিমি। ছুঁড়ীকে নিয়ে আমার কী জ্বালা গো।

হিমি বিলাসের হাত ধরে টানে, এসো, ডাক পড়েছে।

—দুটো দিন পরে।

আবার দামিনীর গলা শোনা যায়। কী জানি বাবা, কী আছে আমার কপালে।

কার যেন হাসির শব্দ শোনা যায়। হাসির রকম দেখে বোঝা যায়, হিমির পিরিতের রঙ লেগেছে গোটা পাড়ায়।

যাবার আগে আবার ফেরে হিমি, চপ, কাত্তিকের চাকুন্দে মাকুন্দে খয়রার কথা তো বললে না।

বিলাস বলে, তোমার সাধ বলে, কাত্তিক কাটিটে যাব। অগনের পেথম আমাকে যাত্রা করতে হবে।

[illegible] হিমি। [illegible] [illegible]। সমাবায় [illegible] থাকে

গোল-গোল চোখে। তারপর বলে, মনটা ভালে তোর সুস্থির আছে বিলেস?

—কেন?

—না, বলে কোনোরকম বে-ভাবটাব নেই তো।

—আমি বুঝি খালি বে-ভাবে থাকি?

—সে কথা বলছি নে। সে-সব কথা আর মনে নেই তো।

বিলাস গম্ভীর হল, তোর খালি আন কথা সয়া। শোন, কাজের কথা আছে।

কাঠের হাতা দিয়ে ভাত নেড়ে বলে সয়ারাম, বল।

—কেদমে কাকা পরশুকে দেশে ফিরছে, তুও বা সয়া। ট্যাকা ক্টে দেব তোকে, আমার মার হাতে তুলে দিস। না জানি সেখানে কী টৌটাটাই চলছে।

সয়ারাম বলল, যথাথ বলেছিস বিলেস, কেন্নার জন্যে আমারো মনটা বড়ো উথাল-পাথাল করছে। এট্টা কথা বিলেস—

—বল।

—মণখানেক মাছের দাম রয়েছে আমার কাছে। সায়লে ধরা মাছ।

—মাছ তো তুই ধরেছিস।

—কিন্তুন জাল লৌকো, সবই তোর বিলেস।

এত্তদিন বাদে বিলাসের ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। বলে, বড়ো যে কথা শিখেছিস। মহাজন পেলি নিকি আমাকে?

চুপ করে গেল সয়ারাম। গতিক সুবিধের নয়।

বিলাস আবার বলে, ট্যাকাগুলান তোর বউয়ের হাতে দিস। আর খুড়োর কথা অ্যাদ্দিনে বাড়িতে গেছে। তুই সব বুঝিয়ে বলিস।

এতক্ষণে আসল ভয়ে চমকে উঠল সয়া। বলে, আর তুই? তুই যাবি নে বিলেস?

আকাশে তারা ফুটছে। জোয়ারের সর্পিল স্রোতে ছায়া তার নিয়তই হারাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে বলে বিলাস, যাব, কাত্তিকের চাকুন্দে-মাকুন্দের কালটা দেখে যাব।

সয়ারামের মনে মনে রাগ, ভয়ও কম নয়। বলে, আরে বাপরে বাপ, আমি তালে কিছু বলতে পারব না।

—না পারলে থাক।

মুখ ফিরিয়ে নিল বিলাস। সয়ারাম বলল, আমার হয়েছে জ্বালা। তা কী বলব বল।

বিলেস বলে, বলিস, যেন ভাবনা না করে। বলিস, ধরা রেখেছিলুম গলায়, পরশুকে কামাব। আর···চুপ করল বিলাস।

সয়ারামও চুপ। থাকো তবে চুপ মেরে। সয়ারাম কথা যুগিয়ে দেবে না তোমার মুখে।

বিলাস বলে, আর কী বা বলবি। বলবি এখেনকের কথা, যা দেখছিস শুনছিস···

উঁ। যা দেখছিস শুনছিস। অর্থাৎ তোমার মহারানীর কথাটিও বলতে হবে।

বিলাস বলেই চলে, ঠিকমতন বলিস, মাকড়ার মতন আবোল তাবোল বলিস নে। আর আনতে কুড় এনে ভয় পাইয়ে দিস নে।

হুঁ। যত আন চিন্তা তোমার অথচ আর আনতে কুড় আনছে সয়ারাম। সয়ার কাছে কপটতা করিস তুই বিলাস। তোর বুকে হামাল ডেকেছে, বান চেতে উঠছে। জানি, তোর মন আর মানছে না। মানে কখনো? মহারানীরও যেরকম ভরা গোন দেখছি, তাতে না ভাসিয়ে ছাড়বে না

মুখখানি গম্ভীর কিন্তু দুঃখী-দুঃখী ভাব করে বলে সয়ারাম, পোক্কার করে বল কী কইতে হবে।

বিলাস বলে, বলিস যে, খুড়োর হুকুম মেনে কাজ করে বিলেস। খুড়ো যা বলে গেছে, তাই হবে।

সয়ারাম যেন উল্লুক বনে গেল। খুড়ো কী বলে গেছে বিলেস?

—বলে গেছে, বুড়ির নাতীনের মনখানি পোকার বলে বুয়েছি বিলেস, মেয়েটা তোকে ভালোবাসে।

বিশ্বাস করল সয়ারাম। বন্ধু তার মিছে কথা বলে না কোনোদিন।

—হ্যাঁ, আর এট্টা কথা—

বিলেস বলে, পরশুকে যদি যাস, সেটা শুকুরবার। শনি রবি সোম মঙ্গল থেকে বুধবার দিন গাড়িতে করে চলে আসিস আবার।

—কেন?

বিলাস অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে বলে, তুই কাছে না থাকলে মনটা ভালো লাগে না।

সয়ারামের হাতের খোঁচায় আর একটু হলে ভাতের হাঁড়ি উলটে পড়ত। বাপুইস রে। নির্বস প্রাণের কথা তুই এমন করে মুখ ফুটে বলতে পারিস বিলাস। মহারানীর গুণ আছে দেখছি। সয়ারামের মন থেকে সব মেঘ কেটে গেল ফুৎকারে। কিন্তু মুখখানি কালো করে বলে, নইলে আমার হাড়-জ্বালানি বাড়বে কেমন করে। জ্বালা বাড়াতে আসতেই হবে।

পরদিন সকালবেলায় মাছ নিতে এল দামিনী। মাছ রোজই কিছু আসে এখন। লোক দিয়ে মাছ পাঠিয়ে দিল দামিনী। তারপর

[illegible] মুড়ি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কাঁড়ারে উঠে এসে, বিলাসের কাছে বসল তিন মাথা এক করে।

বিলাস বলল, কিছু বলবে মনে লাগছে।

দামিনী বিলাসকে একবার দেখে বলল, হ্যাঁ। বলছিলুম, তোমাদের গাঁয়ের মহাজনকে কত টাকা শুধলে?

বিলাস বলল, এই ধর, থাউকো টাউকো বাদ দিয়ে দুশো ট্যাকা।

—বেশ। আমার দেনা আর হিমির দেনা, সবই মিটেছে। এখন তোমার পাওনা হয়েছে কত হিসেব আছে?

বিলাস বলল, হিসেব তো কোনোদিন রাখি নি, খুড়োই রাখত। তোমার হিসেব নেই?

—আছে, সেই কথাই বলতে এলুম। সব কেটেকুটে আড়াইশো টাকা তোমার পাওনা আছে। লোকজন জানাজানি না করে সনজেবেলায় যেও টাকা আনতে। দিনকাল বড়ো খারাপ কিনা।

বিলাস বলল, পরশু যাব। আজ আর নয়।

দামিনী বলল, কেদমে পাঁচুর সঙ্গেই চলে যাবে তো?

—উঁহু।

হুঁ। ঠোঁট দুটি কুঁচকে নড়েচড়ে বসল দামিনী ভালো করে। কই চোখে তাকিয়ে বলল, তোমার মতলবখানা কী বলো তো?

ওইটি আসলে বলতে এসেছে দামিনী। বলল, এ-সব কী শুনছি?

—কী শুনলে?

—নাতনী নাকি তোমার সঙ্গে চলে যাবে?

বিলাস আঙুল দিয়ে পাটাতনে দাগ কাটতে কাটতে বলল, তা গেলে তো যাব।

—নিয়ে যাবে?

বিলাস বলল, মন তো করে তাই।

দামিনীর সারা লোলচর্ম মুখের রেখাগুলি সাপের মতো খাঁজে খাঁজে কুণ্ডলী পাকাতে লাগল। কেমন যেন অবশ হয়ে গেল শরীর। গলা-গলা চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেল সুদূরে। বলল, কোথায় নিয়ে যাবে, সমুদ্রে ?

বিলাস বলল, না, নাতীন কি তোমার মাছ মারবে ? তবে মনখানি তার যেতে পারে সমুদ্রে। ঘরে থাকবে সে।

দামিনী হুশ করে নিশ্বাস ফেলে বলল, আ! মেয়েটা একেবারে মরেছে। যাক, কারুর কথা তো শুনবে না। কেটে ফেললেও না। বুকের মধ্যে যে ফুটছে টগবগ করে।

তারপরে লোলচর্মঢাকা চোখে একদৃষ্টে বিলাসকে দেখে বলল, হুঁ, সেই তারই ব্যাটা তো। জোয়ান মেয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারবে কেন। কেউটের বিষ পড়েছে য্যা। তবে মেয়েটা বাঁচলে হয়।

—কেন গো ?

—সে একভাবে থেকেছে, জীবনের একটা ছাঁচ-ছাঁদ আছে মানুষের। সেটা বুঝতে হয়। নইলে দুটোকেই মনের জ্বালায় জ্বলতে হবে না ? জলে ডাঙায় মাখামাখি থাকলে কী হবে। জল সে জল; ডাঙা ডাঙা-ই !

সয়ারাম বলে উঠল, শোনো গো আয়ি মা, এ ড্যাঙা সোতে ভেসে গেছে।

বিলাস বলল, হ্যাঁ, তোমার নাতনীকে আমি চাই।

সয়ারাম আবার বলে উঠল, এই কথা! অনেকদিন থেকে বন্ধুর আমার জবর মন ফসফস করছে।

দামিনী বলল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নিয়ে যাবে, নিয়ে যাও। শেষ বয়সে আমাকে খাবে শ্যাল-কুকুরে।

দয়ারাম বলল, তুমো চলো না কেন, শ্যাল-কুকুরে খাবার দরকারটা কী?

দামিনী বলল, না ভাই, তা যেতে পারব না। এ বয়সে আর পুবের দেশ-গাঁয়ে গিয়ে টিকতে পারব না। মরতে বসেছি, তাই বাজারে গিয়ে একটু না বসলে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ওইরকম অভ্যাস হয়েছে এখন। তা ছাড়া, আমরাও পুবেরই মানুষ। আমার শ্বশুর চলে এসেছিল এখেনে।

তারপরে হঠাৎ বিলাসের দিকে ফিরে বলল, এ পাড়ার অনেক পিরিত দেখলুম। ছুঁড়িগুলানের মনও বলিহারি। রঙে একেবারে দিশাহারা, যেন একেবারে দপদপ করছে। তা আমার নাতনীকে দুঃখু দিলে, তোমাকে আমি দেখব।

বিলাস বলল, মাছমারার বউ, দুধেভাতে থাকবে না। মাছে-ভাতে রাখব।

দামিনী যেতে যেতে বলল, সেটুকু যেন সুখের খাওয়া হয়। এই কথা।

বুড়ী চলে গেল। বিলাস বসল জাল নিয়ে। সাংলো জাল সঙ্গে ছিল কুল্যে চারটি। ইলিশের গায়ের লালায় সব কটি জালই নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়। বিশেষ জালের গর্ভস্থল, যেখানে মাছের ছাঁচ লাগে, সেখানটি নষ্ট হয়ে যায় আগেই। গেছেও। বিলাস পচা সুতো তুলে, নতুন সুতো পরাতে বসল।

কিন্তু মনে তার অনেক কথা গাইতে লাগল। মাছমারার বউ আর কবে সুখের ভাত খেয়েছে। সুখের নয়, স্বস্তির ভাত মাছমারার বউ খায় না। প্রাণে তার সুখটুকু সার। উপোসের দুঃখু পেতে হয়। কেনলা, নদী আর সমুদ্রের মর্জির উপর বাঁচে মরে

[illegible] আশা।

কিন্তু বুকের রক্ত যেন আগনার মুখের ঢেউয়ের মতো তোলপাড় করে। তোলপাড় করে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব ভাবনা।

হিমির অকূলে-ভাসা মুখখানি ওঠা-নামা করে সেই ঢেউয়ে।

দুলাল এল একটু পরে। লাল চোখ দুটিতে মিটমিটে হাসি। মাছমারার গায়ে যত-না গন্ধ, মাছ-বেচনদার দুলালের গায়ে তার চেয়ে বেশী গন্ধ লাগে।

বিলাসকে বলল দুলাল, তোমার কাছেই এলুম। তুমি তো আর গেলে না।

বিলাস বলল, এসো খুড়ো। যাব, দু-একদিনের মধ্যেই যাব। আজো যেতে পারি। বোসো।

দুলাল বলল, কাজের কথা বলতে এয়েছি। আমাদের পাড়ার সাজারে তোমাকে থাকতে লাগবে। তোমাকেও একটি সাজাভাটা চাঁদা দিতে হবে কিন্তুন, বুইলে?

সাজার হল মাছমারাদের সার্বজনীন গঙ্গাপুজো। সবাই মিলে চাঁদা দেয়। হাত ধরে কেউ টাকা-পয়সা দেয় না। মাছমারারা একটি ভাটার পাওয়া মাছ সব দিয়ে দেয়, যাদের উপর সাজারের ভার থাকে। তাকে বলে 'সাজাভাটা'। সেই মাছ বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, তাতেই সার্বজনীন গঙ্গাপুজো হয়। তাতে কে কত বেশী দিয়েছে, কম দিয়েছে, সেটা কোনো কথা নয়। যা পায়, তাই দেয়। তবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে বৈকি। যে যত বেশী গড়ান মারতে পারবে, সে তত বেশী দিতে পারে। তার নাম হয়, মান বাড়ে।

বিলাসদের দেশে-গাঁয়েও সাজার হয়। সে বলল, কদ্দিন থাকব না থাকব—

দুলাল হেসে উঠে ঘাড়ে রদ্দা মারল বিলাসের। বলল, সে

খবর কি আর চাপা আছে গো। দেশময় রটে গেছে, প।   র রঙ লেগে গেছে।

—রঙ?

—হ্যাঁ। বড়ো সহজ মেয়েটিকে তো তুমি ঘরে আনো নি। আমার ছোটোমাসীকে নিয়ে মেয়েপুরুষ সকলের মাথাব্যথা।

—বটে?

—নয় তো? কতজনার রঙ-চটা পিরিতে আবার নতুন পোঁচড়া পড়ছে, কত বুড়ীর পেথম বয়সের কথা মনে পড়েছে। যার যত সুখ দুঃখ উথলে উঠেছে আমার ছোটোমাসীর কথা নিয়ে।

তারপর গলা নামিয়ে বলল, তা পর বুক-জ্বলে-যাওয়া আগুনের রঙ কি কম ফুটেছে! অনেকেরই টাক্ ছিল, তুমি ছিনিয়ে নিচ্ছ।... আমারো মনটা তুমি তোলপাড় করে দিয়েছ।

—কেন গো দুলাল খুড়ো?

—আমার পেথম বয়সের কথা মনে পড়ে গেল। তোমার খুড়ী, আতরবালা। আতুর কথা বলছি। আমাদের পেথম দেখাশোনার ছবিগুলান ভেসে উঠল চোখের সামনে।

বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হল দুলাল। শেষ ভাদ্রের চাঁপা-রঙ রোদ, চারদিকে চাঁদি-সোনার ঝিকিমিকি। জল যেন সব জায়গায়েই টাবুটুবু। গাছপালায় ঘোর সবুজের সমারোহ।

দুলাল বলল, ভালো হোক বাবা, তোমার ভালো হোক। তালে 'সাজাভাটা' পাচ্ছি তো?

বিলাস বলল, অনিয়ম করব কেমন করে? দশজনের বিষয়ে আমু একজন।

—বেশ বেশ। কোনোদিন আমাদের সাজারে ছিলে?

—না।

—তবে দেখবে, কলকেতা থেকে বড়ো বড়ো যাত্রার দল আসবে। কম্ করে পাঁচ রাত শুধু যাত্রাগান। তাপরে কবি-কেত্তন গান তো আছেই। আজকাল আবার হয়েছে তোমার মাইক না কি। তাও বাজবে। বড়ো আমোদ হবে—

নৌকো থেকে নেমে বলল দুলাল, তবে কথা হল কি যে তোমার কাছে এখন সে আমোদ কিছু নয়।

সয়ারাম বাটনা বাটছিল। হঠাৎ বলে উঠল, তা সে কথা ঠিক।

কিন্তু বিলাসের বুকটা টনটনিয়ে উঠল। খুড়ো যদি থাকত। জাল কোলে নিয়ে দূর জলের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। পরমুহূর্তেই মায়ের জন্যে, খুড়ীর জন্যে হু হু করে ওঠে মনটা। কতদিন দেখে নি।

দেখবে, মহারানীকে নিয়ে গিয়ে দেখবে। চাকুম্মে-মাকুম্মের কাল যাক।

শুক্রবার কেদমে পাঁচুর যাওয়া হল না। ব্রজেন ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে তখনো হিসাব-নিকাশ মেটে নি। তবে ঠাকুর অনেক বাবা-বাছা করেছে কেদমেকে। বাপ-ব্যাটারা অনেক মাছ দিয়েছে ঠাকুরকে। শনিবারে যাবে কেদমে। সয়ারামেরও একদিন দেরি হয়ে গেল।

নৌকা কম দেখা যায় গঙ্গায়। এতদিন যেন মাছমারাদের মেলা বসেছিল। এখন গঙ্গার বুকখানি বড়ো নিরালা নিরালা লাগে।

এই বুঝি নিয়ম। গঙ্গার কাছে এসে মাছমারারা কত কপাল কুটেছে। গঙ্গার সাড়া জাগে নি। সাড়া যখন দিল, অমনি মাছ-মারা তার কাজ মিটিয়ে চলে গেল! গঙ্গা এখন একলাই যাওয়া-আসা করবে কলকল করে। সংসারে কেউ কারুর জন্য বসে থাকবে না। জীবনের এইটি সুখ, এইটি দুঃখ। গঙ্গাকে দেখে যেন মনে হয়, ছেলেদের দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। ছেলেরা নিয়েই সুখী।

ওই দেখা যায় নলেন-টানা বেদীটা রয়ে গেছে এখনো। একটা চিল বসে আছে তার মাথায়। টোটার চিহ্ন ওটা।

আগামী বর্ষায় আর ওটা থাকবে না। ছেলেরা খেলা করতে এসে ভেঙে ফেলবে। নতুন বছরে এসে ওই চিহ্ন না দেখাই ভালো।

সন্ধ্যা হল প্রায়।

বিলাস আজ গঞ্জের গাছতলায়, নরসুন্দরের কাছে বসে, চুল কেটেছে, দাড়ি কামিয়েছে। এতদিন জামা গায়ে দেয় নি। ঝাঁপি থেকে ক্ষারে-কাচা গেরুয়া বর্ণের জামাখানি বের করতে গিয়ে পাঁচুর জামাটাও চোখে পড়ে গেল। মনে হল, খুড়ো যেন স্বপ্ন দেখছে।

জামাটি গায়ে দিয়ে, কাপড়টি হাঁটুর একটু নিচে নামিয়ে বিলাস গেল হিমির বাড়িতে।

সয়ারাম বন্ধুর আপাদমস্তক দেখে ঠোঁট টিপে বলল, এট্টুকখানি ফুলল ত্যাল হলে খুশবেই ছাড়ত ভালো।

বিলাস বলল, তোর মুণ্ডু। আমি ট্যাকা আনতে যাচ্ছি বুড়ীর কাছ থেকে।

হুঁ, এখন কত ছলাকলাই দেখব রে বিলাস। এই সয়ারামকে এখন অনেক দেখতে হবে। কিন্তু বুকের ভিতরটা তার আনন্দে ভরে উঠছিল। তার যাওয়া হচ্ছে না বটে বন্ধুর সঙ্গে। যাবে, সে যাওয়ার সময় এখনো হয় নি। কিন্তু মুখ গোমড়া করে বলল, তা এট্টুক তাড়াতাড়ি আসেন যেন মশাই। কারুর ভাত রেঁধে আমি রাত দশ পোহর ধরে বসে থাকতে পারব না।

বিলাস বলল, আচ্ছা, না থাকিস না থাকবি।

বলে সে চলে গেল উঁচু পাড় ভেঙে।

আজো বাড়ি ফাঁকা দেখা যায়। হিমির ঘরের দরজা খোলা রয়েছে।

বিলাস ডাকবার আগেই বেরিয়ে এল হিমি। সন্ত-খোঁপা-বাঁধা মাথার চুল চকচক করছে। টকটকে লাল শাড়ি পরেছে একখানি। তাজা ইলিশ-কাটা গাঢ় রক্তের মতো লাল। জামা গায়ে দেয় নি। গলায় দেখা যাচ্ছে সোনার হারের ঝিকিমিকি। পায়ে দিয়েছে আলতা, কপালে দিয়েছে ছোটো টিপ।

বিলাসের চোখে পলক পড়ে না।

হিমির মুখটিও শাড়ির মতো লাল হয়ে উঠল। বলল, কী দেখছ চপ?

—মহারানীকে দেখছি। একেবারে যে রক্তারক্তি দেখি।

হিমি বলল, তোমার দেয়া মাছ আজ নিজের হাতে কেটেছি।

—অ। আমি মনে করি বলে, মহারানী কোনো পেজার খুন মেখে এল।

অমনি হিমির ঠোঁট ফুলে উঠল অভিমানে, আহা। পেজার খুনই দেখলে খালি। আমার বুকের রক্ত যে সব চলকে পড়েছে বাইরে সেটা কে দেখবে?

বিলাস বলল, রাগ কোরো না। তোমার বুকের রক্ত নয়। তেঁতলে বিলেসের মনের রঙ ওটা মহারানী।

হিমি হাত ধরে ঘরে টেনে নিয়ে গেল বিলাসকে। আসন পেতে বসিয়ে বলল, আজ ছুটি খেতে হবে আমার কাছে, আগেই বলে রাখছি কিন্তু।

বলে হিমি কোথায় যাচ্ছিল। বিলাস তার হাত টেনে ধরল। বলল, তা না হয় খাব। তুমি যাচ্ছ কমনে?

—উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে আসি।

—থাক। ছুটি পেটে খাবার জন্তে তো কাজ করি। আজ এটুই কথা বলি।

—তা বলে খেতে হবে না ?

—হবে, না হয় দেরিতেই হবে। না খেয়ে আমি যাব কমনে। তুমি বোসো মহারানী।

বাড়িতে কেউ নেই। হিমি বসল বিলাসের কোলের কাছে। বিলাস তার শক্ত হাতে বেড় দিয়ে ধরে মুখ তুলে ধরে বলল, মহারানী, আমি মাছমারা। অকূলে ভাসি, জীবন বড়ো সংশয়। তুমি দুঃখু পাবে বড়ো।

হিমির অকূল সমুদ্র—বিলাস। সেই সমুদ্রের বুকে ডুব দিয়ে বলল হিমি, সেইটি আমার সুখ, তুমি তো আছ। শুধু সুখের খবর তো আমি জানি নে কোথায় আছে।

বিলাস বলল, আরো কথা আছে মহারানী।

—বলো।

বিলাস বলল, অমর্তর বউয়ের সব কথা। বলল, বড়ো পাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি মহারানী। আমার ভেতরের শয়তানটাকে সে উসকে দিইছেল। বুকে আমার আগুন জ্বলছেল খা খা করে! তোমাকে যেদিনে দেখলুম, আমার মন শান্ত হল। তুমি আমার পাপ ধুয়ে দেও।

হিমি হাত দিয়ে বিলাসের মুখ চাপা দিল। ভারী উৎকণ্ঠা ও ত্রাসে বলল, কাকে কী বলছ তুমি? সোম্‌সারে আমি তো পাপ-পুণ্যি বুঝি নে। তা হলে আমার পাপের যে ভরাডুবি হবে চপ।

বলে, সে তার জীবনের কথা বলল। যেখানে তার জন্ম, লোকে বলে, সেইটাই পাপের বড়ো স্থান। ছোটো বয়স থেকে সেখানকার পাশ কাটাতে পারে নি হিমি। পাপ তার নিজেরও অনেক। এ জীবনে কত দাগা পেয়েছে হিমি। এখানকার জীবনের চারপাশে শুধু অশেষ যন্ত্রণা ও অপমান। বড় মিথ্যে, ভণ্ডামি, মন -নিয়ে

ভ্রাচুরি। তাই না হিমি অকূলে ভাসতে চেয়েছে। সেখানে
হারের মূর্তিও যেমন ভয়ঙ্কর, ভালোবাসাও তেমনি ছলনাহীন
ভাল।

বিলাস বলল, আমরা দুজনেই ধোয়ামোছা করে নিই জীবনটা।

হিমি বলল, সেই ভালো।

কখন অন্ধকার হয়েছে, সাঁঝ উতরে রাত গেছে বেড়ে, টেরও পায়
। হিমি ধড়ফড়িয়ে উঠল। বাতি জ্বালল ঘরের। উনুনে আগুন
তে গেল গুনগুনিয়ে।

বিলাস বলল, তোমার আইমা কমনে গেল ?

হিমি বলল, তার কথা আর বোলো না। কদিন ধরে বুড়ী এন্ত
গিলছে। জিজ্ঞেস করলে বলবে, তোর কী ? তুই তো যাবি
ল। আমি মদ খাই, নেশা করি, না হয় মরব, তুই চোপা করিস নে।

বিলাসের মনটা খারাপ হয়ে যায়। নাতীনের শোক লাগছে বুড়ীর।
ন্তু মন যে মানে না। বিলাস বলল, সঙ্গে যেতে বলেছিলুম।

হিমির গলা আটকে এসেছিল ধোঁয়ায়। বলল, তালেই হয়েছে।
জায়গা ছেড়ে যাবে ?

আর-একবার হিমি কাছে এসে বলল,

—চপ!

—বলো।

—একটা কথা রাখবে ?

—নিচ্চয়।

—আমার এক আপদ আছে। তুমি নেবে ?

—কী গো ?

—ট্যাকা। তুমি সমুদ্রে যাবে বলে মহাজন ধরবে বলছিলে ?
দ আর গয়না মিলিয়ে চার হাজার হবে আমার। তুমি নেও।

বিলাস হেসে বলল, ও, সমুদ্রের মহাজনিও করবে ? তা, তোমাকে নেব, তোমার সবই নেব মহারানী।

ঘুরে ঘুরে বসে-বসে হিমি রাঁধলে। তার রক্ত-শাড়িতে আজো [illegible] [illegible] ঘরে-বাইরে খেলা চলল দুজনের। বিলাসকে বাইরে আবার দু দণ্ড কথা বলল দুজনে।

বিলাস বলল, এবারে যাই মহারানী ?

হিমি বলল, থাকো রাত্রে।

বিলাস বলল, সেটা পারি নে যে। কাল সয়া চলে যাবে। নৌকোর সংসার, সেখেনে রোজ বাতি দিতে হবে, তিবড়ি জ্বালতে হবে, বসে খেতে হবে। অন্ধকারে একলা নৌকো ফেলে রাখা যাবে না। তবে পিতিদিন আসব মহারানী, এসে থাকব তোমার কাছে, খাব, তা পরে নৌকোয় যাব। অমন করে তাককো না, আমার মনটা বড়ো আঁকুপাঁকু করে।

বাইরে চাঁদ উঠেছে, সামনে পূর্ণিমা। বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে উঁচুপাড়ের তেঁতুলতলা অবধি এল হিমি।

বিলাস নৌকায় উঠতেই সয়ারাম কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ছইয়ের কপালে হ্যারিকেন কমানো। তিবড়িতে এখনো অঙ্গার দেখা যায়।

বিলাস বলল, শুয়ে পড়লি যে ?

—তবে কি সারারাত জেগে থাকতে হবে ?

রাগ বোঝা যায় সয়ারামের। বিলাস বলল, খেয়েছিস ?

জবাব এল, রেঁধে-বেড়ে রইলুম দুজনের জন্যে, একলা খেতে যাব কোন্ শখে ?

আরে বাবা, বড্ডো চেতেছে সয়ারাম। বিলাস বলল, তা ওঠ, খেতে দে।

সয়ারাম উঠে অবাক হয়ে বলল, ডাকাবি করছিস কিরে? মজুনী বুড়ী যে বলে গেল, তার নাতীনের হাতে খাচ্ছিল?

—তুই কিসেও খাব মরা। খেতে দে।

সয়ারাম বলল, বাবারে বাবা, এ কি মিয়ে গো। কিন্তু মনটা খুশী হয়ে উঠল। দুজনের ভাত বেড়ে বসল সে। তারপরে বলল, দু-এক গরাস খেয়ে উঠে যা। বেশী গিলে শেষে পেট খারাপ করবি।

পরদিন চলে গেল সয়ারাম। কেদমে পাঁচুও ছেলেদের নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে দক্ষিণে সাই-যাত্রার বিষয় অনেক কথা বলে গেল। গিয়ে সে সকলের সঙ্গে কথা বলবে। মহাজনের সঙ্গে কথা বলবে বিলাস।

সয়ারাম বলল, আসতে দু-চারদিন দেরি হলে ভাবিস নে বিলেস। সাবধানে থাকিস।

বিলাস তাকে বাড়ির টাকা-পয়সা সব দিয়ে দিল।

তারপর একলা একলা 'সাজাভাটা'র মাছ ধরল বিলাস। ধরে সার্বজনীন গঙ্গাপুজোর চাঁদা দিল। এখানকার মাছমারাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। কেবল রসিক কথা বলে না।

হিমি বিলাসকে নিয়ে শহরের নানান জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ায়। আজ যায় কালাচাঁদের মন্দিরে, কাল যায় কালীদর্শনে। কোর্টকাছারি দেখায়, জেলখানা চিনিয়ে দেয়।

বিলাস হাঁ করে দেখে। তবে জোয়ারের বেলায়। ভাটায় জাল ফেলা চাই রোজ। আর দক্ষিণ দিকে বারে বারে তাকায় চোখ তুলে। জলে টান পড়ে গেছে, ধারা স্বচ্ছ দেখায়। সমুদ্রের কাল ঘনিয়ে আসছে। বিলাসের মন টান-পাড়াপাড়ি হয়।

সাঁজার এসে গেল। পাড়ার মধ্যেই একটি খোলা জায়গার মাথায়

তেরপল দিয়ে দিব্যি ঢাকা হয়েছে। প্রতিমার মাটির অঙ্গে রঙ পড়ে গেছে। ঢাক-কাঁশি উঠেছে বেজে, টাকুর টাকুর, ট্যাং টানা, কাঁই না না, কাঁই না না।

এ পাড়া, আর তার আশেপাশে গৃহস্থ, [illegible]হস্থ, দেহোপজীবিনী, সকলের মধ্যেই সাড়া পড়ে যায়। একটু [illegible]ন কেমন। নেশা-ভাং একটু বেশী চলে সকলেরই, কি মেয়ে, কি পুরুষ।

দুলালকে যখনি চোখে পড়ে, দেখে, মাতাল আত্মাকে ঝাপটে নিয়ে চলেছে সে। কামিনীও খুব বাড়িয়েছে। সেদিন বিলাসকে চেপে ধরে খাইয়ে দিয়েছে। বলেছে, নাতনীকে খাবি। মদ খাবি নে কেন রে ছোঁড়া?

গঙ্গার মূর্তিখানি বড়ো ভালো লাগে বিলাসের। কান পর্যন্ত টানা টানা অপলক চোখ, কালো তারা-দুটিতে কী তরাস! লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি হাসি। সোনার মতো রঙ, চতুর্ভুজা মূর্তি। নাকে মস্ত বড়ো নথ। হাতিমুখো বাহন মকরের ল্যাজটি কুমোর এমন ঝাঁকিয়ে দিয়েছে, যেন জলে ঝাপটা মারছে। মস্ত লম্বা শুঁড়টি দিয়েছে বাড়িয়ে। অপলক গোল চোখ দুটি লাল টকটকে দেখা যায়।

তারপরে অবাক হয়ে বিলাস দেখে, পুজো যেন হিমিরই। তার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। উপোসও নাকি তার। ফুল বেলপাতা চন্দন গোছগাছ করছে সে-ই। লালপাড় মুগা সুতার শাড়ি পরেছে। সকলেই হিমি, হিমিদিদি, হিমিমাসী, হিমিপিসী বলে চেঁচাচ্ছে।

আর মণ্ডপ থেকে—যখন হিমি বিলাসের দিকে তাকায়, বিলাসের বুকে যেন চকমকি পাথরের ঘষা লাগে।

গঙ্গা-মূর্তির সঙ্গে যেন মিশ খেয়ে যায় হিমির মুখ।

ফাঁক পেয়ে বলে বিলাস, বাপ্পুইস্‌রে, একেবারে চতুর্ভুজের মতন লাগে।

হাঁসি চোখ নটকে বলে, আর নিজে যে আট-হাতে মাছ ধর?

তা বটে। বিলাস বলে, মনে হয়, এখেনকের সবার মহারানী তুমি। তোমাকে না হলে চলে না। আর আমার সয় না, কবে যে পালাব তাই ভাবি।

তারপর যাত্রা-গান আরম্ভ হয়। সয়ারামও এসে পড়েছে। শান্তনু ও গঙ্গা পালাটি বড়ো ভালো লাগে। আসরে পুরুষদের পাশ ঘেঁষে বসে তিনি, বিলাসের কাছাকাছি থাকার জন্তে। দুজনে পালা দেখে আর চোখাচোখি করে।...

পালা আরম্ভ হয়েছে। এলানো-চুল সুন্দরী যুবতীকে নদীর পাড়ে দেখে, পদ্মগন্ধে পাগল রাজা শান্তনু তার পিছনে পিছনে যায়। বলে, কে তুমি পদ্মগন্ধা, সুলোচনে, অতি মনোহরা দেবী-প্রতিমা? হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু তোমার পাণি ভিক্ষা করে।

গঙ্গা বলে, তবে প্রতিজ্ঞা করো মহারাজ, যদি আমাকে বিবাহ কর, তবে কোনোদিন আমার কোনো কথায় প্রতিবাদ তুমি করবে না। আমার কোনো কাজে কখনো বাধা দিবে না। যে মুহূর্তে বাধা দিবে, সেই মুহূর্তেই হারাবে আমাকে।

রূপমুগ্ধ রাজা বলে, তাই দিব হে নিঠুরা সুন্দরী দেবী।

দেবপুরী হতে গান ভেসে আসে,

জয় জয় গঙ্গা, গাহ জয় গঙ্গার।
বিধির বিধান এই অষ্টবসু তরাবার॥

তারপর সন্তান হল রাজার। সে সন্তান জন্মানোমাত্র গঙ্গা সন্তান নিক্ষেপ করে যায় জলে। দর্শক দেখে, গঙ্গা একটি একটি করে হলুদ-গোলা ছেলে আসরে কনসার্ট পার্টির এক জায়গায় ফেলে দিয়ে যায়। শান্তনু সন্তান-শোকে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজের গলা টিপে ধরে আসে রানীর পিছনে পিছনে। কিন্তু প্রতিজ্ঞানুযায়ী কিছু

বলতে পারে না। দর্শকেরাও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ফ্লুট বাঁশিটা সপ্তম সুরে ওঠে কেঁদে।

সব-শেষের সন্তানটি ফেলে দেওয়ার সময় উদ্‌ভ্রান্ত শান্তনু আর স্থির থাকতে পারে না। বলে ওঠে, নিষ্ঠুর সুন্দরী, মা হয়ে তুই পারিস, আমি যে আর পারি নে। আমার বুক ফেটে যায়!

গঙ্গা বলে, পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করো রাজা।

রাজা বলে, দেবী, তুষ্ট হও। তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না, কিন্তু এই সন্তানটি ভিক্ষা দাও।

—এই নাও।

বলে রাজার হাতে সন্তান দেয় সুন্দরী, তারপরে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজা হাসতে গিয়ে কেঁদে ওঠে। শুধু শোনা যায় কে যেন দৈববাণী করে, রাজা, তোমার এই সন্তান জগতের শ্রেষ্ঠ বীর হবে।

রাজা কাঁদে। বিলাসেরও বুকটা যেন ফাটে। কেন, রানী চলে যায় কেন। রানী থাকলে কত ছেলে আঁরো পেত রাজা। এ ছেলেকে না চাইলেই পারত। তাকিয়ে দেখে, হিমি তার দিকে তাকিয়ে আছে। দু-চোখ-ভরা জলে তার গাল ভেসে যায়। সবাই কাঁদে রাজার বিরহ দেখে।

তারপর আরো অনেক পালা হয় পাঁচদিন ধরে। নল-দময়ন্তী, শকুন্তলা, চিত্রাঙ্গদা।

একদিন পালা-শুরুর মুখে, দুলালকে না দেখে বিলাস তার বাড়ি গেল। কদিন তাকে সময়মত দেখা যায় না।

গিয়ে দেখল, হ্যারিকেনটা কমিয়ে, দাওয়ায় বসে আছে দুলাল। কী যেন ভাবছিল, বিলাসকেও চোখে পড়ে না। দাওয়ার উপরে, দরজার কাছে একজোড়া দামী সুন্দর জুতো। ঘরের বেড়ার ফাঁকে ভিতরে আলো দেখা যায়।

বিলাস বলল, কী করছ খুড়ো বসে বসে ?

দুলাল নেমে এল উঠোনে। চুপি চুপি বলল, যাত্রা দেখতে যাও নি ?

—গেছলুম। তোমাকে ডাকতে এলুম।

—নক্‌কী বাবা আমার।

তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে মুখখানি দহের পাকের মতো ফুলে উঠল দুলালের। বলল, তুমি যাও, আমি পরে যাব।

—ঘরে কে খুড়ো ?

দুলাল বাড়ির বাইরে এল বিলাসকে নিয়ে। বলল, তবে তোমাকে বলি বাবা। বাবু আছে ঘরে।

—বাবু

—হ্যাঁ। বেবুশ্যে ছিল তো আগে। তা পরে মাছ বেছে খাবার শখ হল আমাকে পেয়ে। কিন্তু রূপবতী মেয়েমানুষ, হাটের বাস উঠিয়ে এলে কী হবে, তারা ছাড়ে না। আর মানুষের মন, তাতে এত রকমের চিত্তির-কাটা, রামধনুর চেয়ে বেশী রকমারি বাবা। বাবু এলে, আতু না-না করে, তা পরে বলে, 'এত সব বড়ো বড়ো বাবু-মানুষ পায়ে পড়ে গো আমার।' বলে যেন স্বপ্নের ঘোরে বাবুর ঘরে গিয়ে ওঠে।

তা পরে, বাবু চলে গেলেই দাপিয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে একসা করবে। আমাকে মারবে ঠাস-ঠাস করে।

বিলাস তার আদিম চোখে অপলক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল। বলল, কেন ?

দুলাল বলল, বলে, তুই কেন আমাকে টেনে ধরে রাখিস না, ঘরে কেন যেতে দিস ? কিন্তু আমি ধরে রাখব কেমন করে ? সে যে আপনি যায়

ছলালের মুখের দিকে চোখ রাখতে পারল না বিলাস।

সারা গায়ে মাছের গন্ধ, খালি-পা মানুষটা। কী সুখে আছে তবে আতরের কাছে।

বলল সে, তুমি আছ কেন এখেনে খুড়ো?

ছলাল হাসল। লাল চোখ ছুটি চকচক করছে। বলল, কোথায় আর যাব বাবা বিলেস। উপায় নেই যে।

—উপায় নেই?

—না। হাত-পা থাকলেই চলা যায় না যে গো, সেটা বোঝ তো। তোমার নৌকো ছিল, হাল ছিল, গাঙে কত জল ছিল, তবু তো চাকুন্দে-মাকুন্দে দেখে যেতে হচ্ছে।

নিঃশব্দ হাসিতে আগনায় জলের মতো ফুলে উঠল ছলাল। বলল আবার, তুমি বাবা মাছমারা, তোমার অকূল আছে। আমি মাছ বেচি, তাই কূলে ভিড়েছি।

তারপরেই সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, যাই, ঘর থেকে এখুনি বেরুবে হয়তো। না ধরাধরি করলেই চেঁচিয়ে দাপিয়ে মরবে।

চলে গেল ছলাল। বিলাস দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। বুকে যেন খুঁটেজালের কাঁকড়া বিঁধে রইল। যাত্রার আসরে গেল না। পায়ে পায়ে গেল গঙ্গার ধারে।

আকাশে অগণিত তারা। শরতের পরিষ্কার আকাশ। বিলাসের মনে হল, খুড়ো যেন বলছে, বিলেস, মহাসমুদ্রে যাবি তুই। বুকে তোর ব্যথা থাকছে। কেন? না, মনুষ্যজীবন দেখে জন্ম সার্থক হচ্ছে তোর।

স্পর্শে চমকে পিছন ফিরতে দেখল হিমি। ছহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে হিমি বলল, কী করছ এখেনে।

এখানে কোনো গোপনতা নেই বিলাসের। বলল, ছলাল খুড়োর কথা শুনছিলুম মহারানী।

হিমি বলল, ও, তাই সবকিছু নিয়ে নানানখানা ভাবছ বুঝি?

হিমির কথার ইঙ্গিত বুঝে বিলাস বলল, না গো না, ছি! মনটা বড়ো উদাস হয়ে গেল।

—আর আসরে বসে দু চোখে অন্ধকার দেখছিলুম আমি। চলো।

—চলো।

সাজার গেল, সাজারের উৎসব গেল। রসিকের সঙ্গে একদিন ভাব হয়েও গেল। বড় দুঃখী মানুষ সে, ঘরের বউ তার ব্রজেন ঠাকুর মশাইয়ের কাছে থাকে। তাই তার খাটো প্রাণটা জ্বলে অষ্টপ্রহর।

সয়ারাম খুব শহর দেখেছে। কার্তিকের টানের জলে মাছ মারার ইচ্ছে নেই তার একটুও।

বিলাস চাকুন্দে-মাকুন্দে ধরল। সময় এল, আর সময় নেই।

এতদিন অগ্নিকোণের মেঘ গেছে। এবার ঈশানে বিদ্যুৎ চমকায় থেকে থেকে। কৃষ্ণপক্ষে জলে বড়ো বেশী টান দেখা যায়। টানের মরশুম যাচ্ছে।

চলে যাবার আগের দিন, হিমি বলল, চলো, একটু শ্যামনগরের ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করে আসি।

সয়ারাম শহরে গেছে। বিলাস নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে গেল হিমিকে।

শিবমন্দির, নাটমন্দির, বাগান, রাজবাড়ি সব দেখল দুজনে। বিলাস ঘণ্টা বাজালে।

সন্ধ্যার ঘোরে দুজনে নৌকায় উঠল আবার। চার মাইল পথ। তখন জোয়ার এসে গেছে। বাতাস নেই একটুও। নৌকা মাঝ-গঙ্গায়।

মাইলখানেক আসতে না আসতে হঠাৎ বাতাস উঠল। হাল ধরে বসে ছিল বিলাস। পায়ের কাছে হিমি। দুটিতে নিজেদের চেয়ে দেখতেই মগ্ন।

বিলাস বলল, আরে সর্বোনাশ, ঈশেনে যে রাজুসে মেঘ হয়েছে। কেতেনের ঝড় না আসে।

বলতে বলতেই বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল, কড়কড় করে বাজ পড়ল কোথায়। ঝড় শুরু হয়ে গেল। আশেপাশে নৌকা নেই একটিও। অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। গঙ্গা ডাকিনীর মতো খলখলিয়ে উঠল। বৃষ্টি এল বড়ো বড়ো ফোঁটায়।

আওড়-ঘূর্ণিগুলির হিসাব কষে বিলাস, কোথায় কোথায় আছে।

গলা চড়িয়ে বলল, মহারানী, কেতেনের ঝড় এয়েছে। ছইয়ের মধ্যে যাও। নইলে ভিজে যাবে।

চড়া বাতাসে নৌকা টাল খেয়ে গেল। সামনের গলুয়ে জল উঠল চলকে।

হিমি দুহাতে বিলাসের পা আঁকড়ে ধরল। বলল, ছইয়ের মধ্যে একলা থাকতে পারব না গো চপ।

—তবে জোরে ধরে রাখো আমাকে।

প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরল হিমি বিলাসকে। বিলাস তার চেয়েও বেশী শক্তিতে হাল চেপে ধরল। জলের তোড় যায় একদিকে, বাতাস গোঁ গোঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে উলটো দিক থেকে। নৌকো আকাশে ওঠে, পাতালে নামে। বৃষ্টির ঝাপটায় ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে সব। বিলাস নৌকা ঘুরিয়ে দিল বাতাসের টানের দিকে। পুব পাড়ে ভিড়ে পড়ার চেষ্টা। কিন্তু নৌকা যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল।

হিমি ডাকল, চপ!

বিলাস শুনতে পেল না।

কাঁড়ারে জল উঠল বগবগ করে। হিমিকে একেবারে ধুয়ে দিল। আবার উঁচু হল কাঁড়ার।

[illegible]

থাবলা মারতে চায়। আমাকে যেতে [illegible]

প্রায় নখ বসিয়ে আঁকড়ে ধরেছে হি[illegible] কেতেনের ঝড়

বুঝি তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বুকের থেকে কী উঠে আসছে। বমি না কান্না? বিলাসের গায়ে মুখ চাপে সে।

কেতেন ঝড় তার মরণের কেতন উড়িয়ে এসেছে। দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার। জল ক্রমশই ফুলছে। বিলাসের মনে হল, হাল যেন মড়মড় করে। হ্যাঁ, কেতেন পেয়ে গঙ্গা যেন আরো রুদ্রাণী। রাজাকে ফতুর করে যে সে।

আবার আছাড় খেল নৌকা। যেন কোন্ দানোয় কাঁড়ার চেপে ধরেছে জলে। আবার জল উঠল কলকল করে। বুক কাঁপল বিলাসের। বাছাড়ি ডুববে না, কিন্তু উলটে যাবে নাকি? মনে হল, মহারানীর একটি হাত যেন খসে গেল।

—মহারানী!

—উঁ?

—হাত খুলে গেছে নাকি তোমার?

—হ্যাঁ।

—কেন? কেন গো?

—হাতে শক্তি নেই আর।

—মনে শক্তি ধরো মহারানী, আমি আছি।

সাহস পেয়েছে বিলাস। কী যেন দেখা যায় সামনে কালোমতো। ভাবতে না ভাবতেই বিদ্যুৎ চমকাল। বিলাস দেখল ডাঙা। এত জোরে ধাকা লাগলে গলুই খানখান হয়ে যাবে।

হালে চাপ দিয়ে নৌকা ফেরাল বিলাস। পাথালি নৌকা বেগ

[illegible] টালমাটাল করে।

বিলাস দুহাতে টেনে তুলল হিমিকে। বলল, শীগগির এসো, হামা দে যাও দুইয়ের তলা দে।

হিমি হামা দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। বিলাস ততক্ষণ ডাঙায় নেমে ধরেছে নৌকার কাছি। হিমি টলোমলো করে কোনোরকমে এসে জাপটে ধরল বিলাসকে।

বিলাস বলল, নোঙর করলে এখন ছিঁড়ে বেইরে যাবে নৌকো। মহারানী, ওই গাছ দেখা যায়, তুমি গাছতলায় যাও।

হিমি কাঁপছে থরথরিয়ে। গলাও কাঁপে। বলল, না, এখানেই তোমার কাছে থাকব।

বাছাড়ি নৌকো যেন বড়শিতে গাঁথা মাছ। ছিটকে টেনে চলে যেতে যায়।

আস্তে আস্তে ঝড় কমল। বৃষ্টি ধরে এল। হিমিকে নিয়ে বিলাস নৌকায় উঠল। অনেকখানি সামলে উঠেছে হিমি।

নৌকায় উঠে বলল, বাবা গো, ঝড় নয়, যেন রাক্কস। আর আসবে না তো?

—না। ভয় পেয়েছিলে খুব, না?

হিমি বলল, কোনোদিন তো পড়ি নি এমন ঝড়। তোমার ভয় লাগে নি?

—বড়ো ভয় লেগেছিল। মহারানী আছে আমার সঙ্গে যে?

হিমি দুহাত দিয়ে ধরে রইল বিলাসকে।

সমুদ্রের ডাক পড়েছে। কেন্তেনের ঝড় গেল। চাকুন্দে-আকুন্দে গেল। টানের জলে সমুদ্রের বার্তা পুরোপুরি এসে গেছে।

বিলাস তৈরী হল।

যাত্রা হল রাত্রে। [illegible] ভোরবেলা নিয়ে পৌঁছবে বাগবাজারের ঘাটে।

দামিনী একদিন [illegible] বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, রাক্ষুসী, কী [illegible] যায় কাটালি!

হিমিও দিদিমার বুকে পড়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। আতর এল। দুলাল এল। আরো দু-চার জন। পাড়ায় ঘরে কথা অনেকদিন হয়েছে। আজ আর হাঁকডাক ফিসফিসানি নেই।

তা ছাড়া এ পাড়ায় এ-সব নিয়ে বড়ো রকমের আন্দোলন কখনো হয় না। এ পাড়া থেকে এমন অনেক মেয়ে গেছে, কত নতুন মেয়ে এসেছে। কখনো ফেরত এসেছে পুরনো মেয়েরাও। চলতি সমাজ-জীবনের বন্ধন এদের সমাজে নেই। কিন্তু সমাজ একটা আছে। কতগুলি রীতি আছে, নীতি আছে। সেগুলিকে সবাইকে মেনে চলতে হয়।

দামিনীর স্বামী অল্প বয়সে মারা গেছে। তারপরেও তার যৌবন ছিল। পিরীত হয়েছে, ঘর করেছে আর-এক জনের। কেঁদেছে হেসেছে, সে যদি চলে গেছে, আর-একজনও হয়তো এসেছে। এমনি করে স্বাধীন হয়েছে। যৌবন থাকতে যেন এখানে [illegible] নেই। তা বলে ভালোবাসা নেই, এ কথা বলা যাবে না। নইলে কাঁদতে হবে কেন?

এখানে কেউ গৃহস্থ, কেউ দেহ ও জীবিকা দুই-ই রেখেছে। কেউ কেউ মাছ বেচছে। পুজো পার্বণ, আটকৌড়ে বিয়ে শ্রাদ্ধ, সবই হয় এখানে।

তবু মেয়ে-পুরুষে কাজ করে, পয়সা থাকলে ব্যবসা করে, না থাকলে, কলে কারখানায় কাজ করে বাঁচতে হয়। জীবিকা আছে

সকলের। স্বামী-স্ত্রীরও। শুধু ঘরের বউ হয়ে, ছেলে বিইয়ে, স্বামী-সেবায় মেয়েমানুষ এখানে স্বর্গে যেতে পারে না।

তাই এদের দেখে বড়ো উচ্ছৃঙ্খল লাগে। মনে হয়, কলকাতার ওপরতলার পিদিমটার নিচেই সেই ঘোর ঘন অন্ধকার বুঝি এইখানেই।

মানুষ এখানে প্রাণের দায়ে ছোটে যত্রতত্র। পিরিত এখানে জীবনেরই রীতি। কখনো ঘরে না রইতে দেয়, অনলেই পোড়ে কখনো। রঙ লেগে গেলে তাকে ঢাকতে পারে না, চাপতে যাওয়ার সূক্ষ্ম মুন্সীয়ানা অনায়ত্ত এদের। সেজন্য পিরিতের রাশিটা সোনার শিকল নয়, লোহার শিকলও নয়, নেহাতই প্রাণের তন্তুতে পাক-খাওয়া সূত্র। মনে না মানলে, মিথ্যা আর লুকোচুরি নেই, তাই হাসেও চেঁচিয়ে, অভিশাপও দেয় সরবে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, সবটাই বড়ো দুরন্ত, ভয়াবহ, উচ্ছৃঙ্খলও আদিম।

// অসত্যকে নিরন্তর আঘাত করে বলেই এদের দেখায় বড়ো শ্রীহীন ভাঙাচোরা। সাধুর বেশে চোর নেই এদের, বলে 'অমুক সিঁধেল চোর'। দায়ে পড়ে তাকেই টাটে বসাতে হয় না। দীনের কোনো ভান নেই, বলে, বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন? পেটে ভাত নেই, ইয়েতে ইয়ে। গোপন করতে জানে না বলেই না গোপন-পটুরা হাসে ওদের দেখে? বুঝি হিংসাও করে! //

হিমি একদিন গিয়েছিল একজনের সঙ্গে মনের মানুষ ভেবে। সে ঠকিয়েছে, পালিয়ে এসেছে মেয়ে।

আজ বিলাস তাকে অকূলে টেনেছে। মনে তার অনেক ভয়। তবু ভাসছে।

সয়ারাম চেঁচিয়ে হাঁক দিল, ভাটা পড়েছে রে বিলেস।

দিদিমা-নাতীনে কাঁদতে কাঁদতে এল ঘাটে।

হিমি আজ জামা গায়ে দিয়েছে। নীলাম্বরী পরেছে, মাথায় দিয়েছে ঘোমটা।

আতর-দুলালের কাছ থেকে বিদায় নিল বিলাস আর হিমি।

দামিনীর বুকে মুখ রেখে বলল হিমি, কাঁদিসনে দি-মা, আবার আসব, ঘুরে দেখে যাব তোকে।

নৌকায় উঠল হিমি। বিলাস কাঁড়ারে বসল হাল নিয়ে। হিমি তখনো গলুয়ে দাঁড়িয়ে। নৌকা দক্ষিণের টানে গেল ভেসে।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। কৃষ্ণপক্ষের মুখপাত বলা যায়। চাঁদ উঠেছে সামান্য কানা ক্ষয়া। কৃষ্ণপক্ষ বলেই জলের টান বেশী। একড়ি টান জলে। দাঁড়ে বসেছে সয়ারাম।

কাঁড়ারের ছইয়ের মুখছাটের কাছে বসেছে হিমি। বিলাস দেখছে। চোখের জল শুকিয়ে গেল বাতাসে। হিমিও বিলাসকে দেখছে।

বিলাস বলল সয়ারামকে, সয়া, জোয়ারের আগে বাগবাজারের খালের মোড় ধরা যাবে রে?

সয়ারাম বলল, টান ভালোই, যেতেও পারে।

মনে মনে বলল, বড়ো তাড়া লেগেছে বন্ধুর, আর তর সয় না।

হিমি এগিয়ে গিয়ে বসল বিলাসের পায়ের কাছে। বিলাস বসেছে হাল ধরে। হিমি তার হাঁটুতে থুতনি চেপে, মুখের দিকে তাকাল।

বিলাস বলল, কী বলছ মহারানী?

—তোমার মা কেমন?

—বাড়ি গ্যে দেখো।

—তোমার মা আমাকে নেবে তো?

বিলাসের চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, মহারানী, আমার

মায়ের বড়ো বিলাস-অন্ত প্রাণ, তোমাকে সে ফেরাতে পারে? তা ছাড়া খুড়ো আমাকে বলে গেছে। বলেছে, তাকে তুই নিস।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ।

হিমি সারা দেহ চেপে রইল বিলাসের বলিষ্ঠ দুটি জঙ্ঘায়। বিলাস যেন আদিম মানব। চীৎকার করে গান ধরল—

সজনী আমারে না ডাক পিছে
আমারে ডাক দিয়েছে
মহাসাগরে॥…

বুক চেপে আছে হিমি বিলাসের পায়ে। দু চোখ ভরে দেখছে কালো কুচকুচে রূপ। বিলাস জামা খুলে ফেলেছে। চাঁদের আলো পিছলে পড়ছে সারা গায়ে। হিমি আরো ঘন হয়ে এল বিলাসের।

বিলাস বলল, মহারানী, ঝড়ের ভয় করে নাকি?

হিমি মুখ লুকিয়ে বলল, হ্যাঁ গো!

বিলাস হা হা করে হেসে আবার গান গেয়ে উঠল,

ওরে উত্তুরে বাতাস বয় রে
কী ভয় তোর বুটো ডাকাবুকো রে,
পানসা জালের সাই ডেকেছে সাগরে॥

হিমি বলল, তুমি সমুদ্রে যাবে কবে?

—তোমাকে বাড়িতে রেখে, ধর্মসাক্ষী করে কণ্ঠিখানি বাঁধব তোমার গলায়। তা পর অগানের মুখপাতেই যাব।

বলে হিমির জ্যোৎস্না-ধোয়া মুখখানি তুলে তার সুবাসিত নিশ্বাসের গন্ধ নিল বিলাস। তারপরে বলল,

—মহারানী, আমার পায়ে ক্যানো তোমার বুকখানি বড়ো ধুকুস ধুকুস করে?

—করে।

—কেন গো?

—তোমাকে যে বড়ো ভয় করে।

বিলাস হেসে উঠল। মাতাল হয়ে গেছে সে। আবার গান ধরল,

ও তোর কোনো ভাবনা পিছে নাই রে
তোরে ডাক দিয়েছে সাগরে॥

একে একে চেনা জায়গা সব পার হয়ে গেল। সয়ারাম ঘুমিয়ে পড়েছে গলুয়ের কাছে। হিমিও বুঝি নিঝুম হয়ে ঘুমোয় বিলাসের কোলে।

তারপরে চাঁদ চলে গেল। পুবে আকাশে দেখা দিল রঙ। পাখিপাখালি ডাকাডাকি শুরু করল ডাঙার গাছে গাছে। নৌকা এসে লাগল বাগবাজারের খালের মোড়ে।

হিমি মুখ তুলল।

—ঘুমোও নি মহারানী?

হিমি বলল, না।

ওই দেখা যায় খাল। শহরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে দূর দূরান্তে।

হিমি তার টিনের বাকসোখানি খুলল। জামা-কাপড় বের করে গায়ের গহনা সব খুলল একটি একটি করে। খুলে বাকসে ভরল।

ভাটার টানে নৌকা খালে ঢোকানো যাবে না। জোয়ারের অপেক্ষায় নোঙর করে, কাছে এসে বলল বিলাস, এ কী হল মহারানী?

হিমি মাথা নিচু করেই বলল, এ-সব রইল। ট্যাকা-পয়সা, সোনা-গয়না। তুমি রাখো।

—আর তুমি ?

নীলাম্বুধি বিশাল বিলাসের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল হিমি, ওগো চপ, আমি যেতে পারব না তোমার সঙ্গে।

সমুদ্রে যেন আবর্ত উঠল।—কেন গো মহারানী ?

পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে বলল হিমি, সাহস পাই নে চপ। আমি এতটুকু প্রাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড়ো মন-চনমনানি ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে, আঁধার রাত্রে আমার প্রাণ পুড়বে, তোমার নাগাল তো আমি পাব না।

বিলাস শান্তভাবেই বলল, আমি মাছমারা মহারানী, অকূলে আমার জীবন, অকূলে আমার মরণ।

হিমির চুল খুলে গেল, কাজল ধুয়ে গেল চোখের। রুদ্ধ কান্নায় বলল, পারব না, পারব না গো। আমি এতটুকু, এত বড়োকে পাওয়ার ভাগ্যি আমি করি নি।

কলকাতা শহর জাগছে। স্টীমার চলেছে, গাধাবোট টানছে, বয়া ভাসছে। একটি দুটি লোক চলে পোস্তা-বাঁধানো রাস্তার উপরে।

বিলাস অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে হিমির মুখখানি তুলে ধরল। বলল, কেঁদো না মহারানী।

—আর মহারানী বোলো না চপ।

—তা বলব, তুমি যে সত্যি মহারানী। বুঝলুম, এই উচিত হয়েছে। কিন্তু এই বাকসোখানি নেয়ে যাও মহারানী।

হিমি বলল, পায়ে পড়ি, নিয়ে যাও।

—না গো, না। আমি মাছমারা, এ-সব আমার থাকতে নেই। এই তেঁতলে বিলাসকে তুমি যা দিয়েছ, তা আর কেউ কাড়তে পারবে না। সে যে মহারানীর দান গো, মহারানীর দান। আমার প্রাণ জুড়িয়েছ তুমি, জুড়িয়েছ বলেই আমি সমুদ্রে যাব।

জীবনের ও মনের বিচিত্র বিড়ম্বনার অপমানে ও বিরহের ভারে ডাঙায় নেমে এল হিমি। সয়ারাম ঘুম ভেঙে ব্যাপার দেখে তাকিয়ে ছিল হাঁ করে।

বিলাস বলল, যাবে কেমন করে?

হিমির গলা ভরা। চুপি চুপি বলল, হাওড়া ইস্টিশন যেতে পারব। আমার চেনা রাস্তা শহর।

বিলাস আবার বলল, কেঁদো না মহারানী। তুমি রাস্তায় গ্যে ওঠো।

হিমি জড়িয়ে ধরল বিলাসকে দু হাতে।—ঢপ, আর কিছু বলবে না?

বিলাস বলল, শান্তনু রাজার কথা মনে পড়ে মহারানী। মনে হয়, রাজার দুঃখু কাটাবার উপায় ছেল না।

আরো কঠিন পাশে জড়িয়ে ধরল হিমি, ঢপ, তুমি থাকতে পার না?

—ও কথা বোলো না গো। পারলে তোমাকে কে ছাড়তে পারে। তবে মহারানী, মনে দুঃখু রেখো না; কেননা, এইটি সত্য বলে ঠাহর পেলুম, তুমি আমাকে অনেক দিলে। তোমাকে ছেড়ে যাবার সাহসও দিলে। যাই, এ জোয়ার ছাড়তে পারব না। সমুদ্রের কালো জল নেমে যায়। হিমি হাত ধরল বিলাসের। বলল, ঢপ, আর একটি কথা বলে যাও।

—কী বলব?

—যা খুশি তোমার।

হিমির দিকে তাকিয়ে বিলাসের বুকে ঘূর্ণী লেগে গেল। দেখল, মহারানী তার প্রাণের শেষ সর্বনাশ করেই আছে। অকূলে সে যেতে পারল না। কিন্তু কূলে বাঁচাও তার দায়। ভালোবেসে প্রাণে তার আগুন লেগে গেছে। কিছু না বলে কেমন করে যায় বিলাস।

ফিরে এসে বলল, মহারানী, জোয়ারের আগনায় আসব তোমার কাছে, চলন্তায় যাব অকূলে। তখন যেন তোমার দেখা পাই।

বিলাস নেমে গেল। হিমি ফিসফিস করে বলতে লাগল, তাই তাই তাই গো। তাই থাকব আমি, তোমার যাওয়া-আসার পথে পথ চেয়ে বসে থাকব।

সয়ারাম বলল, অ বিলেস।

—বল্।

—বলব বা কী। বলি, বিলেস, আবার তোর বুক উথালি-পাথালি করবে।

—করুক। সোমসারে সকলেরেই করে। সয়া, তুই নোঙর তুলে নে।

সয়ারাম নোঙর তুলে নিল। বিলাস শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কালিবাঁশের পাটাতনের উপর। মাছমারার প্রাণ, বড়ো শক্ত প্রাণ।

ওই দেখা যায়, ঘোমটা-খসা হিমি, মহারানী, দাঁড়িয়ে আছে এখনো।

নৌকা ঢুকে গেল খালে জোয়ারের টানে।

বেতনা নদীতে, কালীনগরের গঞ্জের ভেড়িতে শাবর করেছে আঠারো গণ্ডা নৌকা। মাছমারাদের নৌকা, সাঁই নিয়ে সমুদ্রে যায় তারা। অগ্রহায়ণ পড়ে গেছে। উত্তরে বাতাস বয়। পালে হাওয়া লগে গেছে, ডাক দিয়েছে সমুদ্র। ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গল আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগর গঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল যোগাড়যন্ত্র হয়েছে। সাইদারের অপেক্ষা।

—সাঁইদার কে?

—বিলেস। তেঁতলে বিলেস।

তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।